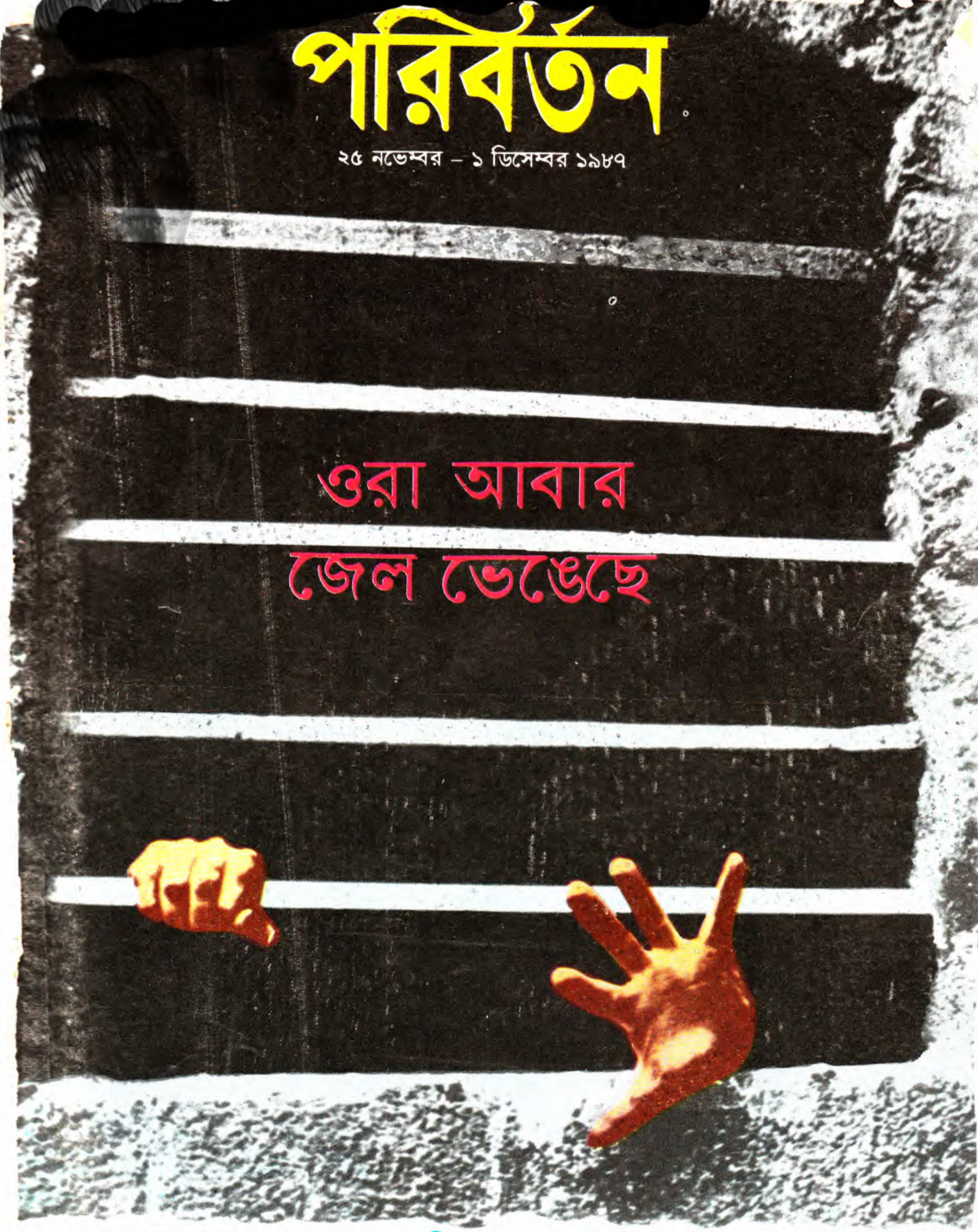
[redacted]

পরিবর্তন

২৫ নভেম্বর – ১ ডিসেম্বর ১৯৮৭



জাফনা ঃ বাঘের মুখোমুখি বাঘ ■ সতী নিয়ে বেসাতি

কিশোর ॰ [illegible]রিকিশোর



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ নিলয় হাজরা

স্ক্যান ঃ দেব কুমার দেব

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



গিন্নী বলেন
চায়ের সঙ্গে চলবে নাকি মারী ?
কর্তা বলেন লিলি হলে
জমবে সেটা ভারি ।
কেমন মজা কুড়মুড় মুড়
ক্রীমক্র্যাকারে জেলি
দারুণ মজা সন্দেহ নেই
হলে সেটা লিলি ।
এসে গেছে লিলি বিস্কুট
টাটকা তাজা
দারুণ মজা
লিলি বিস্কিট
LILY
BISCUITS

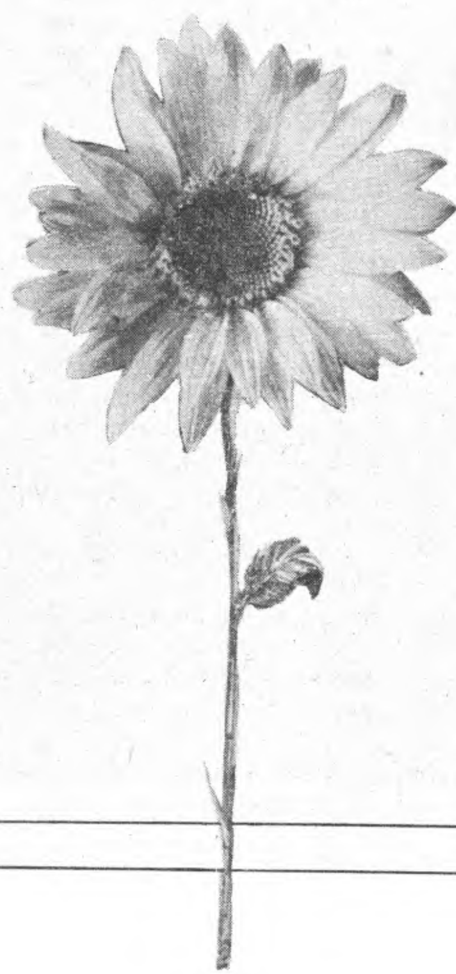
পরিবর্তন

২৫ নভেম্বর – ১ ডিসেম্বর ১৯৮৭, বর্ষ ১০, সংখ্যা – ২
প্রতি সংখ্যা ৪.৫০ টাকা
বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অনাত্র ২৫ পয়সা



এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : অরুণ চট্টোপাধ্যায়



পরিবর্তন

সম্পাদক : অশোক চৌধুরী
সংযুক্ত সম্পাদক : ঊষা ভৌমিক
শিল্প-উপদেষ্টা : নিতাই ঘোষ
চিফ এগজিকিউটিভ,
বিপণন, বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ:
সি এইচ বসু, কলকাতা
সার্কুলেশন কণ্ট্রোলার : প্রসাদ চন্দ্র দত্ত
সম্পাদকীয় দফতর ও রেজিঃ অফিস :
৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিন্সেপ স্ট্রিট), কলকাতা ৭00 0৭২, ফোন : ২৭-২১৬৯, ২৭-৯২৯২, ২৭-৯৩১১, ২৬-১৬৮0, ২৬-১৬৮১
Telex 021-5092 IPPL IN
দিল্লি অফিস :
সূর্যকিরণ বিল্ডিংস, ফ্ল্যাট ১২১২, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নিউ দিল্লি ১১0 00১, ফোন : ৩৩১-৭0২৪
জোনাল ম্যানেজার, নর্দার্ন জোন :
ওয়াই এ শেঠি, দিল্লি
জনসংযোগ অফিসার :
শ্রীমতী গায়ত্রী রায়, দিল্লি
বোম্বাই বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি : ভি সত্যমূর্তি
বোম্বাই অফিস :
বিশাল বিজনেস সেণ্টার, ওয়ারডেন হাউস, দ্বিতল, স্যর পি এম রোড, ফোর্ট, বোম্বাই : ৪00 00১
Gram VIBICENT
Telex 001-5726 AMSL-IN.
ফোন : ২৮-৭২২৯৫, ২৮-৭২৩৩৪, ২৮-৭১৩৫৮
বাংগালোর প্রতিনিধি : সি আর ভরত
১৫৯, এন জি ই এফ কলোনি
রাজামহল বিলাস, এক্সটেনশন II স্টেজ
বাংগালোর ৫৬0 0২৪
হায়দ্রাবাদ প্রতিনিধি : এস শংকরনারায়ণ
ফ্ল্যাট সি ২ দামোদর কৃপা, ১-১-৫0৮/সি ২, বাকারাম হায়দ্রাবাদ ৫00 ৩৮0, ফোন : ৬৫ ৭00
মাদ্রাজ প্রতিনিধি : পি এস রামমূর্তি
৩৭ পেরুমল স্ট্রিট, পুরসাওয়াকম্, ফ্লাওয়ার্স রোড পোস্ট মাদ্রাজ – ৮৪, ফোন : ৬৬-৪৭২১
বার্ষিক চাঁদার হার (ভারতীয় মুদ্রায়)
আমেরিকা ও কানাডা : ১২১0 টাকা (বিমান ডাকে)
ইউরোপ : ১২১0 টাকা (বিমান ডাকে)
মধ্যপ্রাচ্য : ১২১0 টাকা (বিমান ডাকে)
বাংলাদেশ : ৩00 টাকা (রেজিস্ট্রি ডাকে)
ভারত : ১৪৫ টাকা (আন্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং)
মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা-৭00 0১৩ (ফোন : ২৪-0১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড [illegible]

সম্পাদকীয়

মূল্যস্ফীতি ও সাধারণ মানুষ

একটা সময় ছিল যখন খাদ্যরসিক হিসাবে বাঙালির নাম ছিল – তা সে সুনাম বা দুর্নাম, যাই হোক না কেন পরদেশিরা, অর্থাৎ ভিন্ রাজ্যের বাসিন্দারা, অবশ্য ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতেন, খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেই বাঙালির বেশির ভাগ কর্মক্ষমতা খরচ হয়ে যায়। দুর্মুখেরা যাই বলুন না কেন, এটা স্বীকার করতে বাধা নেই যে ভালমন্দ খাবারের প্রতি বাঙালির প্রীতি বরাবরই একটু বেশি রকমের। কিন্তু জিনিসের দাম এত চড়ে গেছে যে সব সাধারণ পরিবারেই নুন আনতে পান্তা ফুরাবার অবস্থা। সর্ষের তেল নেই। রেশনে যে রেপসিড দেওয়া হচ্ছে তা পর্যাপ্ত নয় তার ওপর রেপসিডে সাধারণ রান্নাবান্না করা সম্ভব হলেও, লোভনীয় কোন ব্যঞ্জন তৈরির ক্ষেত্রে এই তেল অচল। চাল, ডাল, শাকসব্জি, মাছ – সবকিছুরই বাজার এত গরম যে হাত দিলে ফোস্কা পড়ার জো হয়। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই বাঙালিকে তার খাদ্য বিলাস ত্যাগ করতে হয়েছে। যখন যেমন, তখন তেমন।

কিন্তু সমস্যাটা শুধু বাঙালির খাদ্যবিলাসের সংকট নয়। সমস্যাটা গোটা দেশের। ভারতের সব প্রান্তেই অবশ্য-ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম এত বেড়ে গেছে যে নিম্ন ও মধ্য আয়ের লোকেদের মাথায় হাত দেবার যোগাড়। বাজারে ভাল যা কিছু আসছে, তা সবই বিত্তবানরা টাকার জোরে দু হাত বাড়িয়ে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। যা অবশিষ্ট থাকছে, তাও মহার্ঘ। আলাদা আলাদাভাবে মাছ-মাংস, তরি-তরকারির দাম বলার প্রয়োজন নেই, যাঁরা রোজ সকালে উঠে থলি হাতে বাজারে যান, তাঁরাই জানেন কোন জিনিসটা কত দামে বিকোচ্ছে। অনেকে বলছেন, ব্যাপক খরা আর বন্যার জন্যই আচমকা এই অস্বাভাবিক মূল্যস্ফীতি।

বিষয়টা আর একটু তলিয়ে দেখা যাক। এটা ঠিকই যে এবার প্রায় গোটা ভারতবর্ষ খরায় আক্রান্ত। তাই খাদ্যাভাব দেখা দেওয়াটা স্বাভাবিক। চাহিদা বেশি, যোগান কম – সেজন্য অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী দাম বাড়তে বাধ্য। কিন্তু এই অবস্থাটা তো একটা ব্যতিক্রম। প্রতি বছরই তো এরকম ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে খরা হয় না। তাহলে জিনিসপত্রের দাম সবসময়ই এরকম ঊর্ধ্বমুখী হয়ে থাকে কেন স্বাধীনতার পর চল্লিশ বছর কেটে গেল, কিন্তু এর মধ্যে এমন একটা সময়ের কথা কি কেউ চিন্তা করতে পারেন যখন কোনও দ্রব্যের দাম কমেছে অনেক সময় সরকারি পরিসংখ্যানে জানান হয় যে পাইকারি মূল্যসূচক কমছে। কিন্তু খুচরো বাজারে তার কোন প্রভাব পড়ে না। এ এক অদ্ভুত অবস্থা!

এখনও কোন কোন সময় প্রবীণদের মন্তব্য শোনা যায়: 'বৃটিশদের যুগই ছিল ভাল – আর যাই হোক না কেন, সে সময় অন্তত খেয়েপরে বেঁচে থাকা যেত!' অনেক স্বদেশপ্রেমী হয়ত একথা শুনে ভুরু কোঁচকাবেন, কিন্তু একটু ভাবলে বোঝা যাবে যে এই মন্তব্যেরও একটা যুক্তিসম্মত ভিত্তি রয়েছে। কারণ, স্বাধীনতা পাবার পর থেকে যে হারে মুদ্রাস্ফীতির অবাধ প্রসার হয়েছে, সাহেবদের রাজত্বে তা হয়নি। ১৯00 থেকে ১৯৪৭ – এই ৪৭ বছরে পাইকারি মূল্যসূচক বেড়েছিল ২৫0 শতাংশ। কিন্তু ১৯৪৭ থেকে ১৯৮৭ – এই ৪0 বছরে মূল্যসূচক বেড়েছে অন্তত ১000 শতাংশ। সুতরাং, স্বাধীন হবার পর আমরা যে রাম রাজত্বে বাস করছি, একথা হলফ করে বলা যায় না।

মূল্যসূচকের ওঠানামার গতি একটু ভালভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে গত চার দশকে এদেশে সরকার বাহাদুর আর যাই করুন, সাধারণ মানুষদের খেয়েপরে বাঁচিয়ে রাখার কোন ব্যবস্থাই করেননি। স্বাধীনতার প্রথম বছরেই মূল্যসূচক ৩৪.৫ পয়েন্ট থেকে এক লাফে ৪২.৫ পয়েন্টে এসে পৌঁছায়। ১৯৬৫-তে সূচক প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৭১.২ পয়েন্টে এসে দাঁড়ায়। ১৯৮৭-র জুলাইয়ের হিসাব, পাইকারি মূল্যসূচক ৩৯৬.১ পয়েন্টে অবস্থান করছে।

এসব কথা বলার অর্থ এই নয় যে বৃটিশ আমলে ভারতবর্ষ সুখসাগরে ভাসত। তা যে নয়, সেটা সবাই জানেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে যে মুদ্রাস্ফীতি অনেক দ্রুত হারে বেড়েছে, পরিসংখ্যান থেকেই তা স্পষ্ট। প্রথম থেকে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উন্নয়ন খাতে সরকার প্রায় ৩,00,00 কোটি টাকা খরচ করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ তার সুফল কতটুকু পেয়েছেন আজ এমন পরিস্থিতি যে জিনিসপত্রের দাম চড়চড় করে বাড়ছে, ব্যবসায়ীরা মুনাফা লুটছে, আর সরকার প্রায় অসহায় দর্শকের মত [illegible]

সরকারের গড়িমসিতে ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীদের দুর্ভোগ

রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি নিয়েছেন। মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমলারা প্রায়ই এই কর্মসূচির কতটা বাস্তবায়ন হয়েছে সংবাদপত্রে তার হিসেব দেন। কর্মসূচিগুলি সতিাই খুব ভাল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারি দপ্তরের গড়িমসিতে এইসব কর্মসূচি রূপায়ণে অযথা বিলম্ব হয়।

আমি একটি ক্ষুদ্রশিল্পের মালিক। এই শিল্প স্থাপন করতে গিয়ে আমাকে অনেক যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছে। যে প্রকল্প চার মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়ার কথা, তা সম্পূর্ণ হতে বছর গড়িয়ে যায়। অনুন্নত এলাকায় ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে রাজ্য সরকার যেসব ভর্তুকি দেয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা যথাসময়ে পাওয়া যায় না। যেমন অনুন্নত এলাকায় ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করলে মেশিনের মোটদামের ওপর ১৫ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়া হয়। এবং দেওয়া হয় মোট মূলধনের দশ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়া হয়। এবং দেওয়া হয় মোট মূলধনের দশ শতাংশ সিড মানি অথবা মারজিনাল মানি হিসাবে। কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্প যাঁরা স্থাপন করেছেন তাঁদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা এই সব ভর্তুকি পাওয়ার সময় এক বছরের অধিক তো বটেই, কোন কোন ক্ষেত্রে তিন বছরও পেরিয়ে যায়। সরকারি দপ্তর থেকে ভর্তুকি বা অনুদান আদায়ে অযথা বিলম্ব হওয়ায় অনেক ক্ষুদ্র শিল্প শেষ পর্যন্ত স্থাপন করাই সম্ভব হয় না। এমনকি জন্মলগ্নেই তার মৃত্যু ঘটে। তাই রাজ্য সরকারের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, ক্ষুদ্র শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে অনুদান ত্বরান্বিত করতে রাজ্য সরকারের অফিসাররা সজাগ হোন।

উজ্জ্বল সেনগুপ্ত
শিবপুর, হাওড়া

শ্রীলংকা পরিস্থিতি : এখনো সময় আছে

শ্রীলংকায় পরিস্থিতির যেভাবে দ্রুত অবনতি ঘটছে তাতে [illegible] হিসেবে আমাদের [illegible] রয়েছে। কেননা, ভারত-শ্রীলংকা চুক্তি অনুসারে শ্রীলংকায় শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায় ভারতের ঘাড়ে এসেই পড়েছে। অথচ ভারত শ্রীলংকার তামিলদের স্বার্থরক্ষার জন্যই সরাসরি মধ্যস্থতার ভূমিকা নিয়েছিল, কিন্তু আজ ভারতই তামিল-হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হচ্ছে।

তামিল গেরিলাদের অস্ত্র-সমর্পণে বাধ্য করার নামে যেভাবে ভারতীয় শান্তিরক্ষা বাহিনীর সেনারা আক্রমণ চালাচ্ছে তাতে তামিলরা রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। খবরেই জানা যাচ্ছে যে, শান্তিরক্ষা বাহিনীর সংগে সংঘর্ষে তামিল গেরিলারাই নিহত হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি। এটা হয়তো ঠিক যে, গেরিলারা চুক্তির প্রতি আস্থা না রেখে অস্ত্রকেই সম্বল করতে চেয়েছেন, ফলে পরিস্থিতি বিপজ্জনক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু ভারতীয় শান্তিরক্ষা বাহিনী কি শ্রীলংকায় গিয়েছে তামিল গেরিলাদের হত্যার দায়িত্ব নিয়ে? ভারত সরকার কি মনে করেছেন যে, গায়ের জোরে গেরিলাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাঁদের শায়েস্তা করার মাধ্যমেই কাজ সম্পন্ন করবেন? তাহলে নিশ্চয়ই ভারত সরকার আরেক ভ্রান্ত নীতির শিকার হবেন। এখনো সময় আছে, ভারত সরকারের উচিত শান্তিরক্ষা বাহিনীকে সংযত করা এবং যুদ্ধবিরতি ঘোষণার মাধ্যমে তামিল গেরিলাদের সংগে আলোচনার সুনির্দিষ্ট পথ খুঁজে বের করা। ভারতবাসী হিসেবে এটাই আমার বিনীত আবেদন।

অনির্বাণ গুপ্ত
কলকাতা ২৬

বিভূতিভূষণের ভিটেবাড়ির জীর্ণদশা এবং সরকারের দায়িত্ব

মরমী কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁর ভিটেবাড়িতে যাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সৌভাগ্য না বলে দুর্ভাগ্য বললেই বোধহয় ঠিক বলা হবে। 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক', 'ইছামতীর' অমর স্রষ্টা বিভূতি-ভূষণের পরিত্যক্ত ভিটেবাড়ির করুণ দৃশ্য যে কোন সাহিত্যপ্রেমী মানুষের মনে গভীর বেদনার সৃষ্টি করবে। বনজংগল, আগাছায় ভরা বাড়িটির জীর্ণ দশা দেখে [illegible] কঠিন এটা তাঁরই বাড়ি ছিল যাঁর কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত করে সত্যজিৎ রায় বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্রকার হয়েছেন।

বনগাঁ থেকে ট্রেনপথে বা বাসে মাত্র কয়েক মাইল দূরে গোপালনগর গ্রাম। সেখান থেকে হাঁটাপথে বা রিক্সায় কাঁচা রাস্তায় আরও ভেতরে ইছামতীর তীরে বিভূতিভূষণ একদা তাঁর ভদ্রাসনটি তৈরি করেছিলেন। কৌতূহলী বা সাহিত্যপাগল অনেক মানুষ এমনকি কলকাতার স্বনামধন্য অনেক কবি-সাহিত্যিক কষ্ট করে কখনও-সখনও সেখানে পায়ের ধুলো ফেলেছেন, সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন, এই সাহিত্যতীর্থকে সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন। গ্রামের রাস্তার ধুলোর মতই সে দাবি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কলকাতায় ফিরে এসে সবাই আবার তা যথাসময়ে ভুলেও গেছেন। তবুও স্থানীয় কিছু মানুষ তাঁদের গ্রামের গৌরব, তাঁদের প্রিয় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের স্মৃতিকে ধরে রাখতে চেষ্টা করছেন। তাঁদের চেষ্টায় বিভূতিভূষণ স্মৃতি পাঠাগার হয়েছে। সেখানে একটা ছোট্ট আলমারিতে সংরক্ষিত আছে সাহিত্যিকের ব্যবহার করা জামা, সোয়েটার, ক্যাম্বিসের জুতো, ভাঙা চশমা, ডায়েরি ইত্যাদি। তাঁরাই প্রতি বছর বিভূতিভূষণের জন্মদিন পালন করেন।

ব্যাস, ঐ পর্যন্তই। সরকারি কোন উদ্যোগই নেই এই কথাসাহিত্যিকের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে। শুনেছি শেক্সপিয়রের জন্মস্থান 'স্ট্রাট-ফোর্ড অন অ্যাভন' সারা পৃথিবীর সাহিত্যপ্রেমীদের তীর্থস্থান। বৃটিশ সরকার পাঁচশো বছর আগের সেই প্রাচীন গ্রামটিকে অবিকৃতভাবে সংরক্ষণ করার সবরকম ব্যবস্থাই করেছেন। কিন্তু এদেশে তা হয় না। ন্যূনতম চেষ্টাও সরকার করেন না সেই সব স্মৃতিবিজড়িত কবি-সাহিত্যিক বা মনীষীদের ভিটেবাড়িকে সংরক্ষণ করার, বিশেষ করে সেগুলি যদি কলকাতা থেকে দূরে কোন গ্রামে হয়। আর মাত্র কয়েক বছর পরেই তো শহুরে সাহিত্যসেবীরা বিভূতিভূষণের জন্মশতবার্ষিকী পালন করবেন। এবং তা সীমাবদ্ধ থাকবে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাহিত্য-পত্রিকা বা অন্যান্য পত্রিকাগুলির পাতায়। তবুও একটু আগে থেকেই পত্রলেখক [illegible] করছেন – কিছুই কি করা যায় না বিভূতিশতবার্ষিকীতে তাঁর গ্রামের ভিটেবাড়িকে সংরক্ষণ করার?

পুষ্পিতা দাস,
কলকাতা ৩৫

কলকাতার রূপ-বদল যেন স্থায়ী হয়

কৈশোরের স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল। বালিগঞ্জ থেকে সোজা ট্রামলাইন ছিল ধর্মতলায়। ভবানীপুর হয়ে সেণ্ট পলস ক্যাথিড্রাল গির্জার পিছনে দিয়ে সন্ধ্যার সময় কখনও দ্রুত, আবার কখনও বা ধীরগতিতে যাওয়া ট্রামে চড়ে যেতে খারাপ লাগত না।

খারাপ এখনও লাগে না ট্রামে চড়তে। কিন্তু সময়, কালের মিছিলে অনেক কিছু হারিয়ে যায়। অথচ ভীষণভাবে ইচ্ছে হয় সেই হারিয়ে যাওয়া জিনিসগুলোকে ফিরে পেতে। ফিরে পাব কিনা জানি না।

জোব চার্নকের এই শহর কলকাতাকে গতিময় করতে এখানে শুরু টালাথেকে টালিগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকায় খোঁড়াখুঁড়ির কাজ। দক্ষিণের একাংশ আপাতত শেষ। কিন্তু পুরনো জায়গা দিয়ে ট্রাম চলে না। তা না চলুক। কিন্তু অনেক পার্ক এবং তার সংগে হারিয়ে গেছে সবুজের সমারোহ।

ইদানীং আবার দেখছি কল্লোলিনী কলকাতাকে তিলোত্তমা করা হচ্ছে। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ফিরিয়ে দিচ্ছেন আমাদের কাছে আমাদের প্রিয় শহরকে।

পাতাল রেলের কাজের জন্য ময়দানের বিস্তীর্ণ জায়গায় যে সব বড় বড় গাছ তুলে ফেলা হয়েছিল সেখানে আবার গাছ লাগানো হচ্ছে। বিশাল পুকুরটার ধার দিয়ে আবার সেই অতীতের ছোট পাঁচিলটা ফিরে এসেছে। সেই সংগে ছোট্ট একটা বাগানও উপরি পাওনা। জন্মদিনের পোশাক পরেছে মনোহরদাস তড়াগের সংলগ্ন অঞ্চল। এবং অবশ্যই খোদ ধর্মতলাও। কিন্তু কতদিন কারণ, রিলায়েন্স কাপ ও সাফ গেমস উপলক্ষে এই শহরের বুকে সুসজ্জিত তোরণগুলোরও কিন্তু খেলা ভাঙার পর ভেঙে যাবে।

এগুলোকে কি চিরস্থায়ী করে রাখা যায় না অনেকেই হয়তো নেতিবাচক উত্তর দেবেন। আমি তাঁদের দলে নই। বিশেষ খেলা [illegible] সাজানো কলকাতাকে

এভাবেই রূপসী রাখা যায় বলে আমার ধারণা।

সময়ের সংগে পাল্লা দিয়ে এখানে তৈরি হয়েছে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম। পাতাল রেলও। আরও কিছু তৈরির অপেক্ষায় রয়েছে। তবে কেনই বা এখান থেকে আবার সরে যাবে ফোয়ারা? অন্ধকারেই বা হারিয়ে যাবে কেন ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের নৈশ বাহারী আলোর খেলা?

কালীঘাট, হাজরা পার্কও আবার তার পুরনো আদলে ফিরছে। সেখানে আবার শিশিরবিন্দুর মত অনেক সন্ধ্যা নামবে কিনা জানি না। কিন্তু যা জানি তা হচ্ছে হকার, ঝুপড়ি এবং আংশিকভাবে ভিখিরিমুক্ত করে কলকাতাকে রাখা যায়। সাময়িক বলে কোন কিছু হতে পারে না। বিশেষ করে এই শহরে।

আপনাদের সাপ্তাহিকে অনেক গৌরচন্দ্রিকা করে এই চিঠি লেখার কারণ হচ্ছে আপনারা তিলোত্তমা কলকাতার জন্য একটা জনমত গড়ে তুলুন। আপনারা অতীতেও জনমত গঠনে এগিয়ে এসেছিলেন। আশা, এবারও আসবেন।

সায়ন্তনী মুখোপাধ্যায়
কলকাতা ২৬

সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে না তো?

সম্প্রতি রেল কর্তৃপক্ষ প্রতিটি রেলওয়ে স্টেশনে ফুলের বাগান করে সাজাচ্ছেন। প্ল্যাটফর্মের কিছু কিছু জায়গা ঘিরে নানা মরশুমি ফুল ও দামী বাহারি গাছ লাগানো হয়েছে। সাধু প্রচেষ্টা কোন সন্দেহ নেই। ফুলবাগান এবং গাছ একই সংগে যেমন পরিবেশকে সুন্দরতর করে তোলে তেমনি দূষণমুক্ত রাখতেও সাহায্য করে। কিন্তু বাগান করলেই কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না, বরং কর্তব্য আরও বেড়ে যায়। তা হোল, সেই বাগানকে রক্ষা করা এবং যথাযথ পরিচর্যা করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় অযত্ন এবং অবহেলায় অনেক স্টেশনের বহু দামী ফুল এবং বাহারি গাছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গাছের গোড়ায় জমছে আগাছার জংগল। যে কোন পুষ্পপ্রেমিক বা বৃক্ষপ্রেমিকের কাছে মানসিক পীড়ার কারণ। শুধু তাই নয় জলের মত অর্থও তো ব্যয় করা হচ্ছে এইসব গাছ লাগানোর জন্য। খোদ শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেও এ দৃশ্য দেখা যায় – সুন্দর কারুকাজ করা রঙিন টবে পরিচর্যার অভাবে ধুঁকছে। অথচ পরিচর্যা করার জন্য মাইনে করা লোক আছে। তবুও এই অবহেলা আর অযত্ন কেন?

অমিতাভ সরকার
হাবড়া, উঃ ২৪ পরগনা

মেয়র কমল বসু একটু নজর দিন

উত্তর কলকাতার বাগবাজারের চক্ররেল স্টেশনের পাশে পৌরনিগম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে পাহাড় সমান বিস্তৃত পচা জঞ্জালের সমস্যার কথা জানাবার জন্য মাননীয় মেয়র কমল বসু মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হচ্ছি। প্রসংগত উল্লেখ করা যায় যে, পৌরসংস্থার উদ্যোগেই এই বিদ্যালয়ের পাশে আবর্জনা ফেলার জন্য একটি ভ্যাট তৈরি করা হয়েছিল কিন্ত দুঃখের বিষয় পৌরসংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মীদের অলসতার জনাই হয়তো সেটি আর প্রতিদিন পরিষ্কার করা হচ্ছে না। এখন সেই জায়গাটা পচা জঞ্জালের মৃতপশু আর নানা প্রকার অশৌচতার কাপড়ের ছেঁড়া অংশের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। অফিসযাত্রীরা চক্ররেলের টিকিট কিনতে গিয়ে বেশ বিব্রত বোধ করেন। গত বছরে সেই বিদ্যালয়ের নিচের তলায় কলকাতা পৌরসংস্থা একটি এ্যাম্বুলেন্স স্টেশন স্থাপন করে স্থানীয় পল্লীবাসীর সুবিধার্থে। সেইদিন বাগবাজার শাখার ছিন্নমূল শ্রমজীবী অধিকার সমিতির পক্ষ থেকে একটি লিখিত বিবরণ দেওয়া হয় উক্ত সমস্যার কথা জানিয়ে, কিন্তু তার প্রতিকার আজও অবধি হয়নি। আমার মনে হয়েছে আসলে পৌরসংস্থার গাফিলতিই এর প্রধান কারণ।

রঘুনাথ ভট্টাচার্য,
শংকর চক্রবর্তী
বাগবাজার, কলকাতা-৩

শিশুদের স্কুলে ভর্তি না শিশুমেধ যজ্ঞ?

এ বছরে রাজ্য সরকার হঠাৎ প্রথমশ্রেণীতে ভর্তির বয়স ১ বছর কমিয়ে দিয়ে অভিভাবকদের বিপদে ফেলে দিয়েছেন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার নামে যা চালাচ্ছেন তার কি কোনো প্রতিকার নেই? এবং এর ফলে নিরীহ শিশুরা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাও কেউ ভেবে দেখছেন না? সরকারি ঘোষণার পরপরই বহু স্কুলে ঘুরে দেখা গেল স্কুল কর্তৃপক্ষ ৫ বছর বলতে ১৯৮৭-র ১লা এপ্রিলে ৫ বছর হতে হবে বলে ধরছেন। যাদের বয়স এপ্রিল ৮৭-র পর ৫ বছর হচ্ছে তারা এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার যাঁরা ৬ বছর হলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করবেন ঠিক করেছিলেন তাঁরাও দিশাহারা হয়ে পড়েছেন।

অন্যদিকে কিছু নাম করা স্কুলে ভর্তির নামে অরাজকতা চলছে। সেখানে ফর্ম বিলি করা হচ্ছে যথেচ্ছ। অর্থাৎ স্কুলগুলি নির্দিষ্ট মূল্যে যত খুশি ফর্ম বিক্রি করে কিছু অর্থ উপার্জন করছেন। এবং ইনটারভিউ ও পরীক্ষার সময় তিন চার বছরের বাচ্চাদের নিছক হয়রানি করা হচ্ছে। যেখানে ছশো সাতশো পরীক্ষার্থী এবং তাদের বয়স বড়জোর চারবছর সেখানে কী দেখে কর্তৃপক্ষ নির্বাচন করেন তা এক বিরাট রহস্য। এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে তবেই প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি করা উচিত যাতে কোনোরকম সংশয়র অবকাশ না থাকে।

সর্বাণী ব্রহ্মচারী
কলকাতা-১১

সুসজ্জিত কলকাতার প্রেক্ষাগৃহের দুরবস্থা

সম্প্রতি রিলায়েন্স কাপ ও সাফ গেমস্ উপলক্ষে কলকাতাকে নানাভাবে বর্ণময় করে তোলার চেষ্টা চোখে পড়ছে। এসময়ে কলকাতায় যে বিপুল সংখ্যায় বিদেশি আসবেন তাঁদের কথা মনে রেখেই এ ব্যবস্থা। কিন্তু ধর্মতলা এলাকার একাধিক প্রেক্ষাগৃহে ঘুরে এসে মনে হচ্ছে যে এইসব প্রেক্ষাগৃহেও উদ্যোক্তাদের নজর পড়া উচিত ছিল। ধর্মতলা এলাকার অধিকাংশ প্রেক্ষাগৃহেই ভদ্রস্থ টয়লেট নেই। টয়লেট-এর নামে যা আছে তা নরকতুল্য। হলগুলির সিটের অবস্থা অসহ্য ও বিপজ্জনক। পর্দাগুলি হল শুরু হবার পর বোধকরি আর বদলানো হয়নি। দেওয়াল বিবর্ণ। অথচ বিদেশি অতিথিরা কি এসব প্রেক্ষাগৃহে যাবেন না বলে ধরে নেওয়া হয়েছে? খোদ ধর্মতলা মোড়ে গাড়িবারান্দার ওপর থেকে পাইপ ফেটে নোংরা জল পড়ছে যা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু এবং অস্বাস্থ্যকর।

অভিমন্যু চক্রবর্তী
কলকাতা-১১

স্ববিরোধী প্রচ্ছদকাহিনী

দীর্ঘদিন পর প্রকাশিত 'পরিবর্তন' পেলাম। বাজারে বেশ কয়েকদিন ধরেই শুনছিলাম 'পরিবর্তন' প্রকাশিত হতে চলেছে। একজন অনুরাগী পাঠিকা বলেই হয়তো আগ্রহ জেগেছিল। নতুন পর্যায় 'পরিবর্তন' বেশ খানিকটা নতুনভাবে এলো পাঠকের দরবারে। 'ধর্মস্থানে সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য' গুচ্ছ প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ততখানি ভালো লাগল না। পরস্পর বিরোধী প্রতিবেদনে কেমন যেন হোঁচট খেলাম। 'পরেশনাথ মন্দির' সম্পর্কে আপনারাই লিখলেন 'মন্দিরে নির্ভয়ে যান'। যাক সে ব্যাপার। শিশুদিবস উপলক্ষে প্রতিবেদনটি বেশ ভালো লাগল। লেখা পড়ে মনে হল 'জীবিকার সন্ধান' অনেকদিন আগেকার লেখা কারণ প্রকল্পগুলিতে যে বাজারদর দেখানো হয়েছে তা সত্যিই হাসির ব্যাপার। সৌরেন মিত্রের লেখা 'সত্যজিতের সুকুমার রায়' বেশ পরিণত। আচ্ছা আমাদের সমালোচনা বা মতামত আপনাদের কাছে মৌখিকভাবে দেওয়া যায় না? ব্যাপারটা ভাবতে অনুরোধ করি।

স্মিতা বিশ্বাস
জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জংশন

চৌষট্টি পাতা কেন?

১৯ নভেম্বর সকালে বহু আকাঙ্ক্ষিত 'পরিবর্তন' পেয়ে মনটা ময়ূরের মতো নেচে উঠেছে, শুধু তাই নয় এক দৈনিকেও বিজ্ঞাপন দেখলাম 'পরিবর্তন, খেলার আসর, সুকন্যা' এখন নিয়মিত পাওয়া যাবে। সত্য সত্যই ভীষণ আনন্দ অনুভব করছি। আপনারা বহুদিন পর এই শুভ উদ্যোগ নিয়ে সুরুচিসম্পন্ন পাঠকদের অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করে পাঠ ক্ষুধা মেটাবেন তার জন্য অজস্র আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

'ধর্মস্থানে সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম' প্রতিবেদনটি বেশ সময়োপযোগী। আপনাদের প্রতিশ্রুতি ছিল সম্পূর্ণ আশি পাতার বই, ভিন্নস্বাদের। কিন্তু ১৮-২৪ নভেম্বর সংখ্যাটি চৌষট্টি পাতার। কেন? অন্যান্য পত্র-পত্রিকার মতো 'পরিবর্তন'-এ চলচ্চিত্র সমালোচনা, টালিগঞ্জের কড়চা এই জাতীয় অথবা তদন্তমূলক লেখা চাই।

শ্যামলী দত্ত
ভবানীপুর, কলকাতা-২৫

জাফনা : বাঘের মুখোমুখি বাঘ



২৯ জুলাই, ১৯৮৭। শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোয় রাষ্ট্রপতির আবাস, সপ্তদশ শতকের ওলন্দাজ নকশায় তৈরি বেতের কাজকরা সিলিং, মোজাইকের মেঝে, শামুকের খোলার আকারের সিন্দুক, কাঠের ক্যাবিনেট, আবলুস কাঠের সোফা আর সেন্টার টেবিলে সজ্জিত সম্মেলন কক্ষে ভারত-শ্রীলংকার বিশিষ্ট রাজনীতিক ও ঝানু সরকারি আমলাদের ভিড়। অপেক্ষা শুধু দু-দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের আসার। একসময় তাঁরা এলেন, দেখলেন আর সই দিলেন চুক্তিতে। না, জয় কিছুই করলেন না। কারণ জয় করার মত কিছু ছিল না, অন্তত সে সুযোগ তাঁরা নিজেরাই রাখেননি। চুক্তি পরবর্তী ঘটনাবলীই প্রমাণ করে দিচ্ছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তথা চুক্তিমন্ত্রীর আরেক ব্যর্থতা। তবে তামিল বংশোদ্ভবদের ওপর সিংহলি অত্যাচারের আধুনিক নায়ক চুক্তি স্বাক্ষর করে ভারতের হাত-পা কঠিন বাঁধনে বাঁধতে পেরে মনে হয় বেশ উল্লসিত। উল্লাসের আর কয়েক ভাগীদার ভারত মহাসাগরকে যারা ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শক্তিকেন্দ্র করতে বহুকাল ধরে ইচ্ছুক।

কেউ কেউ এই চুক্তিকে বলছেন ইতিহাস রচনা। আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে তো আবার মার্কিন কংগ্রেসের ব্যক্তিত্বময় এক পুরুষ ডেমোক্র্যাট দলের স্টিফেন সোলার্জ ৪ আগস্ট প্রস্তাব দিয়েছেন এবছর নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হোক রাজীব গান্ধী ও জুনিয়াস রিচার্ড জয়বর্ধনেকে (যদিও ফাঁকতালে সেটি বাগিয়ে নিয়েছেন দক্ষিণ আমেরিকার আর এক রাজনৈতিক নেতা)। অতএব পড়ে আর কিছুই রইল না। শুধু রইল জয়বর্ধনের সূক্ষ্ম চালে রাজীবের কিস্তি মাৎ। প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনে আর তাঁর প্রধান সাকরেদ উগ্র তামিল-বিরোধী প্রধানমন্ত্রী রণসিংঘে প্রেমদাস ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ললিথ অতুলাথমুদালি এখন আয়েস করে দেখছেন ভারতীয় শান্তি সেনার হেনস্তা আর অন্যদিকে ঘরে-বাইরে চলছে ভারত সরকারের মুন্ডপাত। ভারতীয় উপমহাদেশে বড় দাদার ভূমিকা পালন করতে গিয়ে





শ্রীলংকা নিয়ে এদেশে সাধারণ মানুষের এখন প্রধান প্রশ্ন : শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ভারতকে সেখানে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হল কেন ? এই যুদ্ধ কি অনিবার্য ছিল ? ২৯ জুলাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এবং শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জুনিয়াস জয়বর্ধনে যে চুক্তি সই করলেন, তা যথাযথভাবে রূপায়িত হলেও কি তামিল সমস্যার সমাধান হবে ? শ্রীলংকায় এখন পর্যন্ত যে যুদ্ধ চলছে, তাতে ভারতীয় বাহিনীকে বেশ ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে, বিপুল পরিমাণে সৈন্য সমাবেশ করতে হয়েছে, ব্যবহার করতে হয়েছে অত্যাধুনিক ট্যাংক, বোমাবর্ষণের জন্য আনতে হয়েছে বিশেষ ধরনের হেলিকপ্টার। টাইগাররা যদি গেরিলা কৌশলে প্রতিরোধ চালিয়ে যায়, তাহলে কি জাফনা শেষে ভারতের ভিয়েতনামে পরিণত হবে ? কে এই প্রভাকরণ যিনি গোপন ঘাঁটি থেকে টাইগারদের লড়াই পরিচালনা করে চলেছেন ? শ্রীলংকা নিয়ে এই নিবন্ধগুচ্ছে এইসব জটিল ও দুরূহ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।



ভারতের আজ ল্যাজেগোবরে অবস্থা।

শ্রীলংকার ঘরোয়া ব্যাপারে ভারতের পক্ষে ঠিক এই সময়ে এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের কী প্রয়োজন ছিল তার হিসেব করতে বসলে সরল অংক যা বেরিয়ে আসে তা হল, নানা কারণে রাজীব গান্ধীর ভাবমূর্তি আজ সারা বিশ্বে খুবই অনুজ্জ্বল। তাছাড়া নিজের দেশেও রাজীব সরকার ক্রমাগত নানা চাপে নাজেহাল। অতএব এই সময়ে আঞ্চলিক নিরাপত্তার ধুয়ো তুলে যদি তথাকথিত শক্তিহীন প্রতিবেশীর ঘরোয়া কোঁদল মেটানোর মহান কাজে আত্মনিয়োগ করা যায়, তবে দেশে-বিদেশে লোকের চোখ ঘুরবেই। আর চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সপ্তাহ কয়েক পর অবধি ঠিক তাই হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে রাজীব গান্ধী সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু সে বড়ই স্বল্প সময়ের জন্য। আসলে যে সমস্যা শ্রীলংকায় সুদীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে জ্বলছে তার সমাধান রাজীব গান্ধীর হাতের মুঠোয়, এমন ভাবাটাই বুদ্ধিহীনের পরিচয়। আর তা করতে গিয়েই আমরা পড়েছি ফাটা বাঁশের ফাঁদে।

এ প্রসঙ্গেই এসে পড়ে চুক্তিপত্রের প্রতিশ্রুতিমত দেশের উত্তর ও পূর্ব প্রদেশ একটিমাত্র প্রশাসনের আওতায় আনার বিলে (যাতে করে তামিলরা এক অর্থে 'হোমল্যান্ড'-এর স্বাদ পান) শ্রীলংকার পার্লামেন্টের অনুমোদন। গত ১২ নভেম্বর শ্রীলংকার

সংসদে তামিল সংখ্যালঘু বিলটি বিপুল সংখ্যাধিক্যে পাস হয়ে যায়। শোনা গিয়েছিল এই বিলের বিরুদ্ধে শাসক দলের মধ্যেই রয়েছে বিরাট বিক্ষোভ। কিন্তু তা মিথ্যা প্রমাণিত হল, যখন দেখা গেল ট্রেজারি বেঞ্চে তিনজন ছাড়া বাকি সব সদস্যই উপস্থিত রয়েছেন। যদিও এখনও শ্রীলংকায় হিংসার কমতি মোটেই নেই তবুও বিলের সপক্ষে ভোট দেন ১৩৬ জন সদস্য এবং এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন কম্যুনিস্ট পার্টি সদস্য ডি ই ডবল্যু গুনাসেকারা। এর বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন শাসক দলের অন্যতম উগ্র সিংহলি সমর্থক সদস্য প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী সিরিল ম্যাথু-সহ ১১ জন সদস্য এবং শাসক দলের মাত্র দুজন সদস্য ভোটদানে বিরত থাকেন।

তবে লক্ষণীয়, যে প্রধানমন্ত্রী আর.প্রেমদাস প্রথমাবধি ভারতের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে আসছিলেন, যিনি রাজীব গান্ধীর শ্রীলংকা সফরে কোন অবস্থাতেই তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করেননি নিজের উষ্মা জানাতে, সেই তিনিও জয়বর্ধনের অনুরোধে এই বিলের সপক্ষে প্রবল সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। তবে শ্রীলংকা পার্লামেন্টে এই বিল নিয়ে দীর্ঘ তিনদিন বিতর্ক চলাকালীন তিনি মন্তব্য করেছেন, 'যদিও এই বিলে স্বশাসনের প্রস্তাব শ্রীলংকার ইউনিটারি চরিত্রের কোন ক্ষতি করবে না, তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি জাফনায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাণ দেবার মত আত্মত্যাগের কোন দরকারই ছিল না, যদি না নয়া দিল্লি চার বছর ধরে তামিল-উগ্রপন্থীদের অস্ত্রশস্ত্র যুগিয়ে, ট্রেনিং দিয়ে আস্কারা দিত।'

এর আগে বিরোধীপক্ষের নেতা আনুরা বন্দরনায়েকে বলেছিলেন, 'গান্ধী-জয়বর্ধনে চুক্তি এই দ্বীপে শান্তি ফিরিয়ে আনার বদলে নিয়ে এসেছে আরও বেশি হিংসা'। তিনি দাবি করেছেন, জাফনা দখল করাটা শ্রীলংকার সেনাবাহিনীর পক্ষে অনেক সহজ হত এবং তাতে হতাহতের সংখ্যাও এত বাড়ত না। কিন্তু তারা তা করতে পারেনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর বাধাদানের ফলে। তিনি সরকারকে দোষী সাব্যস্ত করে বলেন, 'আপনারা যদি ভারতের সংগে আরও বুদ্ধিমত্তা এবং সুসংবদ্ধভাবে ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা চালাতেন তবে তারা কিছুতেই তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে আমাদের ওপর তর্জনগর্জন চালাতে পারত না। আপনারা তাদের যেমন ধমকধামক দিয়েছেন, ঠিক তেমনি তারাও উল্টে ধমকেছে, আর ক্ষতির মধ্যে হয়েছে সেই ধমকানিতে আপনারা ভয়ে সেঁধিয়ে গেছেন।'

কিন্তু ঘটনাবলী প্রমাণ করছে প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনে ধমকানিতে ভয় পাবার মানুষ তো ননই, বরঞ্চ চতুর চূড়ামণি। একটা সময় ছিল যখন তিনি ভারতের বন্ধুত্বের আহ্বান



প্রেসিডেন্ট জুনিয়াস রিচার্ড জয়বর্ধনে : 'উনি যদি খাঁটি বৌদ্ধ হতেন তবে আজ আমাকে বন্দুক বয়ে বেড়াতে হত না'—প্রভাকরণ

অস্বীকার করে বেছে বেছে এমন দেশের সহযোগিতা প্রার্থনা করছিলেন যাদের সংগে ভারতের সম্পর্ক বন্ধুত্বহীন অবস্থায় না হোক, চিড়ধরা সম্পর্কমাত্র বজায় আছে। এর একটা কারণও ছিল। তার জন্য আমাদের দেখতে হবে পিছু ফিরে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ভারত সবচেয়ে বড় দেশ। তাই স্বাভাবিকভাবে তার চিন্তা থাকেই আঞ্চলিক নিরাপত্তার প্রশ্ন ঘিরে। আর এই প্রশ্ন ঘিরে যতবারই আমরা নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে গেছি ততবারই জাতীয় নেতাদের ভুল পদক্ষেপের ফলে আমাদেরই পা পুড়েছে। তার প্রথম উদাহরণ ১৯৫০ সালের ৬ ডিসেম্বর নেপালের ঘটনায়। তখন ছিল জওহরলাল নেহরুর আমল। নেহরু চেয়েছিলেন 'রানা শাসন-এর অবসান ঘটিয়ে নেপালি কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক শক্তির সহায়তায় নেপালে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু পরের বছরই 'রানা শাসন'-এর কিছু হাতগুনতি সমর্থককে ঠান্ডা করতে যেতে হল ভারতীয় সেনাবাহিনীকে। সেই 'বিপ্লবে' ভারত সরকার অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিল না বটে, কিন্তু অবস্থা বদলের প্রতিটি কার্যকর দিকই ঠিক হয়েছিল দিল্লিতে এবং রানাদের বিরুদ্ধে নেপালি কংগ্রেসের সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়ার পেছনেও ছিল দিল্লির বড় ভূমিকা।

মনে রাখা প্রয়োজন, উভয় ক্ষেত্রেই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল ভারতের আঞ্চলিক নিরাপত্তার প্রশ্নটি। নেপালে রানা শাসনকে সহ্য করা যাচ্ছিল না, যেহেতু তারা পশ্চিমী দেশগুলোর সংগে গলা জড়াজড়ি শুরু করেছিল এবং বর্মায় বিদ্রোহের পেছনে ছিল চীনা মদত। দক্ষিণ এশিয়ায় তারপর থেকেই এমন সব অবস্থার সৃষ্টি হতে লাগল, যার সংগে সংযুক্ত ছিল একদিকে যেমন আমাদের প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার প্রশ্ন, অন্যদিকে আমাদের নিরাপত্তা। নেহরুর আমল শেষ হবার পরে সেসব সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ফুটে উঠতে শুরু করল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৭১-এ শ্রীলংকার ঘটনায়, ওই বছরেই ডিসেম্বরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের জন্মে এবং ১৯৭৪-৭৫-এ সিকিমের ভারতভুক্তিতে।

একইভাবে বর্তমান শ্রীলংকায় যা ঘটে চলেছে তার প্রতিক্রিয়া একা ভারতকেই সামলাতে হচ্ছে এবং হবেও। ২৯ জুলাই যে চুক্তি হয়ে গেল তার মাস দুই আগে আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনের হেরিটেজ ফাউন্ডেশন শ্রীলংকার সমস্যা নিয়ে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে এক দলিল পেশ করে। তাতে তারা প্রস্তাব করেছিল শ্রীলংকার জাতিসমস্যায় ভারতেরই মধ্যস্থতা করা দরকার। এ প্রস্তাবে আপাতদৃষ্টিতে কোন বদ মতলব দেখা না গেলেও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মার্কিন ঘোঁটের গন্ধ পেয়েছিলেন। আর এখন চুক্তি-পরবর্তী ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে মার্কিন প্রস্তাব ঠিকই দেখতে পেয়েছিল যে ভারত ক্রমশ শ্রীলংকাকে নিজের ভিয়েৎনাম বানাবার ফাঁদে পা দিয়ে ফেলছে। আসলে জয়বর্ধনেকে দিয়ে ভারত নামক কাঁটা উপড়ে ফেলে মার্কিন সরকার শ্রীলংকায় পরোক্ষে নিজের অধিকার কায়েম রাখতেই চেয়েছে। আর সে জালে ভারতকে জড়িয়েছেন রাজীব গান্ধী।

শ্রীলংকায় সংখ্যালঘু তামিলদের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলিদের নারকীয় অত্যাচার আজকের ঘটনা নয়। এ এক ধরনের প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে। এতদিন ভারতীয় বংশোদ্ভব তামিলদের জন্য যেটুকু সমবেদনা বা উৎকণ্ঠা জানাবার তা ভারত যথাযথভাবেই জানিয়ে আসছিল। কিন্তু আমেরিকা যেদিন থেকে ভারত মহাসাগরে নিজেদের ঘাঁটি গাড়বার মানসে শ্রীলংকাকে নিজের কব্জায় নিয়ে এল, তখনই দেখা দিল ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার প্রশ্ন। বিশ্বজুড়ে ভারতের প্রবল প্রতিবাদে সাময়িকভাবে আমেরিকা বাধা পেল বটে, কিন্তু শ্রীলংকার প্রাকৃতিক বন্দর ত্রিংকোমালিতে তার নৌঘাঁটি গাড়বার সুবিধে ইত্যাদি কোনমতেই তার মত সুপারপাওয়ার একেবারে ত্যাগ করতে পারে না। তাই এখন বেঁকা আঙুলে ঘি তোলার চেষ্টা। আসলে শ্রীলংকা কিংবা ভারত নিমিত্ত মাত্র। এ হল দুই বৃহৎ শক্তির এলাকা দখলের পুরনো লড়াই।

কিন্তু আমাদের এও ভুললে চলবে না কোন্ অবস্থার চাপে পড়ে শ্রীলংকার তামিলরা সে দেশের সরকার মায় সিংহলি জনগণের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৮ সালে শ্রীলংকা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই নানা ছুতোনাতায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলিরা তামিলদের ওপর নারকীয় অত্যাচার

চালিয়েছে। তাকে থামানো দূরে থাক, শ্রীলংকা সরকার তাতে ভালরকমই মদত দিয়েছে। একরকম উপায়ান্তর না দেখেই তামিলরা আত্মরক্ষার্থে একদিন যে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে, সে অস্ত্র আজ আর তারা কাছছাড়া করতে রাজি নয়। কারণ, চুক্তির একটা শর্ত অনুযায়ী উত্তর ও পূর্ব প্রদেশের শাসনভার একটিমাত্র শাসনব্যবস্থার অধীন থাকবে এরকম প্রস্তাবের পরেও দেখা যাচ্ছে শর্তের ফাঁকফোকর দিয়ে অনেক বেনোজল ঢুকে পড়ায় তামিলরা সতর্ক হয়ে গেছেন। প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনের চাপেই ভারতকে মেনে নিতে হয় যে, এই শর্ত কার্যকর হবে একমাত্র গণভোটের নিরিখে বিচার করেই। আর তারপরই জয়বর্ধনে জোর করে ওই প্রদেশ থেকে পুরুষানুক্রমের অধিবাসী তামিলদের হটিয়ে সিংহলি বৌদ্ধ ও মুসলমানদের বসাতে শুরু করেন, যাতে করে ভোটের সময় অধিবাসীরা দুই প্রদেশ একীকরণের বিরুদ্ধে রায় দিতে পারে। আর তাতে বহুকালের সিংহলি জাতবিদ্বেষ নীতিই জয়ী হতে পারবে।

কিন্তু ভারত কী করে এরকম একটা ত্রুটিপূর্ণ চুক্তিতে জড়িয়ে পড়ল? এমন একটা সময়ে এ চুক্তি হয়েছে যখন ভারত-শ্রীলংকা সম্পর্ক একেবারে তলবিন্দুতে পৌঁছেছিল। এই সময়ে এই চুক্তি বহুলোকের মধ্যেই আশা জাগিয়েছিল। চুক্তির ফলে তামিলরা তাদের 'ইলম' (রাষ্ট্র) পাবে, শ্রীলংকার সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষা পাবে। আর এদিকে ভারতের স্বার্থও রক্ষা পাবে। বিদেশি ঘাঁটি, বিদেশি পরামর্শদাতা এবং শ্রীলংকায় বসে বিদেশি প্রচার অনুমোদিত হবে না। এবং সর্বোপরি এ অঞ্চলে ভারতের বিশেষ ভূমিকার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ে গঠিত একটি শান্তি রক্ষা বাহিনী শ্রীলংকায় দুই যুযুধান পক্ষের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার কাজে সহায়তা করবে।

শান্তির জন্য যে কোন পদক্ষেপই কাম্য। কিন্তু যে ভুল ভারত সরকার করেছে পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে, একই ভুল হল এখানে। পাঞ্জাবে অকালি দলের সংগে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর বস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল সন্ত লংগোয়ালের সংগে। বাদ পড়েছিল উগ্রপন্থীরা। রাজনৈতিক চুক্তি মোটেও হয়নি। এখানেও ঠিক তাই হয়েছে। শ্রীলংকার শাসক দলের অন্যান্য প্রভাবশালী সদস্যদের বাদ দিয়ে এবং সর্বোপরি 'তামিল ইলম'-এর জন্য যুদ্ধরত সবচেয়ে শক্তিশালী দল 'লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলম'-এর সংগে যথাযথ কোন আলোচনায় না বসে রাজীব চুক্তি করলেন জয়বর্ধনের সংগে। যথারীতি চুক্তি কাজে রূপান্তরিত করার সময়ে একই অসুবিধে দেখা দিল। পাঞ্জাবে যেমন ভাষাগত বিভেদ এবং ভৌগোলিক সান্নিধ্য ফাজিলকা ও অবোহর বদলের ক্ষেত্রে দুর্লংঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তেমনি শ্রীলংকার ক্ষেত্রে দুটি প্রদেশ একীকরণের ব্যাপারে সেখানকার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০ ভাগ সিংহলি ও মুসলমান অধিবাসীদের মত না থাকায় গণভোটের চিন্তাই বাতুলতা হয়ে দেখা দেয়। এর পর আসে অস্বাভাবিক সময়সীমা নির্ধারণের প্রসংগ। পাঞ্জাবে এলাকা বদল, চন্ডীগড় বিনিময় এবং শতদ্রু-যমুনার মধ্যে সংযুক্তিকরণ বারবার দিন ফেলেও করা যায়নি। একইভাবে শ্রীলংকাতেও ১৫ আগস্টের মধ্যে জরুরি অবস্থা তোলা হয়নি এবং সংগত কারণেই তামিল মিলিট্যান্টরাও যুদ্ধাবসানের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অস্ত্র সমর্পণ করেননি। এবং অবস্থা আরও ঘোরালো আকার ধারণ করে যখন হস্তান্তরের মধ্যেই সরকারিভাবে ঘোষিত



এল টি টি ই-র রাজনৈতিক পরামর্শদাতা টি যোগী, মেজর জেনারেল হরকিরাত সিং ও শ্রীলংকার প্রতিরক্ষা সচিব অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে

৮ হাজার ভারতীয় সেনাবাহিনী শ্রীলংকায় উপস্থিত হয়। তারপরই শুরু হয় জয়বর্ধনের সূক্ষ্ম চালে রাজীবের একগুঁয়েমি। ১৯৮৫ সালে কলকাতার এক ইংরেজি সাপ্তাহিকের জনৈক মহিলা সাংবাদিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই আশংকাই ব্যক্ত করেছিলেন এল টি টি ই প্রধান ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণ। এখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর শক্তি দিয়ে হয়ত তামিল বিক্ষোভের অগ্রণী এল টি টি ই-কে রোখা যাবে। কিন্তু তা সাময়িক। যতদিন না তামিলদের সংগে কোন রাজনৈতিক আপসে আসা সম্ভব হচ্ছে ততদিন এই বিক্ষোভ প্রশমিত হতে পারে না।

বিপদ নিজেদের ঘরেও বাড়ছে। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় একই ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবংগ আলাদাভাবে অংশ না নিয়ে সমগ্র ভারতের সংগেই তাল মিলিয়ে পা ফেলেছিল। কিন্তু শ্রীলংকার ব্যাপারে তামিলনাড়ু যেভাবে মাথা গলিয়েছে প্রথম থেকে, তার পর রাজীব সরকারের এই ভ্রান্ত পদক্ষেপ তাদেরও চটিয়েছে। গত ১২ নভেম্বর নয়া দিল্লিতে রাজ্যসভায় শ্রীলংকা সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলাকালীন নিখিল ভারত আন্না দ্রাবিড় মুনেত্রা কাঝাঘাম-এর সদস্য ভালামপুরি জন সরকারকে এই বলে সাবধান করে দিয়েছেন যে, শ্রীলংকায় ভারত সরকার বর্তমানে যে পদক্ষেপ নিচ্ছে তাতে করে 'এ দেশের সংগে আমাদের সম্পর্কের ভাবনায় একান্ত ফাটল ধরে যাচ্ছে'। তিনি আরও বলেছেন, তামিলরা এখন নিজেদেরকেই প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছে, 'আমি কি সেই ভারতীয় সৈনিকের জন্য চোখের জল ফেলব যার আত্মত্যাগের সঠিক যুক্তি এখনও খুঁজে পাইনি অথবা এল টি টি ই-র লোকটির জন্য কাঁদব যে আমার একজন তামিল ভাই?' একইভাবে অকালি দলের এম পি বাংলাদেশ যুদ্ধের নায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা সরকারের অপরিণত পদক্ষেপের সমালোচনা করে বলেন, 'এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার জন্য আমাদের সেনাবাহিনীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, ভাবনাচিন্তাহীন এই পদক্ষেপের দায় একমাত্র ভারত সরকারের'। স্বাভাবিক কারণেই ভারতীয়রা এখন প্রশ্ন তুলছেন, রাজীব গান্ধীর ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতার প্রমাণ রাখতে আমাদের জওয়ানদের তাজা প্রাণ কেন বিদেশের মাটিতে ঝরে যাবে? জাফনা কি ক্রমশই আমাদের ভিয়েতনামে রূপান্তরিত হয়ে পড়ছে না

প্রভাত ঘোষ

জাফনার সবুজ ঘাসে রক্তের দাগ



জাফনায় যুদ্ধরত ভারতীয় শান্তিরঃ

১১ অক্টোবর। গভীর রাত। নিরন্ধ্র অন্ধকারে জাফনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে খোলা মাঠটি যেন ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ চারদিকের কঠিন স্তব্ধতাকে খান খান করে উড়ে এল একটা হেলিকপ্টার। কপ্টারের দরজা খুলে একে একে নামতে লাগলেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর সশস্ত্র জওয়ানরা। শান্তি সেনাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে জাফনা অভিযান সফল করে তুলতে এসেছেন তাঁরা। কিন্তু মাটিতে পা দিতে না দিতেই অন্ধকারে সারি সারি গাছের আড়াল থেকে ছুটে এল ঝাঁক ঝাঁক গুলি। হতচকিত জওয়ানরাও পাল্টা গুলি চালালেন। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। ৩০ জন ভারতীয় জওয়ান ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ১৮ জন সেনা বন্দী হলেন টাইগারদের হাতে।

১১ অক্টোবরের ঘটনায় বেশ কিছু জওয়ান প্রাণ হারালেও জাফনায় আড়াই হাজার জঙ্গি টাইগারকে শায়েস্তা করার জন্য শান্তি সেনারা যে অভিযান চালিয়েছেন, তা এখন মোটামুটি সফল বলা চলে। ইরাক-ইরান যুদ্ধ বা সিয়াচেনে ভারত পাক সংঘর্ষের সঙ্গে জাফনা যুদ্ধের একটা বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। জাফনায় ভারতীয় শান্তি বাহিনী তাদের জাতভাইদের 'শান্ত' করার জন্য লড়াইয়ে নেমেছেন।

শ্রীলংকার উত্তরাঞ্চলে জাফনা উপদ্বীপের সবুজ তৃণভূমি এখন রণক্ষেত্র। গত ১০ অক্টোবর থেকে সেখানে ভারতীয় সেনারা ইলম টাইগারদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত টাইগারদের হাত থেকে তাঁরা এই উপদ্বীপের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন। লড়াই প্রায় এক মাসের বেশি চলেছিল। এখনও চলছে। তবে বিক্ষিপ্তভাবে। কেন না, টাইগাররা পিছু হটেছে ঠিকই কিন্তু জনাকীর্ণ ও অসংখ্য অলিগলি বেষ্টিত জাফনা শহর থেকে এখনও তাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা যায়নি।

'অপরাশেন পবন' মোটামুটি সফল হলেও ভারতের সামরিক বাহিনীর কাছে এই অধ্যায়টা মোটেই গৌরবজনক নয়। গত এক মাস ধরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৪, ৩৬ ও ৫৪ ডিভিশনের হাজার বিশেক সেনা তামিল অধ্যুষিত জাফনায় পাঁচ দিক থেকে আক্রমণ চালিয়েছেন। ধীরে ধীরে তাঁরা প্রায় আড়াই হাজার টাইগারকে কোণঠাসা করে ফেলেন। স্বভাবতই ভারতীয় সেনাদের কাছে লড়াইটা মোটেই সুখকর ছিল না। তাদের হাতে ছিল প্রচুর গোলাবারুদ ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। তাছাড়া তাদের পেশাদারী দক্ষতা প্রশ্নাতীত। তা সত্ত্বেও ষোল দিন টানা লড়াই চলার পর সরকারিভাবে শান্তি বাহিনীর পক্ষ থেকে পদস্থ অফিসাররা স্বীকার করেন যে, এই যুদ্ধে দুজন কর্ণেল ও ১৫জন অফিসার সহ ২১৪ জন শান্তি সেনা নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন সাতশ শান্তি সেনা, গুম করা হয়েছে ৩৬ জনকে। অন্যদিকে বেসরকারিভাবে বিশ্বস্তসূত্রের খবর ভারতীয়দের পক্ষে নিহতের সংখ্যা অন্তত ৪00 হবে। প্রথমদিকে ছয় এক হাজারের ভারতীয় সেনাদল ভারত লংকা চুক্তির শর্ত হিসাবেই শ্রীলংকায় এসেছিল। কথাটা আজকে শ্লেষের মত শোনালেও সত্যি যে এই সেনাবাহিনীর নাম রাখা হয়েছিল ভারতীয় শান্তিরক্ষক বাহিনী। আসলে এর মূল উদ্দেশ্য ছিল, উত্তর শ্রীলংকার তামিল অধ্যুষিত এলাকার সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। মাত্র দু মাস যেতে না যেতেই এই বাহিনী এল টি টি ই-র মত জঙ্গি তামিল সংগঠনের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল। এল টি টি ই শুধুমাত্র একটি শক্তিশালী তামিল সংগঠনই নয়। টাইগারদের ধৈর্য এবং টিকে থাকার ক্ষমতাও যে অপরিসীম তা তাঁরা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করেছেন। তিন বছর ধরে টাইগাররা শ্রীলংকার সামরিক বাহিনীর সঙ্গে একটানা গেরিলা কায়দায় লড়াই করে এসেছেন। শ্রীলংকার সামরিক বাহিনীকে রীতিমত ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল তরুণ টাইগাররা। এহেন একটি সুদক্ষ ও সুসংহত সংগঠনের সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীকে লড়তে হচ্ছে একটা বিদেশি রাষ্ট্রে। ভারতীয় বাহিনীর পেশাদারী দক্ষতা থাকলেও গেরিলা পদ্ধতিতে লড়াইয়ের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না। তাছাড়া শান্তিবাহিনীর প্রতি কড়া নির্দেশ ছিল, কোনভাবেই যেন সাধারণ নিরপরাধ মানুষের ওপর আঘাত না পড়ে বা তাদের ঘরবাড়ি যেন ধ্বংস না হয়। সেজন্য জাফনাকে টাইগারদের হাত থেকে মুক্ত করতে ভারতীয় বাহিনীকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

শান্তি সেনার পদস্থ অফিসাররা এল টি টি ই-র সামরিক শক্তির বিশ্লেষণেও ভুল করেছিলেন। তাঁরা ভাবতে পারেননি যে, এইভাবে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এল টি টি ই-র কর্মীরা ভারতীয় সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। জাফনায় যাবার প্রতিটি রাস্তায় পাতা থাকত শক্তিশালী মাইন (ক্লেমোর মাইন)। তাছাড়া পথের ধারে কোন খালি ড্রামের ভিতর রাখা হত বিস্ফোরক পদার্থ। পরিত্যক্ত বাড়িগুলোর ভিতর থাকত অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা যাকে প্রায় এক কিলোমিটার দূর থেকে রেডিও কন্ট্রোলের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হত। এইরকম একটা বিস্ফোরণেই ২৯জন শান্তি সেনা নিহত হন। টাইগারদের জঙ্গিপনা রুখতে শান্তিসেনা কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারের কাছে টি-৭২



নী : রক্ষক আজ ভক্ষকের ভূমিকায়

সেনাদের মস্ত বড় সমস্যা হচ্ছে সাধারণ মানুষের থেকে টাইগারদের আলাদা করে চিহ্নিত করা। টাইগাররা এই লড়াইয়ে অসামরিক তামিলদের এমনভাবে জড়িয়ে ফেলতে সমর্থ হয়েছে যে ভারতীয় জওয়ানরা আলদাভাবে টাইগারদের চিহ্নিত করে লড়াই করতে পারছেন না। জাফনা নিয়ন্ত্রণে আসার পর যখন ভারতীয় সেনারা বাড়িতে বাড়িতে তল্লাসি চালাচ্ছিলেন, তখন একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে মাত্র একজন যুবতীকে থাকতে দেখেন এক ভারতীয় অফিসার। তার সংগে প্রয়োজনীয় কিছু কথা সেরে যখন অফিসারটি ফিরছিলেন, যুবতী তখন স্টেনগান বার করে রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। গুলির আঘাতে গুরুতর জখম হন অফিসারটি। এই অবস্থার চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন মাদ্রাজ রেজিমেন্টের সিপাই গোবিন্দাম। তিনি এক সাংবাদিককে বলেছেন, 'কে টাইগার আর কে নয়, তা বোঝা আমাদের কাছে একটা অসম্ভব ব্যাপার। জাফনায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দশ বছরের বেশি বয়সের প্রতিটি লোক বিপজ্জনক। আমরা বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের ফ্রকের মধ্যে বন্দুক লুকিয়ে রাখতে দেখেছি।'

জাফনা যুদ্ধের হতাহতের সংখ্যা নিয়ে নানা মহলে নানা বিতর্ক রয়েছে। ভারত সরকারের দেওয়া তথ্যের যথার্থতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তবে এটা বোধ হয় সত্যি যে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্নভাবে প্রকৃত তথ্য আড়াল করার চেষ্টা করছেন। যতদূর জানা গেছে, শ্রীলংকায় অসামরিক নাগরিকদের ওপর জংগি তামিলদের আক্রমণের সময় থেকেই ভারত সেখানে সেনা সমাবেশ শুরু করে। এই গন্ডগোলের সূচনায় ভারত সেখানে প্রায় ৮০০০ সেনা পাঠায়। এভাবে আজ প্রায় সব মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় সেনা শ্রীলংকায় পাঠানো হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। হতাহতের সংখ্যা নিয়েও ভারত সরকারের দেওয়া তথ্যে বহু অসংগতি রয়েছে বলে অনেকের ধারণা। ৩০ অক্টোবর ভারত সরকারের এক মুখপাত্র জানিয়েছিলেন, ২১৪ জন ভারতীয় সেনা ও ৭৫৩ জন জংগিটাইগার এই সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন। কিন্তু বেসরকারি সূত্রের খবর সহস্রাধিক তামিল এই যুদ্ধে নিহত হয়েছেন।

স্বভাবতই, আজ কূটনৈতিক মহলেরও কেউ কেউ শ্রীলংকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলছেন। এটা ঠিক, নিহতের সংখ্যা যত বাড়বে, জাফনা অভিযানে ভারতের ভূমিকা নিয়ে দেশে ও বিদেশে ততই সমালোচনার ঝড় উঠবে। তাই কত তাড়াতাড়ি শ্রীলংকার চুক্তি রূপায়িত করে ভারতীয় সেনাবাহিনী দেশে ফিরতে পারে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

রেজিমেন্টের ট্যাংক চাইতে বাধ্য হন। মাইন ছাড়াও টাইগাররা বাড়ির ছাদ থেকে বা গাছের ডালে বসে অত্যন্ত উচ্চ ক্ষমতাশালী টেলিস্কোপ রাইফেল ব্যবহার করত। এর ফলে বহু শান্তি সেনা নিহত হন এবং ভারতীয় বিমান বাহিনীর কমপক্ষে পাঁচটি হেলিকপ্টার ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই হেলিকপ্টারগুলিকে স্থানে স্থানে ভারতীয় জওয়ানদের নামানোর কাজে লাগানো হয়েছিল। টাইগারদের আক্রমণের চাপে বাধ্য হয়ে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত 'মী ২৪' হেলিকপ্টার জাফনায় পাঠানো হয়েছিল। অন্য কোন মী হেলিকপ্টার-ই আক্রমণ এড়িয়ে দু হাজার ফুট উচ্চতায় উড়তে পারে না। চুক্তির পর প্রথম দিকে জংগি তামিলদের অস্ত্র সমর্পণের ঘটনাটি ভারতকে যে কতখানি ধোঁকা দিতে পেরেছিল, তা এখন মর্মে মর্মে বোঝা যাচ্ছে। এল টি টি ই-র অস্ত্র মজুতের পরিধি দেখে এটা পরিষ্কার যে তখন এল টি টি ই র কর্মীরা কোন অত্যাধুনিক অস্ত্র-ই কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেননি। যতদূর জানা গেছে, টাইগারদের হাতে আছে বিশাল পরিমাণের আধুনিক চীনা অস্ত্র। যেমন অত্যাধুনিক 'এ কে ৪৭ আসল্ট রাইফেল।' এছাড়া টাইগারদের হাতে রাশিয়ায় তৈরি আর পি জি ৭ অ্যান্টি-ট্যাংক রকেট, ৬০ মি মি বোমাবর্ষণের মর্টার ও শোল্ডার – ফায়ারড রকেট লঞ্চার। মারাঠা রেজিমেন্টের হাবিলদার রাওসাহেব গায়কোয়াড এক ইংরেজি পাক্ষিকের সংবাদদাতাকে জানিয়েছেন, 'এখানকার লড়াই অনেক বেশি কঠিন। কেন না যারা আমাদের সংগে দিনরাত লড়াই করছে তারা বয়সে বাচ্চা ছেলে ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তাদের হাতে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় আধুনিক অসংখ্য অস্ত্র। এর ফলে আমাদের ক্রমাগত বেগ পেতে হচ্ছে।'

জাফনা অঞ্চলে টাইগারদের সংগে লড়াইয়ে ভারতীয় সেনাদের বেগ পাওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল ও আছে। প্রথমত, জায়গাটি ভারতীয় সেনাদের কাছে পুরোপুরি অপরিচিত। একবার পথ হারিয়ে ফেললে রাস্তা খুঁজে বের করে তাঁবুতে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব। একবার শান্তি বাহিনীর চারটি ট্রাক অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও রাস্তা হারিয়ে ফেললে টাইগারদের সংগে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বিভিন্ন দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসে। চারজন জওয়ান ঘটনাস্থলেই মারা যান। গুরুতর আহত হন দুজন। বাকি ১৮ জন আত্মসমর্পণ করেন।

রাস্তা হারিয়ে ফেলা ছাড়াও শান্তি

স্বপন বসু

প্রভাকরণ ঃ খুনী, না বিপ্লবী ?



লিবারেশন টাইগার প্রধান ভি প্রভাকরণ জাফনার সদর দফতরে ঃ বিপ্লবী না উগ্রপন্থী

পুরো নাম ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণ। 'লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলম'-এর সর্বাধিনায়ক। চওড়া বুক, পুরু গোঁফ, দোহারা চেহারা। চোখে প্রত্যয়। মনে ১৫ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে লালিত তামিলদের নিজস্ব স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনের গলার কাঁটা। গলার কাঁটা ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীবেরও। কারণ এই লোকটাই আজ রাজীবকে চরম অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছেন।

এতদিন রাজীবের অবস্থাটা ছিল এরকম ঃ তিনি না পারছিলেন লোকটাকে গিলতে, না পারছিলেন ঝেড়ে ফেলতে। শ্যাম রাখি না কূল রাখি – এরকম টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে কয়েক বছর কাটানোর পর রাজীব এতদিনে মনস্থ করছেন ঃ ঢের হয়েছে, আর নয়। এবার একটা বিহিত করা দরকার। তাই এখন রাজীব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কূল রাখতে হলে শ্যামকে ঝেড়ে না ফেললে চলবে না। তাই যুদ্ধ শুরু হল তামিল টাইগারদের বিরুদ্ধে।

প্রভাকরণ এখন ফেরার। ফেরার তাঁর শতশত অনুগামী। তাঁদের হন্যে হয়ে খুঁজছে ভারতের শান্তিরক্ষা বাহিনী (আই পি কে এফ)। এই লেখা প্রেসে পাঠানো পর্যন্ত কেউ হদিশ দিতে পারেননি প্রভাকরণের। কখনও শোনা যায় প্রভাকরণ জাফনার মন্দিরে লুকিয়ে, কখনও বা বাত্তিকোলায় কোন এক জেলের ঝাড়িতে ছদ্মবেশে, আবার কখনও বা মাদ্রাজের রেস্তোরাঁয়। সব থেকে মজার কথা হল, মাত্র কয়েকমাস আগেই প্রভাকরণ ও তাঁর সংগীসাথীরা ছিলেন ভারতে। তামিল টাইগারদের আশ্রয় দেবার জন্য আন্তর্জাতিক তরজায় ভারত নিন্দিত হয়েছে বেশ কয়েকবার। আর আজ ভারতের রক্ষী বাহিনীই তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে পাগলা কুকুরের মত।

সরকারি মহলের অভিমত, যে লোকটা ভারত-শ্রীলংকা শান্তি চুক্তি মানল না, যাঁর নির্দেশে মারা পড়ল কয়েকশো ভারতীয় সেনা, তাঁকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। কদিন আগেই খবরের কাগজে ফলাও করে রিপোর্ট বেরিয়েছিল ঃ তামিল জঙ্গি নেতা প্রভাকরণ আহত, তাঁর পায়ে লেগেছে আই পি কে এফ সেনাদের গুলি। অবশ্য তিনি শেষ পর্যন্ত কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুগামীর সহায়তায় শান্তিবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেছেন। এর পরের খবর ঃ প্রভাকরণকে এখানে দেখা গেছে, ওখানে দেখা গেছে। কিন্তু ঠিক কোথায় হানা দিলে তাঁকে ধরা যাবে, সেটা কেউ বলতে পারেননি।

প্রভাকরণ জাফনার লোকজনের কাছে এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব। কিংবদন্তির নায়ক। বয়স ত্রিশের কোঠায়। পরনে সব সময় সৈনিকের পোশাক। তিনি মনে করেন, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে, তামিলদের জন্য আলাদা দেশ গড়তে হলে, চাই বাঘের মত তেজ আর ক্ষিপ্রতা। সেজন্যই তিনি তাঁর সংগঠনের নাম রেখেছেন 'লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলম'। প্রভাকরণের হাজার হাজার তরুণ অনুগামীর মানসিকতাও সেভাবেই তৈরি হয়েছে – ডু অর ডাই। করেংগে ইয়ে মরেংগে। হয় তামিল ইলম, না হয় মৃত্যু। মাত্র দুটো পথ খোলা – তার মধ্য থেকে বেছে নিতে হবে একটা। মাঝামাঝি জায়গাটা হল হীনমন্যতার জগৎ। আপস মেনে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। সেজন্য টাইগাররা সবসময় গলায় ঝুলিয়ে রাখে সায়নাইডের মাদুলি। 'অত্যাচারী সরকারের হাতে ধরা পড়ে ফাঁসির দড়িতে মরার চেয়ে আত্মহত্যাই শ্রেয়।' ঠিক এই মরণপণ সংগ্রামী মানসিকতার জন্যই টাইগারদের নামে কেঁপে ওঠে সারা শ্রীলংকা।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও প্রভাকরণের মানসিক গতিপ্রকৃতি ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। না হলে ভারত-শ্রীলংকা চুক্তি কার্যকর করার জন্য, টাইগারদের বাগে আনবার জন্য রাজীবকে শান্তি বাহিনী পাঠাতে হত না।

প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের

পেছনেই থাকে একটি বিশেষ ঘটনা। প্রভাকরণের রাজনীতিতে আসার ব্যাপারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সালটা ১৯৫৮। শ্রীলংকার ছোট্ট উপদ্বীপ জাফনায় কয়েকদিন আগেই ঘটে গেছে ভীষণ দাংগা। প্রাণ হারিয়েছেন শতশত মানুষ। লুট, আগুন, ধর্ষণ এরকম একটা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে জাফনা। প্রভাকরণ তখন নিতান্তই শিশু। সবে স্কুলে যাওয়া শুরু করেছেন।

একদিন প্রভাকরণের বাড়িতে এলেন প্রতিবেশী এক মহিলা। মহিলার সংগে একটি ছোট্ট ছেলে। মুখটা করুণ। মহিলা হারিয়েছেন তাঁর স্বামীকে। হারিয়েছেন আরও অনেক প্রিয়জনকে। তাছাড়া, মহিলার নিজের গায়েও দগদগে ঘা শ্রীলংকার আইনরক্ষী বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের চিহ্ন। তিনি তাঁর দুঃখের কথা প্রভাকরণের মাকে বলছিলেন। অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে মাঝেমাঝেই নিজেকে সামলাতে না পেরে কেঁদে উঠছিলেন তিনি। প্রভাকরণের নিজের ভাষায়, 'এই নির্যাতিতা মহিলাকে দেখেই আমি লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা পেয়েছি। আমার মনে জাগিয়ে তুলেছে প্রতিহিংসার আগুন। ওই মহিলার মুখ আর তাঁর গায়ের দগদগে ঘা আমার মনে কোনদিন শৈথিল্য বা দুর্বলতাকে বাসা বাঁধতে দেয়না। আমার বয়স যখন বার কি তের, তখনই আমার মনে এই প্রত্যয়ের বীজ কঠিনভাবে প্রোথিত হয়ে যায় যে, শ্রীলংকায় তামিলদের একমাত্র মুক্তির দিশা হল, তামিল ইলম। আর এই লক্ষ্যে পৌঁছতে সশস্ত্র সংগ্রামই হল একমাত্র পথ। এর মাঝামাঝি কোন জায়গা নেই।'

নিজের জীবন, নিজের দৃষ্টিভংগি সম্পর্কে প্রভাকরণ আরও বলেছেন, 'আমি আমাদের জীবদ্দশাতেই দেখে যেতে চাই স্বাধীন তামিল দেশ। আমাদের তারজন্য এমনভাবে লড়তে হবে যে দায়িত্বটা যেন আগামী প্রজন্মের ঘাড়ে গিয়ে না পড়ে। আমরা ওদের হাতে তুলে দেব তামিলদের নিজের দেশ, স্বশাসনের সাংবিধানিক অধিকার। আর তা দিয়ে তারা রচনা করবে নিজেদের জন্য এক স্বপ্নের রাজ্য স্বপ্নের ভবিষ্যৎ।

এক সাংবাদিক কিছুদিন আগে প্রভাকরণকে প্রশ্ন করেছিলেন 'এই যে আপনাকে শ্রীলংকা সরকার খুঁজে বেড়াচ্ছে পাগলের মত, আপনার মাথার দাম ধার্য হয়েছে কয়েক লক্ষ টাকা, এতে আপনার অনুভূতি কী উত্তরে প্রভাকরণ মৃদু হেসে বলেছিলেন 'ঠিক এর মধ্যে দিয়েই আমি নিজের ভূমিকাকে চিনে নিতে পারি। একটা ফ্যাসিস্ট, অত্যাচারী সরকার যে একজন স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষকে খুঁজে বেড়াবে এভাবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী! আমাকে ওরা বলে উগ্রপন্থী। আমার তাতে কিছু যায় আসে না। সবারই মনে রাখা দরকার, পৃথিবীতে কোন স্বাধীনতা সংগ্রামই বিনা রক্তক্ষয়ে ঘটেনি। শ্রীলংকাতেও ঘটবে না। স্বাধীনতা চাইলেই মোয়ার মত কেউ তা দিয়ে দেবে, এটা ভাবা বোকামি। এরকম দুরাশা করি না। আমরা জানি, আমরা স্বাধীনতা পেলে শ্রীলংকার কায়েমি, অর্থনৈতিক স্বার্থে আঘাত লাগবে। ঘা পড়বে মার্কিন প্রশাসনের স্বার্থে। তাই তারা শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাবে আমাদের দমিয়ে রাখতে। করবে খুন, অত্যাচার, ধর্ষণ। একথা আমরা ভুলিনি। সবচাইতে বড় কথা হল, ত্রিংকোমালিকে শ্রীলংকা সরকার মার্কিন নৌ ঘাঁটি বানাতে চেয়েছিল। এসব কি কোনদিন মেনে নেওয়া যায়? আর আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র ভারতই বা মেনে নেবে কী করে? ভারত মহাসাগরকে



এল টি টি ই-র মান্নার আঞ্চলিক কমান্ডার ভিক্টর পোষা চিতার সংগে। গত বছর রক্ষী বাহিনীর সংগে সংঘর্ষে নিহত

শান্তির অঞ্চল করা হোক – ভারতের এই নীতিকে আমরা সমর্থন করি। আমরা বলেছি, স্বাধীনতা পেলে আমরা রচনা করব এক শোষণহীন তামিল রাষ্ট্র। কাঠামো হবে সমাজতান্ত্রিক। আমাদের সম্পূর্ণ আনুগত্য থাকবে জোট নিরপেক্ষতার প্রতি । এবং ভারত মহাসাগরকে যুদ্ধমুক্ত করার জন্য আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করব।

শ্রীলংকায় অন্যান্য তামিল সংগঠন সম্পর্কে প্রভাকরণের মূল্যায়ন: 'ওদের কোন বিপ্লবী চেতনাই নেই। ওরা জানেনা ওরা ঠিক কী চাইছে। কী করলে সেটা পাওয়া যাবে। তবু আমি চেষ্টা করেছি সবাইকে সংগে নিয়ে চলতে। আমি জানি সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকলে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছান অনেক সহজ হয়। শত্রুও ভয় পায় ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে। কিন্তু মুশকিল হল, অন্যান্য সংগঠনগুলো বুঝতেই চায় না যে, সশস্ত্র বিপ্লব হল তামিল ইলম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একমাত্র পথ। পরিবর্তে তারা আবেদন নিবেদনের নীতিতেই বিশ্বাসী। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাতে বিশ্বাসী নয়। তারা আমাদের দিকে ঝুঁকেছে দলে দলে। এটাই প্রমাণ করে যে আমরাই ঠিক এল টি টি ই'-এ তামিল ঐক্যের পথে প্রধান অন্তরায় –

জংগি নেতার জবাব: 'এটা অপপ্রচার। আমরা তো 'প্লটের' নেতা উমা মহেশ্বরণের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলাম যাতে আমাদের সংগঠন আর 'প্লট' মিশে যেতে পারে। কিন্তু মহেশ্বরণ এমন কয়েকটা শর্ত জুড়ে দিলেন, তাতে আমরা পিছিয়ে গেলাম। ওই শর্তগুলো মূলতঃ ছিল আপোসের ওপর ভিত্তি করে। আমরা তা মেনে নিতে পারিনি। এতে আমাদের কে বিশ্বাসঘাতক বলল,অবুঝ বলল, আমাদের কিছু এসে যায় না। আমরা জানি আমরাই শ্রীলংকার বেশিরভাগ তামিলদের প্রতিনিধি। চেয়ে দেখুন, কাদের পেছনে আছে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন। আমার দুর্ভাগ্য, উমা মহেশ্বরণের মত একজন অভিজ্ঞ বিপ্লবী আমাকে ভুল বুঝলেন। ওঁকে সংগে পেলে আমাদের শক্তি অনেক বাড়ত, সন্দেহ নেই।'

এই হলেন প্রভাকরণ। তাঁর উদ্দেশ্য, মানসিকতা ও ধ্যানধারণার একটা আঁচ পেতে তাঁর কিছু কথাবার্তা তুলে দেওয়া হল। এর থেকেই বেরিয়ে আসে প্রভাকরণের চরিত্র। প্রভাকরণের বিরুদ্ধে নরমপন্থীদের অনেক অভিযোগ। উচ্ছৃংখল, নির্বিবাদ হত্যা তাঁকে আজ দাঁড় করিয়েছে আসামীর কাঠগোড়ায়। তাঁর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী কাজকর্মকে প্রশ্রয় দেবার অভিযোগ উঠছে। ভারত সরকারও তাঁর কাজে তিতিবিরক্ত। ভবিষ্যৎই প্রমাণ করবে, প্রভাকরণ যা করছেন তা মানবিক, না অমানবিক।

অরুণাভ দাস



কে বলতে পারে জয়বর্ধনে আবার ডিগবাজি খাবেন না ?

শ্রীলংকায় ভারতীয় সেনাবাহিনী শেষ পর্যন্ত টাইগারদের সংগে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় অনেকেই চোখ কপালে তুলে বলছেন, 'রাজীব কি সব বিষয়েই ইন্দিরা-বিরোধী ?' আঁচ করা যায়, প্রশ্নটার পেছনে লুকিয়ে আছে ষোল বছর আগে বাংলাদেশের ঘটনার স্মৃতি। কিন্তু সাদা চোখে যতই স্ববিরোধী মনে হোক না কেন, আসলে কিন্তু বাংলাদেশ এবং শ্রীলংকা, দু দেশেই ভারতের ভূমিকা এক। কোথাও তা বাঙালিদের পক্ষে, কোথাও তামিলদের বিপক্ষে – ফারাক এটুকুই। একটু খোলসা করেই বলা যাক।

প্রথম দিকে ভারত যে তামিলদের পক্ষে ঝুঁকেছিল এবং অনেকদিন পর্যন্ত তাদের প্রত্যক্ষভাবে মদত দিয়ে যাচ্ছিল, তার কারণ ভারতীয় বিদেশ দপ্তরের তখন দৃঢ় ধারণা ছিল যে প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনে দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকার উপগ্রহ হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আর ভারত চিরকালই ভারত মহাসাগরকে বৃহৎ শক্তিগুলির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার পক্ষপাতী। সাউথ ব্লকের এই ধারণা গড়ে ওঠার পেছনে, জয়বর্ধনের অবদানও কিছু কম ছিল না। ভারত-শ্রীলংকা চুক্তি সই হবার কয়েক মাস আগে পর্যন্ত তিনি যে ধরনের কাজকর্ম চালিয়েছেন, তাতে ভারতের সন্দেহ এবং উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ ছিল। সেজন্য অনেকের আশা ছিল যে যুদ্ধ বাধলে ভারতের পক্ষপাত তামিলদের দিকেই থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রীলংকায় টাইগারদের সংগেই ভারত যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ায় অনেকের মুখেই ভ্রূকুটি দেখা গেছে।

শ্রীলংকায় ভারতের ভূমিকায় যার ভ্রূ যতই কুঞ্চিত হোক না কেন, এতে অবাক হবার কিছু নেই। বাংলাদেশে আমেরিকাকে অথবা তার মিত্ররাষ্ট্র পাকিস্তানকে রোখাই ছিল ভারতের মূল লক্ষ্য। যেমন শ্রীলংকাতেও আমেরিকার ক্রমবর্ধমান প্রভাব খর্ব করাই ছিল রাজীবের মূল উদ্দেশ্য। একথা ঠিক যে আমেরিকা বাংলাদেশের ঘটনায় যতটা প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিল শ্রীলংকায় তা কখনই হয়নি। কিন্তু ত্রিংকোমালি বন্দরের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোলুপ দৃষ্টি বরাবরই ছিল এবং এখনও হয়ত আছে। আর সেজন্য প্রথম থেকেই ভারত সরকারের চোখে যেমন ইন্দিরার আমলে তেমনি রাজীবের রাজত্বেও – জয়বর্ধনে মার্কিন স্বার্থের প্রতিভূ।

১৯৮৪ সালে শ্রীলংকায় জাতিগত হানাহানি যখন চরমে উঠেছে তখনও আমেরিকার সংগে চুক্তি করেছেন জয়বর্ধনে। ত্রিংকোমালিতে 'ভয়েস অফ আমেরিকা'র কেন্দ্র স্থাপনের কথা পাকা হয়েছে। এই কেন্দ্র গড়ে উঠলে সেখান থেকে যোগাযোগ করা যাবে আশেপাশের মার্কিন জাহাজগুলির সংগে। সাউথ ব্লকের আমলারা এ বিষয়ে পুরোমাত্রায় ওয়াকিবহাল ছিলেন। ত্রিংকোমালি সম্পর্কে আমেরিকার মতিগতি ভারতের কখনই ভাল ঠেকেনি। আমেরিকা চাইছিল ত্রিংকোমালিতে তার জাহাজগুলিতে তেল ভরবার ব্যবস্থা করতে। এ বিষয়েও আমেরিকাকে ছাড় দিতে জয়বর্ধনের উৎসাহের ঘাটতি ছিল না।

ভারত মহাসাগরে ত্রিংকোমালি সেরা প্রাকৃতিক বন্দর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও মিত্রশক্তির জাহাজগুলি পুরোপুরি এই বন্দরটি ব্যবহার করেছে। তখন থেকেই এখানে রয়েছে বিশাল একটি অয়েল ট্যাংকার ফার্ম। ভারত মহাসাগর অঞ্চলে প্রতিপত্তি কায়েম করার জন্য আমেরিকার দরকার ছিল এই বোড়েটিকে। আর এই ভয়টাই শ্রীলংকার ক্ষেত্রে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলা যায়, তামিলদের সমর্থন করা যতটা ভারতের অবিমিশ্র করুণার প্রকাশ, তার চেয়ে অনেক বেশি আমেরিকাকে ঠেকাবার দুর্মর ইচ্ছাপ্রসূত।

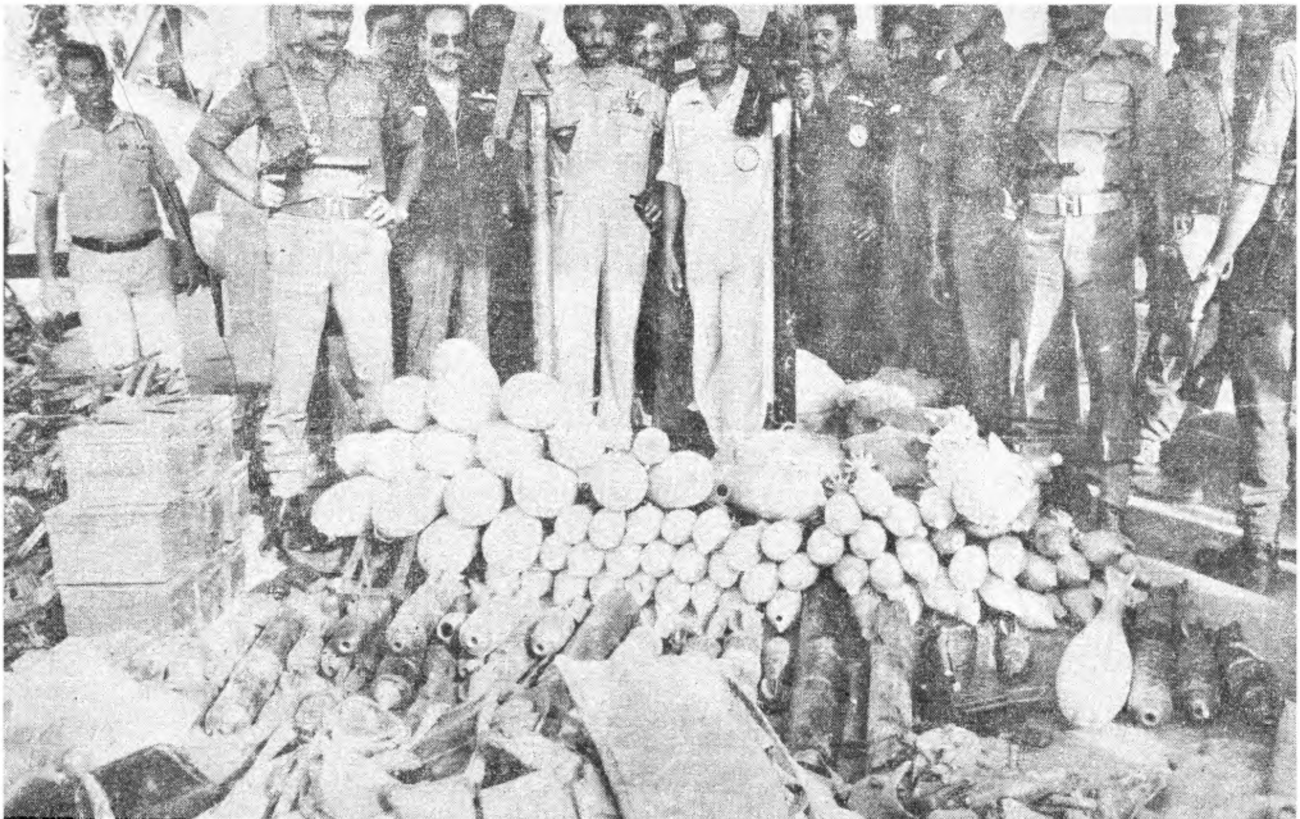
তবে এসব সত্ত্বেও আমেরিকা কখনই শ্রীলংকা সমস্যায় সরাসরি জড়িয়ে পড়েনি। তাদের ভূমিকা সাহায্যকারীর। মার্কিন মদতে জয়বর্ধন ডেকে এনেছেন ইজরায়েলি কমান্ডো বাহিনী 'মোসাদ' আর ব্রিটিশ স্যাস-বাহিনীর মার্সিনারিদের। কাজেই আমেরিকা শ্রীলংকায় সরাসরি জড়িয়ে না পড়েও জয়বর্ধনের মাধ্যমে তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত করে চলছিল। ফলে অনেকে ভেবেছিলেন আমেরিকাকে রুখতে ভারত চিরদিনই তামিলদের মদত দিয়ে যাবে। সেটাই ছিল স্বাভাবিক। হঠাৎ তাহলে এতদিনের ছকটা বদলে গেল কেন ? তামিলদের অভিযোগ : ভারত তাদের কোল থেকে জলে ফেলে দিয়েছে। নতুন করে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে জয়বর্ধনের সংগে। ঠিক এজনাই প্রভাকরণ ও তাঁর সংগীরা মনে করছেন যে ভারতের কাঁধে বন্দুক রেখে জয়বর্ধনে জিতে বেরিয়ে গেলেন। আর তাঁরা রয়ে গেলেন বঞ্চিত।

কিন্তু তা বলে ভারতীয় বিদেশ দপ্তর কি ছেলেখেলায় মেতেছে ? নাকি দলবদলের পিছনে আছে নিগূঢ় কোন কারণ

শ্রীলংকা চুক্তির মূল বয়ানে ভারতের প্রতিরক্ষা বিষয়ে কোন কথা বলা নেই। কিন্তু দুদেশের মধ্যে যে চিঠি বিনিময় হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি বদলের কারণটা বোঝা যায়। ঐ চিঠিগুলিতে বলা হয়েছে যে 'ত্রিংকোমালিতে অথবা শ্রীলংকার অন্য কোন অঞ্চলে কোনও দেশকে এমন কার্যকলাপ চালাতে দেওয়া হবে না যাতে ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।' এ ছাড়াও বলা হয়েছে, 'বিদেশী বেতার সংস্থাগুলির সংগে শ্রীলংকার চুক্তিগুলির পর্যালোচনা করা হবে।' আরও বলা হয়েছে 'সামরিক এবং গোয়েন্দা কাজে লিপ্ত বিদেশীদের সম্বন্ধে ভারতের আপত্তিকে পূর্ণ সম্মান দেওয়া হবে।' অতএব চুক্তির ফলে তামিল সমস্যার কতটা সমাধান হবে বলা মুশকিল, কিন্তু ভারতের ভয় যে অনেকটা কমেছে, সেকথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়। জয়বর্ধনে কেন হঠাৎ পক্ষ পরিবর্তন করলেন আপাতদৃষ্টিতে এমন একটা স্বার্থবিরোধী চুক্তিকে আমেরিকাই বা কেন সমর্থন জানাল ? কিছুদিন আগে পর্যন্তও তো জয়বর্ধনে তাঁর প্রধানমন্ত্রী প্রেমদাস অথবা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ললিথ অতুলাথমুদালির সংগে গলা মিলিয়ে তুলেছেন ভারত-বিরোধী জিগির। হঠাৎ কী হল কেন ভোল পাল্টে গেল এককথায় এ প্রশ্নের উত্তর : জয়বর্ধনে পশ্চিমী শক্তিগুলির কাছ থেকে যতটা সহায়তা আশা করেছিলেন, তা তিনি পাননি। জাফনায় ভারতীয় বিমানবাহিনী ত্রাণ পৌঁছে দেবার পর আমেরিকার নির্লিপ্তি তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছিল। এ ব্যাপারে জয়বর্ধনে খোলাখুলিই প্রকাশ করেছেন তাঁর অসন্তোষ। জাফনায় শ্রীলংকা সেনাদের 'অপারেশন লিবারেশন' চলার সময় জয়বর্ধনে ধরেই নিয়েছিলেন যে ভারত বাধা দিলে তার মোকাবিলায় এগিয়ে আসবে আমেরিকা। কিন্তু তা যখন হল না, তখনই তাঁকে খুঁজতে হল নতুন পথ। সেক্ষেত্রে ভারততোষণ নীতিই তাঁর একমাত্র রাস্তা ছিল। আর ভারত যখনই দেখেছে তার স্বার্থরক্ষায় জয়বর্ধন আগ্রহী, তখনই তারা শ্রীলংকার সংগে চুক্তি করেছে।

লাভের হিসেবে জয়বর্ধনে বেশ কয়েকধাপ এগিয়ে। চুক্তি অনুযায়ী শ্রীলংকার উত্তর ও পূর্ব প্রদেশের সংযুক্তিকরণ প্রশ্নের মীমাংসা হবে গণভোটে। এই ভোটে তামিলদের জেতা অসম্ভব। কারণ ১৯৪৮-এর পর থেকেই পূর্ব শ্রীলংকায় চেষ্টা চলছে তামিলদের কোণঠাসা করে নতুন সিংহলী বসতি স্থাপনের বলা



জঙ্গি তামিলদের **সমর্পিত অস্ত্রশস্ত্র** : তামিলরা এখনও নিরস্ত্র নয়

চলে, জয়বর্ধনের স্বপ্ন সফল।

কিন্তু আমেরিকা শ্রীলংকা-আলোচনায় এই একটা বিষয়ই এখনও ধোঁয়াটে হয়ে রয়েছে। দুভাবে আমেরিকার ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা যায়। প্রথমত, আমেরিকা হয়ত বুঝেছে এই উপমহাদেশে ভারতকে উপেক্ষা করাটা বোকামি। তাছাড়া, শ্রীলংকায় ভারতকে ছাড় দিলে তাদের অনেকটা কাছে টানতে পারবে বলে হয়ত ভাবছে আমেরিকা। এছাড়া আমেরিকার আরেকটা উদ্দেশ্য হতে পারে ভারতকে রাশিয়ার কব্জা থেকে ফুসলে বের করে আনা। সে দিকে তাকিয়ে ভারতকে অন্য ছাড়ও দিচ্ছে আমেরিকা। সুপার কম্পিউটার নিয়ে চুক্তি কি তারই ইঙ্গিতবাহী নয় লক্ষণীয়, চুক্তি-সম্পাদনের পরে রাজীব পাকিস্তান-ইজরায়েলকে একহাত নিলেও, আমেরিকার সম্বন্ধে একটিও কটু মন্তব্য করেননি। জয়বর্ধনে যে চুক্তি সইয়ের পরেও মার্কিনীদের অনুরোধ করেছিলেন শ্রীলংকা সমস্যার সমাধানে সাহায্য করার জন্য, তাও নিশ্চয় রাজীবের চোখ এড়ায়নি। তাও তিনি কোন কটুকথা বলেননি।

অন্যদিকে একথাও ঠিক যে ভৌগোলিক রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার জন্যই আমেরিকার পক্ষে শ্রীলংকা সমস্যা সমাধানে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভব হয়নি। আরব সাগরে এখন আমেরিকা নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত। তাই এখন আর কোমরের জোরও নেই নতুনভাবে শ্রীলংকা সমস্যার দায়ভার কাঁধে নেওয়ার। কাজেই হয়ত আমেরিকা শ্রীলংকা চুক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছে অনেকটাই নিমরাজি হয়ে। তা যদি হয়, তাহলে ধরে নেওয়া যায় আমেরিকা আপাতত শ্রীলংকা বিষয়ে তত মাথা ঘামাতে চাইছে না। চাইছে মাথা গুঁজে সুযোগের অপেক্ষায় সময় গুণতে। তাছাড়া, ত্রিংকোমালিকে নিজের কাজে ব্যবহার করতে হলে অয়েল ট্যাংকার ফার্মটির আধুনিকীকরণ দরকার। বিস্তর খরচসাপেক্ষ এ কাজে হাত দেওয়ার ইচ্ছা ও সামর্থ্য, অথবা দুটোর কোনটাই হয়তো এ মুহূর্তে আমেরিকার নেই।

রাজীব এবং জয়বর্ধনে যতই আত্মবিশ্বাস দেখান না কেন, শ্রীলংকায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম যদি দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে, তাহলে চুক্তি বিপন্ন হবে। এবং তাহলে ভারত জয়বর্ধনের ওপর আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

এ প্রসংগে কয়েকটি কথা মাথায় রাখা উচিত। প্রথমত, জয়বর্ধনে আশা করছেন, তামিল সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে। আর এই সমাধানের দায়িত্ব এখন পুরোপুরি বর্তেছে ভারতের ওপর। দ্বিতীয়ত, জয়বর্ধনের প্রধানমন্ত্রী প্রেমদাস এবং মন্ত্রিসভার প্রভাবশালী সদস্য অতুলাথমুদালির নেতৃত্বে এখনও চলছে ভারতবিরোধী এবং চুক্তিবিরোধী প্রচার। এবং যে কোন সুযোগ কাজে লাগিয়ে তাঁরা ক্ষমতার শীর্ষে চলে আসার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা চালাচ্ছেন। তামিল সমস্যা যতই প্রলম্বিত হবে, জয়বর্ধনের নিজের দল ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টিতে তাঁর সমর্থন কমবে। আর সেটাই সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার।

তামিলদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ এখন চরমে উঠেছে। তাঁদের সম্মানবোধ আজ আহত। এবং আহত সিংহের মতই বিপজ্জনকভাবে কেশর ফুলিয়ে শেষবারের মতো ঘুরে দাঁড়িয়েছে তামিল টাইগাররা। একাধিক তামিল নেতা ব্যাখ্যা করে বলেছেন এ যুদ্ধ কেন দীর্ঘস্থায়ী এবং গণযুদ্ধের সমতুল্য হবে। তাঁরা জানিয়েছেন, এখন থেকে শুরু হবে গেরিলা যুদ্ধ। যুদ্ধের বলগা এখন থেকে থাকবে সুইসাইড স্কোয়াডের হাতে। সেরকম হলে শেষে শ্রীলংকায় অবস্থা কী হবে, তা এখন থেকে বলা মুশকিল। শুধু এটুকু নিশ্চিন্তে বলা চলে যে এটাই শেষ যুদ্ধ। দীর্ঘস্থায়ী হবার সমস্ত সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে এর মধ্যে। আর তা হলেই বিপদ। কেন না সেক্ষেত্রে শ্রীলংকায় ভারতের ভবিষ্যৎ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে যাবে জয়বর্ধনের ভবিতব্যের সংগে। কোন জয়বর্ধনে? অশীতিপর, জরাগ্রস্ত জয়বর্ধনে। যিনি শেষ বয়সে ছিটেফোঁটা সাফল্যের আশায় এ দরজা থেকে সে দরজায় দৌড়ে চলেছেন। যতই দ্রুত সমাধানের সম্ভাবনা মিলিয়ে যাবে ততই তিনি হয়ে পড়বেন অধীর। ছটফট করবেন নিজের পার্টির ভেতরে অন্যান্য নেতাদের চাপের মুখে। বাড়বে পরাক্রমশালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আর সিংহলীদের বিক্ষোভ। আর কে বলতে পারে এই চাপ সহ্য করতে না পেরে জয়বর্ধনে তখন আবার ডিগবাজি খাবেন না?

পার্থপ্রতিম মজুমদার

সরকারের প্ররোচনাতেই বার বার তামিল-বিরোধী দাংগায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে শ্রীলংকা



জাফনার দিকে এগিয়ে চলেছে ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনী : শান্তির পথে শক্তিমান!

শ্রীলংকার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে এখন যে প্রশ্নটা অনেকের মনেই উঁকিঝুঁকি মারছে, তা হল : এটা কীরকম হল শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ভারত শেষ পর্যন্ত শ্রীলংকায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল কেন তাও আবার তামিলদের বিরুদ্ধে?

প্রশ্নটা নেহাত অযৌক্তিক নয়। এর উত্তর দেওয়াও সহজ নয়। শ্রীলংকা ভারতের প্রতিবেশী দেশ। শুধু 'প্রতিবেশী' বললে সবটা ঠিকমত বোঝানো যায় না। বলতে হয়, ভারতকে ঘিরে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে যেসব দেশ রয়েছে, তাদের মধ্যে শ্রীলংকার সংগেই আমাদের সম্পর্ক সবথেকে কাছের। ভৌগোলিকভাবে শ্রীলংকা একটি আলাদা রাষ্ট্র। কিন্তু আত্মিক দিক থেকে ভারতের সংগে তার নিবিড় যোগাযোগ। এই নৈকট্যের প্রথম এবং প্রধান কারণ হল, শ্রীলংকার জনসংখ্যার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিলরা। আর সেজন্যই শ্রীলংকার প্রতি ভারতের নৈতিক দায় যতটা গভীর, অন্য কোন দেশের ক্ষেত্রে ততটা নয়। শ্রীলংকায় যাই ঘটুক না কেন, ভারতে তার অভিঘাত কিছু না কিছু পড়বেই।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, তামিলদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারত এতটা অগ্রণী হয়ে শ্রীলংকার সংগে চুক্তি সই করল, সেই তামিলদের বিরুদ্ধেই তাকে অস্ত্র ধরতে হল কেন? সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে গিয়ে মোটের ওপর বলা যায়, জংগি তামিল টাইগাররা চুক্তির শর্ত মেনে অস্ত্র সমর্পণ করতে রাজি না হওয়ার জন্যই এই অবস্থা। তাদের নিরস্ত্র করতে ভারতীয় শান্তিসেনাকে যুদ্ধে নামতে হল।

ভারত-শ্রীলংকা চুক্তির প্রতি টাইগারদের, স্পষ্টতই, আস্থা নেই। তাঁরা এখনও পৃথক রাষ্ট্রের দাবিতে অটল। শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জুনিয়াস জয়বর্ধনে এবং তাঁর অনুগত মন্ত্রী-সান্ত্রীদের টাইগাররা মোটেই বিশ্বাস করেন না। শেষ পর্যন্ত চুক্তির সব শর্ত যথাযথভাবে রূপায়িত হবে কি না, সে বিষয়ে টাইগাররা গভীরভাবে সন্দিহান। কেন টাইগাররা তাঁদের মনোভাব পাল্টাচ্ছেন না বা তাঁদের সন্দেহের কোন ভিত্তি আছে কিনা, সেটা আলাদা বিষয়। তবে একটা কথা মোটামুটি নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ১৯৪৮ সালে শ্রীলংকা স্বাধীন হবার পর তামিলরা সেখানে কখনও প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে জীবন যাপনের সুযোগ পাননি। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিকভাবে তাঁদের যথেষ্ট পীড়ন সহ্য করে শ্রীলংকায় বাস করতে হয়েছে। তার ফলে তামিল যুব সম্প্রদায়ের একাংশ জংগি হয়ে উঠেছেন। পৃথক রাষ্ট্রের দাবির মধ্যে ফুটে উঠেছে তাঁদের রাগ ও ক্ষোভ, তাঁদের অপমানবোধ।

দাংগা '৫৮ থেকে '৮৩

১৯৪৮-এ বৃটিশরা চলে যাবার পর স্বাধীন শ্রীলংকা বহুবার তামিল-সিংহলি দাংগায় রক্তাক্ত হয়েছে। ১৯৫৮, ১৯৭৭ এবং ১৯৮১-তে বেশ বড় ধরনের হাংগামা হয়েছে। তবে ১৯৮৩-র জুলাইয়ে শ্রীলংকায় তামিল এবং সিংহলিদের মধ্যে যে ব্যাপক দাংগা ছড়িয়ে পড়ে, সেরকম আগে কখনও হয়নি। ১৯৮১-র আগস্ট মাসে শ্রীলংকার ৩০টি গ্রাম ও শহরে যে দাংগা বাধে, তাতে নিহত হয়েছিলেন ১৭[illegible] জন তামিল। নিহতদের মধ্যে মাদ্রাজ থেকে আসা একজন পুণ্যার্থীও ছিলেন। গণ ধর্ষণ করা হয়েছিল ৪জন তামিল মহিলাকে। কয়েকশো বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং গৃহহীন তামিলরা আশেপাশের জংগলে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই ঘটনার পরই জয়বর্ধনে শ্রীলংকায় দ্বিতীয় বারের জন্য জরুরি অবস্থা জারি করেন। কিন্তু ১৯৮৩-তে যে ঘটনা ঘটেছিল, তার তুলনা শ্রীলংকার ইতিহাসে নেই। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, সেবার দাংগায় প্রাণ হারিয়েছিলেন ৩১৬জন তামিল। গৃহহীনদের সংখ্যা ছিল [illegible] লক্ষ। শ্রীলংকার মুদ্রায় ২০০ কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছিল। সেবার কলম্বোতে ভারতীয় হাইকমিশনারের অফিসেও হামলা চালাবার চেষ্টা করা হয়। আর এই ঘটনার পর থেকেই শ্রীলংকা থেকে স্রোতের মত তামিল উদ্বাস্তুরা ভারতে চলে আসতে শুরু করেন।

কোন সাম্প্রদায়িক দাংগাই যে আচমকা একদিন অন্তরীক্ষ থেকে সৃষ্টি হয় না, সেটা সবাই জানেন। একটি দেশের সরকার যখন জনগণের আশা-আকাংক্ষাকে রূপ দিতে, তাঁদের চাহিদা পূরণ করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ

হন, তখনই অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যায় এবং এই ধরনের অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত হবার পর শ্রীলংকায় কোন সরকারই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভিত্তিতে তামিল এবং সিংহলিদের মধ্যে সমতা আনার চেষ্টা করেননি। বরং তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মের দোহাই পেড়ে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বাড়িয়ে তুলেছেন। ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের মত শ্রীলংকাতেও বৃটিশরা 'ডিভাইড এট ইমপেরা' নীতি অনুসরণ করেছিল। স্বাধীন শ্রীলংকার বিভিন্ন সরকারও এই নীতি গ্রহণ করলেন। কারণ সহজ। জাতিগত বিভেদ সবসময়ই জনগণের ঐকবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম চালাবার পথে প্রধান অন্তরায়।

ঔপনিবেশিক অর্থনীতি

শ্রীলংকায় সিংহলি ও তামিলদের মধ্যে বিভেদের সঠিক রূপটা বুঝতে হলে সে দেশের গোষ্ঠীগত বিভাজন এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ভারত মহাসাগরে ২৫৩৩২ বর্গ কিলোমিটারের দ্বীপ শ্রীলংকা যতদিন ঔপনিবেশিক শাসনে ছিল, এশিয়ার অন্য কোন রাষ্ট্রকে অত বেশিদিন বিদেশি শক্তির অধীনে থাকতে হয়নি। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ এবং বৃটিশরা শ্রীলংকার অর্থনীতিকে শোষণ করে এমন অবস্থায় রেখে গেছে যে, স্বাধীনতার প্রায় ৪০ বছর পরও তাঁদের অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। সাম্প্রদায়িক এবং জাতিগত ঐক্য না থাকার ফলে শ্রীলংকা সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৭১-এর পর তেমন কোন ব্যাপক এবং জোরদার আন্দোলনও গড়ে উঠতে পারেনি।

১৫০৫ সালে পর্তুগিজরা প্রথম শ্রীলংকা অধিকার করে। ১৬৫৮ সালে পর্তুগিজদের হাত থেকে ওলন্দাজরা শ্রীলংকা দখল করে নেয়। ১৭৯৫ সালে হল্যান্ডে 'বাটাভিয়ান প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হবার পরের বছর বৃটিশরা ওলন্দাজদের কাছ থেকে শ্রীলংকা ছিনিয়ে নেয়।

পর্তুগিজরা মূলত দারুচিনি সংগ্রহ করে শ্রীলংকা থেকে চালান দিত। দারুচিনি ব্যবসায় শ্রীলংকা তখন একচেটিয়া। ওলন্দাজরা দারুচিনি শিল্পকে সংগঠিত চাষের মাধ্যমে উন্নত করে তোলে। বৃটিশরা এসে প্রবর্তন করল কফি ও চা চাষ। এখনও শ্রীলংকার চা শিল্পে বৃটেনের 'ব্রুক বন্ড' এবং 'লিপটন' সংস্থা চুটিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। রাবার, চা এবং নারকেলজাত দ্রব্য – এই তিনটিই এখন শ্রীলংকার প্রধান শিল্প।

'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি'

শ্রীলংকার বাসিন্দারা মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত – সিংহলি (৬৮ শতাংশ) এবং তামিল (২২ শতাংশ)। এঁদের মধ্যে বৌদ্ধদের সংখ্যা ৬৭ শতাংশ। হিন্দুরা হলেন মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ। শ্রীলংকায় সিংহলিদের প্রায় সবাই যে বৌদ্ধ, একথা বোধহয় চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়। খৃস্টান ধর্ম এবং ইসলামের প্রভাব তুলনায় নগণ্য। শ্রীলংকায় সরকারি ভাষা সিংহলি, যদিও ইংরেজি ও তামিল দুটি প্রধান ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীলংকার সিংহলিদের মধ্যেও একটা স্পষ্ট বিভাজন রয়েছে। ১৯৮৩-তে কলম্বোর দাংগায় যাঁরা প্রধানত লিপ্ত ছিলেন, তাঁরা 'লো কানট্রি' সিংহলি। অন্যদের বলা হয় 'কান্ডি' সিংহলি। 'কান্ডি' গোষ্ঠীর অধিবাসীদের বেশির ভাগই আপার শ্রীলংকার বিভিন্ন উপত্যকায় চাষবাস করেন। দীর্ঘদিনের বৃটিশ শাসন তাঁদের সামন্ততান্ত্রিক জাল থেকে বের করে আনতে পারেনি। তাঁদের সংহত রাখার কাজে বৌদ্ধধর্ম একটা বড় বাঁধন। 'কান্ডি'রা বৃটিশ প্রবর্তিত লাভজনক রাবার চাষে কখনও অংশ নেননি। স্থানীয় ভিত্তিতে ধানচাষেই তাঁরা চিরকাল নিজেদের নিযুক্ত রেখেছেন। 'লো কানট্রি' সিংহলিরা সংখ্যায় বেশি। তাঁদের একাংশ রাবার এবং নারকেল চাষে যোগ দিলেন। বাকিরা বিভিন্ন শহরাঞ্চলে কল-কারখানায় চাকরি নিলেন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে তামিলরা 'কুলি' হিসাবে শ্রীলংকায় আসতে শুরু করেন। 'কান্ডি' সিংহলিরা ধানচাষ থেকে সরে আসতে রাজি না হওয়ায় কফি বাগিচায় কাজ করার জন্য বৃটিশরা একটা জঘন্য শ্রমচুক্তির ভিত্তিতে দক্ষিণ ভারত থেকে অসংখ্য তামিল 'কুলি' আমদানি করল। সে সময় শ্রীলংকার কফি বাগিচায় কাজ করতে আসা ছিল দুঃস্বপ্নের সমান। ১৮৪০ থেকে ১৮৫০ – এই দশ বছরে দক্ষিণ ভারত থেকে প্রায় ১০ লক্ষ 'কুলি' আমদানি করা হয়েছিল। এঁদের এক-চতুর্থাংশই অবশ্য পথে মারা পড়েছিলেন। এই বিশাল সংখ্যক 'কুলি' আমদানির ফলে বৃটিশরা দুভাবে লাভবান হল। প্রথমত, অত্যন্ত সস্তায়, প্রায় বিনা মজুরিতে তারা তামিলদের কফিচাষের কাজে লাগাতে পারল। দ্বিতীয়ত, এত তামিল শ্রীলংকায় এসে বসবাস করতে শুরু করার ফলে সে দেশে জাতিভেদ বাড়ল। এই সাম্প্রদায়িক অসাম্যের সুযোগ নিয়ে বৃটিশরা ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি আরও দৃঢ় করে তুলল।

এখানে বলে রাখা দরকার, শ্রীলংকায় তামিলদের মধ্যেও গোষ্ঠীগত ভেদাভেদ রয়েছে। উনিশ শতকে দক্ষিণ ভারত থেকে আগত কুলিরা 'ভারতের তামিল' নামে পরিচিত। অন্য গোষ্ঠীটিকে বলা হয় 'সিংহলি তামিল'। এঁরা দু হাজার বছরের বেশি শ্রীলংকায় রয়েছেন। শ্রীলংকার উত্তরাংশে এই সিংহলি তামিল'রা একটা সংহত সম্প্রদায় রূপে প্রতিষ্ঠিত। জাতপাতের বোধ তাঁদের সমাজে অত্যন্ত প্রবল। অনেকটা বিহারের মত। উঁচু জাতের হিন্দু জমিদার এবং ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংস্থার মাধ্যমে এই গোষ্ঠীর ওপর সর্বময় কর্তৃত্ব এখনও বজায় রেখে চলেছেন।

জাফনায় সিংহলী সেনাবাহিনীর হামলার শিকার জনৈক নির্দোষ তামিল



সিংহলি তামিলদের অনেকেই বৃটিশ সিভিল সার্ভিস এবং পুলিশে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের আমলাতন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার পেছনে উদ্দেশ্যটা ছিল পরিষ্কার। সিংহলিদের বিদ্রোহের সম্ভাবনায় বৃটিশরা খুব ভয়ে ভয়ে থাকত। অতএব 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি কার্যকর করার জন্য অন্য সম্প্রদায়কে কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধে দিতেই হয়।

'সিংহলি তামিল'রা বিত্তবান হয়ে ওঠায় তাঁদের সঙ্গে 'ভারতীয় তামিল'দের একটা শ্রেণীগত ফারাক সহজেই তৈরি হল। মধ্য শ্রীলঙ্কার বাগিচা অঞ্চলগুলিতে 'ভারতীয় তামিল'দের বসবাস। পূর্বদিকে, যেখানে জঙ্গল সাফ করে বৃটিশরা বাগিচার পত্তন করেছিল, সেসব অঞ্চলে এই তামিলরা সংখ্যায় সব থেকে বেশি। কিন্তু যেখানে তাঁরা 'কান্ডি' সিংহলি গোষ্ঠীর চাষীদের সঙ্গে রয়েছেন, সেখানে তাঁদের বিচ্ছিন্ন 'কুলি-ব্যারাকে' থাকতে হয়। আসলে সর্বহারা বলতে যা বোঝায়, শ্রীলঙ্কার 'ভারতীয় তামিল'রা সেই শ্রেণীর অধিবাসী।

'ডিভাইড অ্যান্ড রুল'

এবার দেখা যাক, কীভাবে শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন সরকার তামিল ও সিংহলিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে রাজনৈতিকভাবে লাভবান হবার চেষ্টা করেছে। ১৯৪৮ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর শ্রীলঙ্কায় সরকার গড়ল ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি। প্রধানমন্ত্রী হলেন ডন স্টিফেন সেনানায়ক। এটা ছিল প্রায় একটা 'পারিবারিক' সরকার। প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরই ছিল প্রধানমন্ত্রীর নিজের পরিবারের লোকজনের হাতে। সেনানায়ক সরকার ক্ষমতায় এসে প্রথমেই 'সিলোন (সংসদীয় নির্বাচন) সংশোধন আইন' প্রণয়ন করে এক কলমের আঁচড়ে ৫ লক্ষ তামিলের ভোটাধিকার কেড়ে নিলেন।

যাই হোক, ডন স্টিফেন অবশ্য খুব বেশিদিন আর বেঁচে থাকেননি। ১৯৫২ সালে ঘোড়া থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। 'পারিবারিক সাম্রাজ্যের' রীতি অনুযায়ী এরপর প্রধানমন্ত্রী হলেন তাঁর ছেলে ডাডলি সেনানায়ক। কোরিয়ান যুদ্ধের প্রভাবে পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি শ্রীলঙ্কায় জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে উঠেছিল। অবস্থা সামলাতে ডাডলি এমন কতগুলো জনবিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন যে, দেশে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঝড় উঠল। পদত্যাগ করতে হল ডাডলিকে। তাঁর আত্মীয় কোটেলাওলা প্রধানমন্ত্রী হয়ে ১৯৫৬ সালে সাধারণ নির্বাচন ডাকলেন এবং তাতে ক্ষমতায় এল সলোমন বন্দরনায়েকের শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি।

ডন স্টিফেনের সরকারে সলোমন বন্দরনায়েক ছিলেন স্থানীয় প্রশাসন দপ্তরের মন্ত্রী। তিনি ছাড়া মন্ত্রিসভার আর সব সদস্যই ছিলেন ডন স্টিফেনের আত্মীয়। প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনে তখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন সেনানায়কের সম্পর্কিত ভাই। যাই হোক, ডনের মৃত্যুর পরই সলোমন প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। যখন এই সুযোগ এল, তখন প্রথম চোটেই তিনি নানা প্ররোচনামূলক স্লোগান তুলে দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করলেন। সলোমন নিজে প্রথমে খৃস্টান ছিলেন, পরে রাজনৈতিক প্রভাব বাড়াবার জন্য বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্বের বক্তব্য ছিল ঃ অ-সিংহলিরা শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধধর্মের পবিত্রতা নষ্ট করছে। মনে রাখা প্রয়োজন, পাঞ্জাবের মত শ্রীলঙ্কাতেও রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে ধর্ম। স্থানীয় একটি বিশেষ গোষ্ঠীর বৌদ্ধরা প্রকাশ্যেই দাবি করেন, শ্রীলঙ্কা যে একমাত্র বৌদ্ধদের দেশ, সেটা নাকি স্বয়ং ভগবান তথাগতই স্থির করে দিয়ে গিয়েছিলেন। 'শ্রীলঙ্কা শুধু সিংহলিদের জন্য' – এই স্লোগান তুলে সলোমন বন্দরনায়েক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা জাগিয়ে তুললেন। একটা নতুন আইন পাস করিয়ে সিংহলিকে শ্রীলঙ্কার 'একমাত্র সরকারি ভাষা' বলে ঘোষণা করা হল। দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে তামিল ভাষা ব্যবহারের জন্যও প্রথম দিকে আইনে কিছু ভাসাভাসা শর্ত রাখা হয়েছিল, কিন্তু সিংহলিদের বিক্ষোভ-আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত তাও কার্যকর হয়নি। সে সময় তামিলদের প্রতিনিধিত্ব করত চেলভানায়কমের নেতৃত্বাধীন ফেডারেল পার্টি। তারা সত্যাগ্রহ করার হুমকি দিল। এমতাবস্থায় বন্দরনায়েক চেলভানায়কমের সঙ্গে দেখা করে একটা আপস-চুক্তি করলেন। চুক্তিতে বলা হল, তামিল হবে শ্রীলঙ্কায় সংখ্যালঘুদের ভাষা। উত্তর এবং পূর্ব প্রদেশে প্রশাসনিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে তামিল ভাষাই ব্যবহৃত হবে বলে ঠিক হল। তাছাড়া, চুক্তিতে



শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনে দলিল বিনিময় করছেন ঃ চুক্তি স্বাক্ষরের মূল্য কে গুনছে ?

তামিলদের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ এবং শিক্ষা ও কৃষি সংসদ গড়ার কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু হলে কী হবে, জঙ্গি বৌদ্ধদের আন্দোলনে এই চুক্তিও রূপায়ণ করা সম্ভব হল না। ফলে তামিলরা ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন। অনিবার্য ফলস্বরূপ ১৯৫৮ সালে শ্রীলংকায় সিংহলি ও তামিলদের মধ্যে ব্যাপক দাঙ্গা বাধল। সে সময় বৌদ্ধদের উগ্র তামিল-বিরোধী আন্দোলনে পেছন থেকে সক্রিয় মদত দিয়েছিল ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি (ইউ এন পি)। প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনে তখন ছিলেন ইউ এন পি-র প্রথম সারির নেতা। সিংহলিদের প্ররোচনা দেবার কাজে তাঁর প্রত্যক্ষ মদত ছিল। যাই হোক, তার পরের বছর, ১৯৫৯ সালে, এক উগ্র বৌদ্ধের গুলিতে প্রাণ হারালেন সলোমন বন্দরনায়েক।

সলোমনের মৃত্যুর পর ১৯৬০ সালে শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী হলেন তাঁর বিধবা স্ত্রী সিরিমাভো বন্দরনায়েক। ১৯৬৫-তে অবশ্য তিনি ক্ষমতাচ্যুত হলেন এবং আবার প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসলেন ডাডলি সেনানায়ক। সে বছর চেলভানায়কমের সঙ্গে ডাডলি আর একটি চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করলেন। এবারও ঠিক হল, উত্তর ও পূর্ব প্রদেশে তামিল হবে প্রশাসনের ভাষা। এই দুই অঞ্চলে জেলা উন্নয়ন পরিষদ তৈরি করা হবে বলেও ঠিক হল। কিন্তু আবার জঙ্গি বৌদ্ধদের চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত এই চুক্তি খারিজ হয়ে গেল।

এভাবে বারবার সাংবিধানিক পথে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ব্যর্থ হবার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তামিলদের মনে চূড়ান্ত হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হল। এই ক্ষোভের মধ্যেই ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠল তামিলদের জন্য একটি নিজস্ব দেশের পরিকল্পনা। গঠিত হল 'তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট'। পূর্ব এবং উত্তর প্রদেশ নিয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানাল এই সংগঠন।

অর্থনৈতিক কারণ

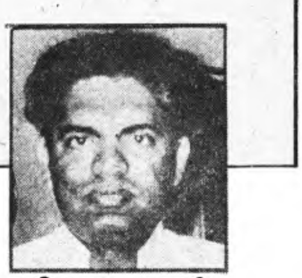
তামিলরা যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি তুলেছিলেন, তাঁরা যে ক্রমশই জঙ্গি হয়ে উঠছিলেন, তার পেছনে আর একটি বড় কারণ ছিল। কারণটা অর্থনৈতিক। এমনিতেই শ্রীলংকা গরিব দেশ। তার ওপর দেশের বেশির ভাগ সম্পদই উঁচু শ্রেণীর কিছু সিংহলির হাতে কেন্দ্রীভূত। ফলে সংখ্যালঘু তামিলদের আর্থিক অবস্থার কথা কহতব্য নয়।

আগে সামগ্রিকভাবে শ্রীলংকার অর্থনৈতিক অবস্থাটা একটু খতিয়ে দেখা যাক। স্বাধীনতার পর প্রথমদিকে ভালভাবে বোঝা না গেলেও, ষাট দশকের শেষভাগ থেকে



রণসিংঘে প্রেমদাস

বার বার সাংবিধানিক পথে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ব্যর্থ হবার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তামিলদের মনে চূড়ান্ত হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হল। এই ক্ষোভের মধ্যেই ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠল তামিলদের জন্য একটি নিজস্ব দেশের পরিকল্পনা। গঠিত হল 'তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট'।



ললিথ অতুলাথমুদালি

শ্রীলংকার আর্থিক দূরবস্থা প্রকট হয়ে ওঠে। রাবার এবং চা রপ্তানি থেকে আয় কমতে শুরু করল এবং সেই সঙ্গে বাড়তে লাগল বিদেশি ঋণের বোঝা। আর এই অবস্থার জের হিসাবে বাড়ল বেকারি।

১৯৫৫ সালে শ্রীলংকার বিদেশি ঋণের পরিমাণ ছিল ২০৫ মিলিয়ন (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ টাকা)। ১৯৬৯-তে এই ঋণ বেড়ে ১৩৭৫.৫ মিলিয়নে এসে দাঁড়াল। পাশাপাশি বিদেশি মুদ্রা তহবিলে ঘাটতির পরিমাণও বেড়ে ৭৪৪ মিলিয়ন টাকায় এসে পৌঁছল। চা, রাবার, ইত্যাদি রপ্তানি করলেও, গম, চাল, চিনি, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য ইত্যাদি বহু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সর্বদাই শ্রীলংকাকে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

রপ্তানি থেকে শ্রীলংকার আয় কতটা কমেছে, সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৮৪-তে শ্রীলংকার মোট বিদেশি আয়ের পরিমাণ ছিল ২১০০ মিলিয়ন ডলার। ১৯৮৬-তে তা কমে ১৯৪৯ মিলিয়নে এসে দাঁড়ায়। পর্যটন শ্রীলংকার আর একটি বড় শিল্প, কিন্তু তার দুরবস্থাও সাংঘাতিক। ১৯৮২-তে শ্রীলংকায় এসেছিলেন মোট ৪,০৭,২৩০ জন পর্যটক। ১৯৮৬-তে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় প্রায় অর্ধেক। শ্রীলংকায় ১২টি বড় হোটেল অর্থাভাবে বন্ধ করে দিতে হয়েছে। যাই হোক, রপ্তানি থেকে আয় কমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে বিদেশি ঋণ। ১৯৭৮-এ শ্রীলংকার বিদেশি ঋণ ছিল ১৭,২৭৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৮৬-তে এই বোঝা বেড়ে ১,১৩,৩০৮ মিলিয়ন টাকায় এসে পৌঁছেছে।

শ্রীলংকার এই অধোমুখী অর্থনীতিতে তামিলদের অবস্থা দুর্বিষহ। ১৯৮১ সালে বাগিচায় কর্মরত তামিল শ্রমিকদের দৈনিক বেতন ছিল : পুরুষ – ১০ টাকা, নারী – ৮ টাকা। তাছাড়া, সিংহলি 'জাতীয়' ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পাবার পর দুই দশকে সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত তামিলদের সংখ্যা ৫০ শতাংশ থেকে কমে ১০ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। বেসরকারি উদ্যোগে নিযুক্ত তামিলদের সংখ্যা ৩৫ শতাংশ থেকে কমে ১৫ শতাংশ হয়ে যায়। শ্রীলংকায় তামিলরা যে কতটা সহ্যাতীত পরিবেশে বাস করেন, এই তথ্য থেকে সেটা পরিষ্কার।

শান্তি ফিরবে কবে ?

যাই হোক, এখন প্রশ্ন হল : শ্রীলংকায় শান্তি ফিরবে কীভাবে ভারত-শ্রীলংকা চুক্তিতে উত্তর এবং পূর্ব প্রদেশে প্রশাসনিক ঐক্যের জন্য একটি গণভোট নেবার কথা বলা হয়েছে। টাইগাররা মনে করেন, গণভোটে তামিলদের পরাজয় প্রায় অনিবার্য। কারণ, তামিল-অধ্যুষিত অঞ্চলে জোর করে সিংহলিদের বসিয়ে দেবার ঘটনা এখনও আগের মতই ঘটে চলেছে। তাছাড়া, এই গণভোট অবাধ হবে না বলে টাইগারদের ধারণা। অবশ্য তাঁদের অসন্তুষ্টির অন্যান্য কারণও রয়েছে। কিন্তু কথা হল, কতদিন ও তাঁরা ভারতীয় শান্তিসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাবেন ? মুখোমুখি লড়াইয়ে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে তাঁদের পেরে ওঠার কথা নয়। তাই তাঁরা এখন গেরিলা-যুদ্ধের কৌশল নিয়েছেন। এই অবস্থা বেশিদিন চললে আর যাই হোক, শ্রীলংকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব হবে না, সেটা নতুনভাবে বলে দেবার প্রয়োজন নেই। যত দ্রুত এই রক্তপাতের অবসান হয়, ততই মঙ্গল – তামিলদের পক্ষে তো বটেই, ভারতের পক্ষেও। □

অরূপ দে

ভিডিওতে উইল করুন

মানুষের মুখের ভাষা তৈরি হওয়ার বহু বছর পর লিপির জন্ম। লিপি মানুষের মনের ভাব ও ভাষার স্থায়িত্ব এনে দিল। লিপি চালু হওয়ার পরপরই বোধহয় প্রচলন হয় স্বাক্ষরের। উইল ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বাক্ষর ক্রমে নিবার্য উপাদানরূপে স্বীকৃতি পায়। এই পর্যন্ত চলছিল বেশ - কিন্তু ক্রমে দেখা গেল জাল স্বাক্ষর ও বলপ্রয়োগে স্বাক্ষরদানে বাধ্য করা ইত্যকার নানা জটিলতা এসে পড়েছে। পৃথিবীর নানা দেশের আদালতে আদালতে এই নিয়ে জমা হতে শুরু করে মামলার পাহাড়। অনুমান করা হয় যে, সেই সব জমা হওয়া নথিপত্রের উপর যে পরিমাণ ধুলো জমা হয়ে আছে তা সাফ করতে গেলে পুরো এশীয় মহাদেশ পাক্কা তিনদিন অন্ধকারে ঢাকা থাকবে। সম্প্রতি বিজ্ঞান খুব অভিনব প্রথায় এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছে।

স্ত্রী বা পুরুষ উইলের মাধ্যমে বিষয়-সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করে যান। কিন্তু এ ব্যাপারে উইলকারী ব্যক্তিটির শারীরিক ক্ষমতা এবং মানসিক চিন্তাধারা নিয়ে অনেক সময় প্রশ্ন উঠতে পারে। কখনো কখনো এরকম প্রশ্নও ওঠে যে, উইলকারী ব্যক্তিটির বক্তব্য যা, হয়ত তা না করে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করে, বা জোর করে অন্য কিছু লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে বা তাকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বিবদমান এই প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতেই কয়েক বছর আগে স্বাক্ষর ভিডিও-রেকর্ডিং-এর উৎপত্তি হয়েছে। ভিডিও-র মাধ্যমে উইলকারী ব্যক্তিটির হস্তাক্ষর ও উইলকালে তার ভাবমূর্তি কী ছিল তা ধরে রাখার প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম শুরু হয় পশ্চিম জার্মানিতে। এর পর ইংলন্ড এবং আমেরিকা। এবং ক্রমে ক্রমে ভারতেও সে প্রথা চালু হয়। কিছুদিন আগে ভারতের অশীতিপর এক বৃদ্ধা তাঁর লিখিত দলিল এবং দলিল করার সময়কার ভাবমূর্তি ভিডিও রেকর্ডিং করিয়ে রাখেন। ঐ বৃদ্ধার মৃত্যুর পর তাঁর দলিল নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে, তার দলিলের ভিডিও ক্যাসেট আদালতে পেশ করা হয়। আদালতে তাঁর স্বাক্ষর সিদ্ধ প্রমাণিত হয়।

এ ব্যাপারে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। এক মহিলা মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর পুত্রকে না দিয়ে পৌত্রকে দিয়ে যান এবং উইলনামা কার্যকর করার জন্য পুত্রবধূকে ট্রাস্টি করে যান। মহিলার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র উইলে মা-এর স্বাক্ষরের বৈধতা নিয়ে আদালতে আপত্তি তোলেন।

আদালতে মৃতার ভিডিও ক্যাসেট দেখে বিচারক সিদ্ধান্ত নেন উইলের স্বাক্ষর ঐ মৃতার-ই। এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করলে ঐ আদালতে ১৯৮৬ সালে ৯ ডিসেম্বর কেসের শুনানি শুরু হয়।

এ ব্যাপারে মৃতার পুত্র কোর্টে এই বলে নালিশ করেন যে, উইলনামা করার সময় নালিশকারীর মায়ের মানসিক অবস্থা ঠিক ছিল না, ফলে মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি কীভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে সে ব্যাপারে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। ফলে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

পুত্রের এই আপত্তিক্রমে আদালত ভিডিও ক্যাসেট দেখে মন্তব্য করেন যে, ভিডিওতে দেখা গেছে উইল করার সময় তাঁর মায়ের মানসিক অবস্থা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। সুতরাং তাঁর উইল সিদ্ধ। এর পরেও যদি আবেদনকারীর আর কোন আপত্তি থাকে তাহলে তিনি আদালতে নালিশ করতে পারেন।

উইল করার ব্যাপারে প্রাচীন যুগ থেকে নানা প্রকার প্রথা চালু হয়ে আসছে। এ ব্যাপারে একটা প্রথা প্রায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সিদ্ধ যে, উইলনামা লিখিত হওয়া প্রয়োজন। এবং উইলনামা করার সময় উইলকারী মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকবেন। এবং ঠিক কী কারণে তিনি উইল করছেন উইলে তার উল্লেখ থাকবে।

উইলনামার ব্যাপারে নানারকম মজাদার ঘটনা আছে। এক কৃষক উইল করে সেটি গোপন রাখার জন্য তার ক্ষেতের ট্রাক্টরের নিচে রেখে দেন। হঠাৎ একদিন ট্রাক্টরটি বিগড়ে যায়। এবং সেটি সারাতে গিয়ে হঠাৎই পড়ে যান। এবং আসন্ন মৃত্যুর আশংকা করে সংগে সংগে তিনি ট্রাক্টরের ফালের নিচে থাকা 'ফেন্ডারে'র পাথরের ওপর তাঁর নিজের অন্তিম ইচ্ছা উইলাকারে লিখে রেখে যান। ঐ উইল লেখার সময় কোন সাক্ষী ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আদালত ফেন্ডারের ওপরের লেখাকেই বৈধ উইল বলে মেনে নেন।

এরকম আরও একটি ঘটনা ঘটেছে আমেরিকাতে। এক গৃহিণী হঠাৎই গুরুতর অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। সেই সময় উইল করার প্রয়োজনীয় কোন কাগজ ছিল না, এমনকি সাধারণ কাগজ কিনে আনারও সময় ছিল না। মৃত্যুপথযাত্রিণী সেই গৃহিণীর সামনে একটি রান্নার বই পড়েছিল। তাই বইয়েরই এক খন্ড পাতায় তিনি উইল লিখে রেখে যান। ঐ বৃদ্ধার মৃত্যুর পর সম্পত্তি নিয়ে বিতর্ক শুরু হলে আদালত ঐ রান্নার বই-এ লেখা উইলকেই বৈধ উইল বলেই মেনে নেন।

মনে হয় আমাদের দেশে উইল করার প্রথা প্রাচীন যুগে প্রচলিত ছিল না। আর সেই কারণেই বোধহয় সংস্কৃত শব্দ ভান্ডারে উইলের কোন প্রতিশব্দ নেই। এমনও হতে পারে তখনকার দিনে যৌথ পরিবার ছিল বলেই সম্পত্তির সমস্ত অধিকার বর্তাতো ঐ পরিবারের মালিকের ওপর। এবং তার স্বোপার্জিত সম্পত্তি হস্তান্তরের সমস্ত ক্ষমতা তার ওপর থাকত।

কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য দেশে উইল করা একটি প্রাচীন প্রথা। সেই প্রাচীন প্রথার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে রোমে। উইলনামা লিখিত হবে, না মৌখিকরূপে থাকবে, কীভাবে লেখা হবে, আদালতে তা কীভাবে সিদ্ধ হবে ইত্যাদির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার সেখানে হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে বিখ্যাত সম্রাট জাস্টিনিয়ান যে মতবাদ প্রচলন করে গেছেন রোমের অধিবাসীরা তাকেই মেনে নেয়।

রোমের আইন আর আমাদের আইনের মধ্যে বহু মিল আছে। উইলনামায় যে সাক্ষীর প্রয়োজন হয় সেটা রোমের আইনকে অনুসরণ করেই চলে আসছে। আধুনিক আইনে এমন নিয়মও চালু আছে যে, সৈনিক যে উইলনামা করবে সেই উইলে সাক্ষীর কোন প্রয়োজন নেই। আবার কিছু কিছু দেশে সৈনিকের মৌখিক কথাই উইল বলে স্বীকৃতি পায়। তবে এক্ষেত্রে একটা কথা স্বীকার করতে হবে যে, সৈনিকটি যদি যুদ্ধক্ষেত্রে থাকে, যুদ্ধের প্রতীক্ষা করে, কিংবা রণক্ষেত্রে যাওয়ার আদেশ ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়ে থাকে কেবল সেক্ষেত্রেই মৌখিক কথাই উইল হিসাবে গ্রাহ্য হবে, নতুবা নয়। আর এই আইনের ব্যাপারেও কিন্তু তারা রোমের কাছেই ঋণী। □

পি. এম. বকসী

বস্ত্রশিল্প পাটশিল্প নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে, কে দায়ী এই সর্বনাশের জন্য ?

নিশীথ দে

পশ্চিমবঙ্গের দুটি সবচেয়ে পুরনো শিল্প – চটকল এবং সূতাকল শেষ হয়ে যাচ্ছে। একের পর এক চটকল এবং সূতাকল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দেড় লক্ষের বেশি শ্রমিক-কর্মচারী বেকার হয়ে পড়েছেন। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য কারা দায়ী ?

দায়ী শুধু শিল্পপতি গোষ্ঠী বা শ্রমিক-কর্মচারী নয়। বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার কোন ভাবেই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এখনও সমস্যা সমাধানের জন্য জাতীয়করণের দাবি তুলে শ্রমিক-কর্মচারীদের নির্ভেজাল স্বার্থ রক্ষাকারী সাজার চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে শিল্পপতি গোষ্ঠী আর্থিক সংকটের দোহাই দিয়ে, কখনও বা শ্রমিক অশান্তির কারণ দেখিয়ে চটকল বন্ধ করছেন। মূল কারণটা তাঁরা জানাতে রাজি নন।

কেন্দ্রীয় সরকার দুটি শিল্পকে বাঁচাতে দুটি প্রকল্প নিলেন। চটকলের জন্য আধুনিকীকরণের প্রকল্প এবং সূতাকলের ক্ষেত্রে পুনর্বাসন প্রকল্প। ভারতীয় পাটজাত পণ্য বিদেশের বাজারে অনেকদিন থেকেই সিনথেটিকের কাছে পিছু হটছে। পাটজাত পণ্য এত পুরনো যে বিশ্বের বাজারে অচল। এক্ষেত্রে চটকলগুলিকে আধুনিকীকরণের কাজটাই ছিল সবচেয়ে জরুরি।

প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী গত বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর কলকাতায় বসে ঘোষণা করলেন, চটকল আধুনিকীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সহজ শর্তে ২৫০ কোটি টাকা ঋণ দেবে। কিন্তু চটকল মালিকরা সেই টাকা নিয়ে আজ পর্যন্ত চটকল আধুনিকীকরণের কাজ শুরু করেননি। উদ্দেশ্যটা কী ? টাকাটা তাঁরা নিচ্ছেন না কেন ? ইতিমধ্যে রাজ্যের ২২টি চটকল বন্ধ হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা আগে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট করেছেন, বিক্ষোভ-সমাবেশ সবই করেছেন। তাতে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয়নি। লক আউটের ঘটনা বেড়ে গিয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী চুক্তি করে ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা মালিক পক্ষকে সাহায্য করেছেন। লক আউটের জন্য বা শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী চুক্তির জন্য এক ইউনিয়ন অপর এক ইউনিয়নকে দায়ী করে নিজেদের পিঠ বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

ইতিমধ্যেই আরো কয়েকটি চটকল বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ চটকলেরও দু তিনটি খুললো ঠিকই। কিন্তু সেখানে কী পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েছে সেটাও দেখা দরকার। যেখানে বন্ধ হবার আগে চার হাজার শ্রমিক কর্মচারী কাজ করতেন এখন সেখানে কমে দাঁড়িয়েছে দু হাজার। যেখানে চালু আছে সেখানেও নানাভাবে লোক কমানো হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা বলছেন, জাতীয়করণ করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যেমন সমাধান হয়েছে দু একটি চটকলে। কোটি কোটি টাকা লোকসান দিতে হচ্ছে। টাকা ঢেলে দেওয়া হচ্ছে সরকারি তহবিল থেকে। কিন্তু তাতে সত্যিই কি সমাধান হল ? নাকি বেসরকারি মালিকানায় যেখানে মূলধন সরিয়ে নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে লোকসানের ব্যবসায় দাঁড় করানো হয়েছে তাকেই কিছুটা সাহায্য করা হল ! পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত কোন শিল্প সংস্থা সচল হয়েছে বা লাভজনক হয়েছে ?

আসলে যেটা সন্দেহ করা হচ্ছে তা হল, এক শ্রেণীর চটকল মালিক চটকল আধুনিকীকরণের নামে পাট শিল্পকে নিশ্চিহ্ন করে আনতে চাইছেন। শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা কমিয়ে এনে মালিকরা সরকারের আড়াই শো কোটি টাকা নেবেন। আর সেই টাকা চটকলে আধুনিকীকরণের নামে অন্য ব্যবসায় খাটাবেন।

কেন্দ্রীয় সরকার কোনদিনই চটকল মালিকদের উপর জোর খাটাতে পারেননি। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার মধ্যেই আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। চার হাজার শ্রমিকের মধ্যে দু হাজার লোককে নানাভাবে ছাঁটাই করার পর বাকি দু হাজার শ্রমিককে রেখে চটকল খোলা হল। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা প্রচার করলেন, আন্দোলনের চাপে মালিকপক্ষ বন্ধ চটকল খুলতে বাধ্য হলেন। ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে কীভাবে চুক্তি হল : রাষ্ট্রায়ত্ত চটকলে গড়ে ১ টন উৎপাদন করবে ৭২ জন। কিন্তু বেসরকারি চটকলে কোথাও ৪০জন কোথাও ৩৫জনকে ১ টন উৎপাদন করতে হচ্ছে। এইভাবেই চুক্তি হয়েছে। বেসরকারি মালিকরা কাজের বোঝা বাড়ালেন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা কী করলেন ?

এইভাবে ছাঁটাই হতে হতে যখন এক-তৃতীয়াংশ দাঁড়াবে তখন মালিকরা আধুনিক মেশিন আনবেন সরকারি টাকায়। কম লোক দিয়ে বেশি কাজ করানোর ঝামেলাটা মালিকরা আগেই সেরে নিতে চাইছেন।

সূতাকলেও চলছে একই জিনিস। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এন টি সি এবং বেসরকারি সূতাকলে দু রকম রাজনীতি নিয়ে চলছেন। কিছু কিছু এন টি সি-র সূতাকলে প্রায়ই শ্রমিক অসন্তোষ চলছে। বলছি না, এর জন্য শ্রমিক কর্মচারীরা দায়ী। এক শ্রেণীর অফিসার যে শুধু এন টি সি-র সূতাকলগুলির সর্বনাশ ডেকে আনছেন তাই নয় বেসরকারি মালিকদের সহায়তা করছেন। এন টি সি-র সূতাকলে এক একটি পদে দু-তিন জন করে অফিসার রয়েছেন। কোটি কোটি টাকা বাজে খরচ হচ্ছে। বেসরকারি মালিকানার সূতাকলগুলির উৎপাদন করা পণ্য যাতে বাজার পেতে পারে, এন টি সি যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়াতে পারে সেজন্য অনেক জায়গায় খেলা চলছে। এই খেলায় যোগ দিয়েছেন এন টি সি-র কিছু অফিসার, বেসরকারি সংস্থার মালিক এবং কিছু ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। এন টি সি-র সূতাকলগুলিতে উৎপাদন মার খাচ্ছে কাঁচা মালের অভাবে। শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি মানা হচ্ছে না। তার ফলে শ্রমিক অসন্তোষ বাড়ছে।

সূতাকল মালিকদের একাংশ চেষ্টা করছেন এন টি সি-কে ডুবিয়ে দিয়ে ছোট ছোট বেসরকারি মালিকানার সূতাকলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে একচেটিয়া কারবার করতে। সেজন্য কিছু এন টি সি-র মিলে সবসময়ে শ্রমিক অসন্তোষ জিইয়ে রাখা হচ্ছে। কোন কোন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এই অশুভ আঁতাতকে মদত দিচ্ছেন।

সারা দেশে আজকে ১১০টি সূতাকল বন্ধ। এর মধ্যে এন টি সি-র মিল ১৪টি। পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ ৬টি। প্রতি বছর কাপড়ের দাম বাড়ানো হচ্ছে। সরকার ভরতুকি দিয়ে কতদিন এন টি সি-কে টিকিয়ে রাখবেন

বন্ধ চটকল এবং কাপড়ের কলের অন্তত চারশো শ্রমিক কর্মচারীকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে অভাবের জ্বালায়। বেকার শ্রমিক কর্মচারীরা বাজারে বসে মাছ বিক্রি করছেন। চটকল, কাপড়ের কলের দক্ষ শ্রমিক পেট চালাতে ফেরিওয়ালার কাজ বেছে নিয়েছে। বাজারে সব্জি বিক্রি করছেন, মাটি কাটার কাজ করছেন দিন মজুরিতে।

পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যশালী পাট এবং বস্ত্র শিল্প আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন। কে দায়ী এই সর্বনাশের জন্য □

পুরনো মোহর



একখানা জিপ এসে দাঁড়িয়ে গেল উলুবেড়িয়া স্টেশনে যাবার মোড় মুখে বাজার পাড়া রোডের ওপর। ধুনুরী আব্বাস আলী বেগ ছোবড়ার গদি সেলাই করছিলেন, রহমত আলী খান হোগলার ছৈ বুনছিলেন, সুবিদ সেখ মাথা চেলে চেলে তালে তালে উকো ধরে তক্তাপোশের পায়ার ঘটি তুলছিলেন, তার সামনে কাঠটাকে ঘুরপাক দেবার দড়ি টানছিল বালক আবুল হোসেন, বাসনকোসণ দেখাচ্ছিলেন হায়দার জাফর নিমদীঘির মুসলমান কজন রাস্তার বগছাড়ে হালপত্তনি দোকান ফেঁদে বসেছেন। তাঁরা সকলেই জিপ থেকে একজন লম্বা চওড়া স্বাস্হ্যবান মানুষকে ভারী জুতো আর মজবুত প্যান্ট জামা পরে নামতে দেখলেন। তাঁর চোখে পড়ল লম্বা আটচালার খানিকটা অংশে পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়ার নোটিশ লটকানো। লেখা আছে : ফজর, আসর, জোহর, মগরের, ইশা। পাশে পাশে সময় লেখা। মাদুরীর দোকানদার কিব্‌রিয়া মোল্লা চেয়ারে রোদে বসে গল্প করতে থাকা ইনসান সেখকে বললেন, 'ইনি তো পুলিশের লোক, কোমরে রিভলভার, সংগে বউকে এনেছেন – কী চায় দেখুন চাচাজান।'

দাড়ি আর মাথা চুলকে ইনসান সেখ বললেন, 'আমার জায়গায় তোমরা বসেছ ব্যবসা করতে, চাকরির জন্য তো সরকারকে জ্বালাতন করছ না – এখন সমস্যা হল গোঁফে খেজুর বেধে আছে   রাস্তার গায়ে কেন দোকানগুলো ঠেকালে এই কথা তুলে ফ্যাসাদ বাধাবার ভয় দেখিয়ে কিছু নজরানা আদায় করতে পারেন। তার চেয়ে তোমরা দেখ, ভদ্রলোককে একখানা গদি বা লেপ, দু-খানা মাদুরী, এক ডজন বাসন-প্লেট, দু-খানা চেয়ার এমনি দিয়ে বিদায় করতে পার কিনা। হেসে মিষ্টি করে বিনয়ের সংগে কথা বলবে।'

কিব্‌রিয়া মোল্লা পাঁশকুড়ার লোক। লেখাপড়া জানেন। কাছে এসে সালাম জানাতে পুলিশ অফিসার খুশি হয়ে সালামের উত্তর দিলেন। মোসাফেহার জন্য হাত বাড়ালেন। বললেন, 'আপনারা দোকান করেছেন এই বগছাড়ের ওপর বাঁশের মাচান করে   তলাটা গেঁথে নিতে পারেন তো।'

'এটা ট্রায়াল পিরিয়ড স্যার। পাঁচ বছর টিকে গেলে মালিক গাঁথতে দেবেন। তিনি ঐ যে চেয়ারে বসে আছেন।

'আমার একখানা লেপ আর গদি দরকার। মাদুরী, গ্লাস প্লেটও নিতে পারি। জাহানারা নেমে এসো।'

দোকানদাররা সবাই এসে ভিড় করলেন।

পুলিশ অফিসার বললেন বাগনানে ছিলাম, 'এখন আমতায় খোলা মেলা জায়গায় যাব –তাই বাসা সাজাবার নতুন জিনিস চাই।'

দু'খানা চেয়ার এনে দেওয়া হল 'কারপেনটার হাউস' থেকে।

পুলিশ অফিসার বললেন, 'আমার নাম শাহাবুল হোসেন। ইনি আমার স্ত্রী জাহানারা বেগম।'

জাহানারা বেগমকে সবাই সালাম জানালেন। মৃদু হেসে হাত তুলে তুলে প্রত্যেককে সালাম জানিয়ে জাহানারা কারপেনটার হাউসের ভেতরে গিয়ে ঢুকলেন। আলমারি, চেয়ার, ডেস্ক, টেবিল, ড্রেসিং টেবিলগুলোর দামদস্তুর করলেন।

তাঁদের টেবিল সাজিয়ে চা অমলেট মিষ্টি দেওয়া হল।

শাহাবুল হোসেন বললেন,'এসব আনাতে গেলেন কেন   ঠিক আছে, আমরা খাচ্ছি কিন্তু বিল দিয়ে দেব। আপনারা এটা আর খরিদ জিনিসের সংগে ধরে নেবেন না।'

মৃদু হেসে জমি-জায়গার মালিক ইনসান সেখ বললেন, 'আমাদের একটা ফান্ড আছে, তা থেকে খরচা করি অতিথিদের জন্য। মাঝে মাঝে আমরা দান-খয়রাত করি, মিলাদ দিই। গত বছর আমরা ব্যবসায়ী সংঘ থেকে একশোজন গরিব ছাত্র-ছাত্রীকে জামাকাপড়, বইপত্র দিয়েছি। লাভের এক পারসেণ্ট আমরা রেখে দিই।'

'আপনি কি করেন ?'

'আমার ইট আর টালির বিজনেস আছে ঐ ও পাশে। ভাঁটা নেই আমার। জায়গা আছে কিন্তু ভাঁটা করতে দেবে না। অনাবাদী জমি পড়ে আছে অনেকখানি। এই যে লাইনঘরটা বেঁধেছি এর নিচের সমস্ত জলজমিটা আমার। ইটখোলা বানাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও পারমিশান পাইনি। কাছে সব ভদ্রপল্লী। এস ডি ওর সাব অফিস। ধোঁয়া আসবে।'

জায়গাটা আপনি আমাকে বিক্রি করবেন দশটা থানায় মেজো দারোগা, বড় দারোগা হবার পর এখন আরো বড় হয়ে কানের পাশে চুল পাকল আমার। দুটো ছেলেমেয়ে আছে। এখনো বাড়ি করতে পারলাম না। ঘুষ খাই না তো আমি। বাইশ-তেইশশো টাকা মাইনে পাই   ওতেই ভদ্রলোকের সংসারের খরচ চালাতে হয়। মেদিনীপুরের সেই ওড়িশা সীমান্তে আমার বাড়ি। মাটির ঘর পড়ে আছে। বুড়ো বাবাও আমার কাছে এসে আছেন। অনেকটা আপনার মতোই দেখতে।'

লেপ দু-খানা আর একটা গদি, কিছু কাচের

পাত্র, দু-খানা মাদুরী, একটা আয়না লাগানো ড্রেসিং টেবিল নেবার পর মগবেরের আজান হয়ে গেল।

জিনিসগুলো একটা ম্যাটাডোরে তুলে হেপাজত করে দিয়ে শাহাবুল হোসেন ওজু করে নামাজ পড়তে গেলেন।

জাহানারা বেগম জিপের ওপরে বসে রইলেন। রাস্তা দিয়ে ক্রমাগত লরি বাস রিক্সা চলে যাচ্ছে। মানুষজন যেতে যেতে জাহানারা বেগমের দিকে তাকায়।

কুলায়ে ফিরে যাচ্ছে সন্ধ্যার পাখিরা।

নামাজ পড়ে আসার পর ইনসান সেখ সংগে সংগে এলেন। বললেন, 'আপনাকে আমি বাড়ি করার জন্যে জায়গা দেব। ইট দেব। রাজমিস্ত্রি লাগিয়ে দেব। বিরাট বিরাট ম্যানসন করেছে সেই রাজমিস্ত্রি কলকাতার বনেদী অঞ্চলে। নাম নূরুল আলম। আমরা সবাই সহযোগিতা করব। সময় পার হয়ে গেলে আর পারবেন না বাবা। টাকাকড়ির কথা ভাববেন না। আসুন আপনি। আপনাকে আমি জমি দান করব।'

শাহাবুল হোসেন হাত চেপে ধরলেন ইনসান সেখের মোসাফেহার জন্যে। বললেন, 'আপনার দান গ্রহণ করতে পারার মত যোগ্য পাত্র তো আমি নই। ন্যায্য দামে যদি জায়গা না কিনি বুড়ো বেলায় ঐ বাড়িতে নামাজ পড়ার সময় সেজদায় গিয়ে আল্লাহকে কী কৈফিয়ত দেব?'

'আপনি বেশি দেরি করবেন না। হায়াত মউতে কথা তো বল যায় না। যদি বছর পার করে দেন তাহলে আমি জমিটা মসজিদের জন্য ওয়াকফকে দান করে দেব।'

'বোধহয় আমার বেশি দেরি হবে না। কেবল ছেলে দেখছি – মেয়েটাকে পার করব।'

সালাম জানিয়ে শাহাবুল হোসেন চলে গেলেন।

ইনসান সেখ ছেলের হাতে ইট-টালি বিক্রির ভার দিয়ে অধিকাংশ সময় তাঁর সাগরেদ দোকানদারদের কাছে এসে বসে থাকেন। পাঠান মোগল আমলের ইতিহাস, উপন্যাস পড়েন।

ইনসান সেখ কেবল ইমানদার মুসলমান খোঁজেন। তাঁরা কোথায় গেলেন নসীম হিজাজীর 'মোয়াজ্জেম আলী' উর্দু ঐতিহাসিক উপন্যাস গ্রন্থের অনুবাদ 'খুন রাঙা পথ' পড়ে চুপচাপ বসে থাকেন ইনসান সেখ। বেচাল কথাবার্তা, বেহিসাবি ধরন-ধারণ কোন মুসলমানের দেখলেই তিনি চটে যান।

তাঁর কাছে সুভাষ চক্রবর্তী নামে একজন মধ্যবয়সী মানুষ পতিতভূমিটি কেনার জন্যে এলেন। তিনি নাকি এখানে একটি সুপার মার্কেট অথবা সানমাইকার কারখানা খুলবেন।

ইনসান সেখ বললেন, 'দয়াময়, যদি আপনি কয়েক দিন আগে আসতেন আমি লাভবান হতাম। কিন্তু একজন ব্যক্তিকে বসতবাড়ি করার জন্য কথা দিয়ে ফেলেছি। তাঁকে আমি বিশ হাজার টাকা দরে পাঁচ বিঘে জমি এক লাখ টাকায় দেব বলেছি।'

সুভাষ চক্রবর্তী বললেন, 'আমি আপনাকে এক লাখ পঁচিশ হাজার দেব।'

মাথা নাড়তে লাগলেন ইনসান সেখ। বললেন, 'অসম্ভব'।

'দেড় লাখ?'

'না হুজুর। পাঁচ লাখ দিলেও না। আমি কথা দিলে সেই 'ওয়াদা' ভাঙি না।'

'আপনি তো আচ্ছা বোকা লোক।'

'আজ্ঞে হাঁ, আমি সেকেলে লোক – একটু বোকা হয়েই বাঁচতে চাই।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আপনি সেকেলে লোক নন – পুরনো মোহর।'

দেরি দেখে ইনসান সেখ একদিন ধাওয়া করলেন আমতায়। শাহাবুল হোসেন বললেন, 'এখন তো আমার কন্যাদায়। কী করে হবে?'

'আরে সাহেব, ইট নিয়ে জায়গাটা আগে অ্যাকোয়ার করুন তো – পরে অন্য কথা ভাবা যাবে। নইলে প্রতিদিন আর খদ্দেরের জ্বালায় টিকির চুল উঠে যাবার কল হয়েছে।'

শাহাবুল হোসেন স্ত্রীর সংগে যুক্তি করার পর একটা চেক লিখে দশ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে জায়গাটাকে বুক করলেন। কিন্তু টাকার কোন রসিদ নিলেন না।

'সাইট ফর নোটিশ তুলে দিয়ে ইনসান সেখ নিজের ইট দিয়ে গোটা জায়গাটা ঘিরে দিলেন। রাজমিস্ত্রি বাড়ির নকশা এনে দিতে ইনসান সেখ তা দেখিয়ে এলেন শাহাবুল হোসেনকে। তিনি তো পেরেশান। বললেন, 'টাকা কোথায়, আপনি তো আমাকে ফাঁসাবেন দেখছি!'

'বাড়ির নকশা আপনার পসন্দ কিনা তাই বলুন. বিশ বছর ধরে আপনি টাকা বিনা সুদে শোধ করবেন। আমিও জানব আমার টাকা রয়েছে – আস্তে আস্তে ভাঙিয়ে খাচ্ছি।'

কন্যাদানের পর শাহাবুল হোসেন রোজই নিমদীঘিতে আসতে লাগলেন। সেখান থেকে উলুবেড়িয়া। বাড়ি তৈরি হচ্ছে তাঁর একটা ঘন আনন্দ মনে আবেগ আনে।

ধুনুরি, মাদুর ব্যাপারী, কারপেনটার, বাসন কোসন ব্যবসায়ীরা যেন তাঁর আপন ভাই হয়ে গেছেন – তাঁরা নিজের মতো দেখাশুনো করছেন সবকিছু। খাতিরের অন্ত নেই তাঁর। অথচ এইসব লোককে যদি তিনি অর্ধশিক্ষিত বলে অবজ্ঞা করতেন, অথবা পথের ধার থেকে ওঠবার ভয় দেখিয়ে কিছু টাকা বা জিনিসপত্র হাতাতেন তাতে তাঁর কতটা লাভ হত

আর এটাও ঠিক যতই উচ্চশিক্ষিত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তিনি হোন যদি এঁদের সংগে নামাজ না পড়তেন তাহলে ইনসান সেখের হৃদয় তাঁর জন্য স্নেহরসে আদৌ দ্রবীভূত হত না।

তাঁর স্মরণ হয়ে যায় ইকবালের কথা : 'তার চেয়ে পৌত্তলিকও ঢের ভাল যে মুসলমান ঘুমিয়ে থাকে কাবার মধ্যে।'

ইনসান সেখের নির্মল হাসিমাখা মুখের–তার দীপ্ত দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভূত এক শক্তিমান আর বিশ্বাসী মানুষ মনে হয়। এমন লোক তো খুব বেশি দেখা যায় না।

শাহাবুল হোসেন একদিন একটি লম্বা অংকের অফার পেলেন – তিনি মস্ত এক সিমেন্ট আর গাঁজা, আফিম চোরাইয়ের ঘুঘু ব্যবসায়ীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন। সে টাকায় ইনসান শেখের ঋণ শোধ হয়ে যাবে। করেন তো পুলিসের কাজ। ঘুষ না নিলেও কি মানুষ তাকে সৎ বলে বিশ্বাস করবে

জাহানারাকে জিগেস করতে তিনি বললেন, 'ইনসান চাচাকে জিগেস করো। তিনি ঘুষের হারাম টাকা নেবেন কিনা। সেই টাকা নিয়ে তো তিনি হজে যাবার ইরাদা করে আছেন।'

ইনসান সেখ দাড়ি আর টুপি খুলে মাথা চুলকোতে লাগলেন, বললেন, 'না বাবা, আমার এ বছর হজে গিয়ে দরকার নেই। তুমি ঘুষ নিয়ো না।'

'তাহলে কেস দিয়ে দোব?'

'দাও।'

'যদি আমার প্রাণ সংশয় ব্যাপার ঘটে?'

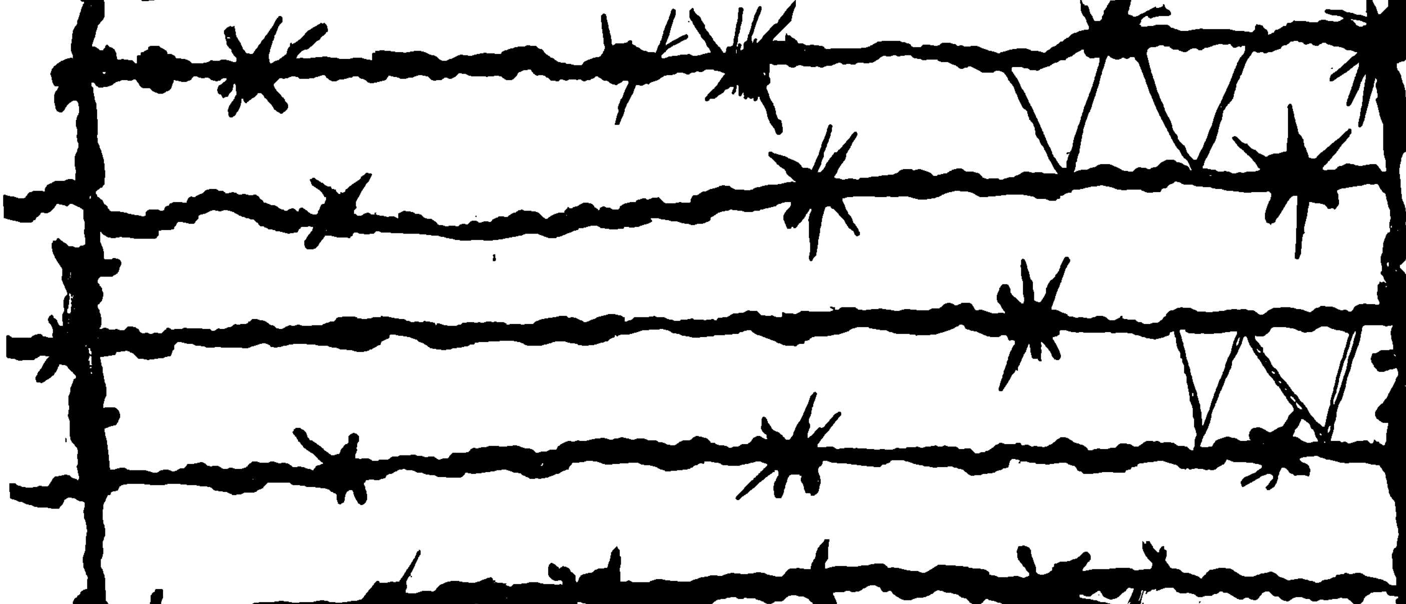
'ঘটুক। ন্যায়ের জন্য মরবে, তাতে ভয় কী?'

শাহাবুল হোসেন কেস লিখতে লিখতে ভাবতে লাগলেন, ইনসান সেখ একটা হীরের টুকরো। তাঁর দাম অনেক।...

আব্বাস আলী বেগের ছোবড়ার গদি সেলাই, রহমত আলী খানের হোগলার ছৈ বোনা, সুবিদ সেখের মাথা চেলে চেলে হেসে হেসে কাঠ চাঁছা, হায়দার জাফরের বাসনকোসন বিক্রি আর বালক আবুল হোসেনের দুলে দুলে দড়ি টানা দেখতে দেখতে বেলা দুপুর হয় ইনসান সেখের তিনি যেন তাঁদের এক পরিবারের কর্তা – কখন কোনদিক থেকে বিপদ আসে তার জন্যে বুক পেতে বসে আছেন আর বিকেল বেলা রাজমিস্ত্রির কাছে থাকেন যেন কোন কাজ না গলতি হয় তা দেখার জন্যে।

আসলে তিনি শাহাবুল হোসেনকে ধরেছেন দরিয়ায় ভেসে যাওয়া একটা কাঠের মতো। যিনি আইনকানুন জানেন। বিপদে আপদে সাহায্য করবেন। তিনি এসে বসলেই নিজের কবর তৈরি করে ফেলতেও পিছপা হবেন না ইনসান সেখ। □

আবদুল জববার



আটজন নকশালপন্থী বিচারাধীন বন্দী জেল ভেঙে পালিয়েছে। নিখুঁত পরিকল্পনা, নিশ্ছিদ্র রূপায়ণ। ঘটনার একপক্ষকাল পরেও পলাতকদের একজনেরও টিকি ছুঁতে পারেনি পুলিশ। এ থেকে কি প্রমাণ হয়, পুলিশ এবং প্রশাসনের অপদার্থতা নাকি পলাতকদের রাজনৈতিক কুশলতার জয় হয়ত প্রমাণ করা যাবে না কিছুই। কিন্তু একজন বিচারাধীন বন্দী যখন প্রশাসন আর আদালতের অসহযোগিতা এবং আইনের

ওরা আবার জেল ভেঙেছে

জটিলতায় ক্লান্ত হতে হতে জামিন পাওয়ার সবরকম উৎসাহ হারিয়ে ফেলে, তাকে গ্রাস করে এক গভীর হতাশা। আর কারাগারের ১৮ ফুট উঁচু প্রাচীরের বেষ্টনী ক্রমেই তার চারপাশ ঘিরে ছোট হতে থাকে। জেলকর্মী, প্রশাসন এবং নকশালপন্থীদের মতামতসহ মিলন দত্তর তদন্তমূলক রিপোর্ট।



জেল ভেঙে বন্দী পালানর প্রত্যেকটি ঘটনাতে কমবেশি নাটকীয়তা থাকে আর থাকে উত্তেজনা। সেই বন্দীরা নকশালপন্থী হলে, সে ঘটনায় যুক্ত হয়ে যায় অতিরিক্ত এক মাত্রা। গত দু দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গে যতগুলো জেল ভাঙার ঘটনা ঘটেছে তার প্রায় সবগুলোর পিছনে ছিল নকশালপন্থীদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। কেবল পালানর জন্য পালান নয় –এ হল 'জেলের ভিতরে লড়াই' চালাবার এক প্রক্রিয়া। তবে এই দু দশকের পরিসরে প্রায় দশটি জেল ভাঙার ঘটনায় যত বন্দী পালাতে পেরেছিল তার বেশিরভাগই পরে ধরা পড়ে যায়। যে দুই একজন পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পেরেছেন, তাঁরা নকশালপন্থীদের কোন গোষ্ঠীর গোপন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এবারের ঘটনার বৈশিষ্ট্য এখানেই যে ঘটনার একপক্ষ কাল অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরেও পুলিশ এখনো একজন পলাতকেরও টিকি ছুঁতে পারেনি। এতে পুলিশ এবং প্রশাসনের অপদার্থতা নাকি নকশালপন্থী ওই আট পলাতক তথা নকশালপন্থী গোপন সংগঠনটির কৌশলগত সাফল্য প্রমাণ করে, সে বিতর্কে পরে আসা যাবে।

পুলিশ তো সেই আজিজুল নামের বাংলাদেশি যুবককেও ধরে আনতে পারেনি, যে গত ৮ আগস্ট দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে পালায়। প্রায় নিঃশব্দে, কোন প্রমাণ না রেখে পালিয়ে যায় আজিজুল। জেল কর্তৃপক্ষের ধারণা আজিজুল সকাল ৭টায় জেল থেকে বেরিয়ে যায় – সদর ফাটক দিয়ে প্রকাশ্যে পায়ে হেঁটে। জেলার সাহেব বেলা ৯ টার সময় জেল অফিসে এসে তার এই ধারণা ব্যক্ত করেন এবং কিছুক্ষণ ভাবনা-চিন্তার পর বেলা ১১-৩৫ মিনিটে পাগলাঘন্টি বাজাবার নির্দেশ দেন। কারণ এই ধরনের কোন দুর্ঘটনা ঘটলে নিয়ম আছে জেলে পাগলা ঘন্টি বাজানর।



ঠিক তিন মাসের মধ্যে ওই একই জেলার এবং জেল সুপারকে পাগলাঘন্টি বাজাবার নির্দেশ দিতে হল ওই দমদম সেন্ট্রাল জেলেই। সময় ভোর সাড়ে চারটে। কারণ তার আগেই, রাত তিনটের গিনতির আগেই তারা জেলের প্রাচীর টপকে পালায়। নিখুঁত পরিকল্পনা, নিশ্ছিদ্র রূপায়ণ। পাঁচ নম্বর সেলের চারটি ঘরের আটজন বন্দী (তাদের একজন চোখে দেখতে পায় না ও একজন হাঁটতে পারে না)

জেল ভাঙার সংগ্রাম লাল সেলাম

জেল ভেঙে বেরিয়ে আসা বিপ্লবী কমরেডদের আমরা অভিনন্দন জানাই। আইনী পথে নয়, সংশোধনবাদী কায়দায় নিষ্ক্রিয় লড়াই-এর পথে নয়, আত্মত্যাগের রাজনীতিকে আত্মস্থ করে যথাসম্ভব নিখুঁত ও নিপুণ গেরিলা পদ্ধতি গ্রহণ করে কমরেডরা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার এবং অবিশ্বাস্য সাহসিকতার সাথে দমদম জেলের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে বেরিয়ে এলেন খোলা আকাশের নীচে জনগণের মাঝে। এই কিছুদিন আগেও কোচবিহার জেল ভেঙে বীর কমরেডরা বেরিয়ে এসেছেন। এর আগেও তাঁরা বারবার জেল ভেঙেছেন। দু'শো বছরের সাম্রাজ্যবাদ তাদের শাসনযন্ত্রে সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি তৈরী করেছিল জেলখানা, আজ বিপ্লবীদের সামনে দু'শো বছরের সেই ইমারৎ ভেঙে পড়ে যাচ্ছে এবং প্রমাণ হচ্ছে যে সাম্রাজ্যবাদ অত্যন্ত নড়বড়ে ভিতের উপর তার ইমারৎ গড়ে তুলেছিল। জেলের কমরেডরা আজ জেল থেকে পালিয়ে কারা-প্রাচীরে তাদের আটকে রাখার নিষ্ফল চেষ্টাকে মুহুর্মুহু বিদ্রূপ করছে। বন্দীদের হত্যা ও নৃশংস পীড়ন স্বত্বেও প্রতিক্রিয়াশীল সরকার এই জেল পালানো ও জেল বিদ্রোহ বন্ধ করতে পারছে না এবং কোন দিনও পারবে না।

১২।১১।৮৭ লাল সেলাম—

রেডগার্ড সংগঠন

★ চেয়ারম্যান মাও-এর সুযোগ্য সহযোদ্ধা ভাইস-চেয়ারম্যান লিন পিয়াও লাল সেলাম।

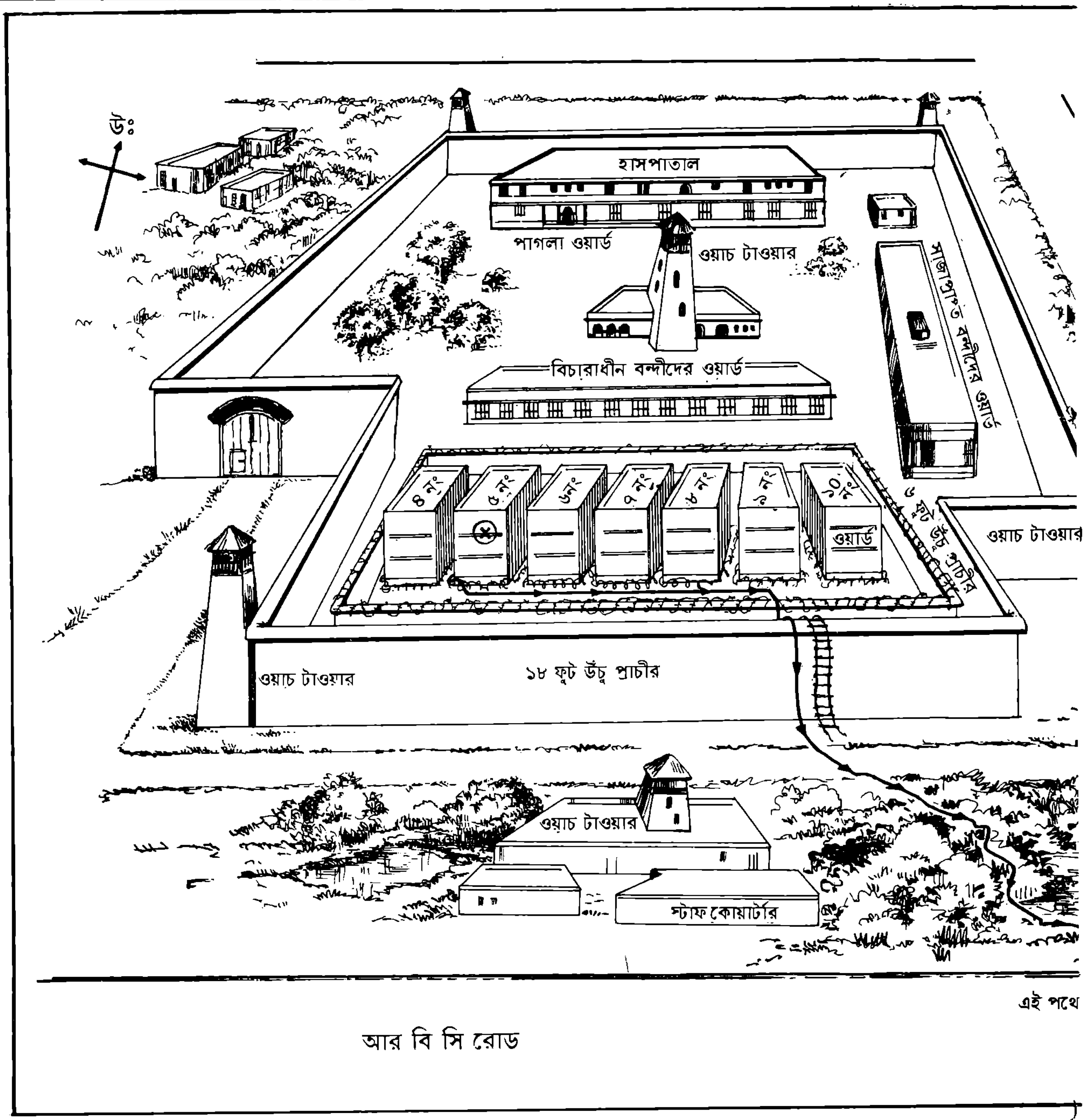
★ ভারতীয় বিপ্লবের মহান নেতা ও পথপ্রদর্শক কমঃ চারু মজুমদার লাল সেলাম।

★ নকশালবাড়ীর পথ ধরে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম চলছে, চলবে।

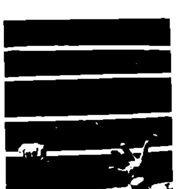
জেল ভাঙার সমর্থনে প্রচারিত লিফলেট

জেল এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে পালাল।

পুলিশের মতে ঘটনাটি ঘটেছে ভোর চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে। সি পি আই (এম এল)-এর দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে যুক্ত বিচারাধীন ওই আটজন বন্দীকে রাখা হয়েছিল তিন তলায় পাঁচ নম্বর সেলের নয় থেকে বার নম্বর চারটি ঘরে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, সুকুমার শার্দুল ও কালীমোহন পাল থাকতেন ন'নম্বর ঘরে। গৌতম চক্রবর্তী, সুজিত মন্ডল আর রতন দাস থাকতেন দশ নম্বর ঘরে, এগার এবং বার নম্বর ঘরে বাসুদেব দেব এবং বিষ্টু সর্দার বাস করত একা একা। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ডান পাশের পাঁজরের তিনটি হাড় ভাঙা, এর ফলে তিনি হাঁটা চলা করতে পারতেন না। গৌতম চক্রবর্তীর মাথায় গুলি লেগেছিল কয়েক বছর আগে, ফলে তাঁর শারীরিক দুর্বলতা তো ছিলই এবং এক চোখে দেখতে পেতেন না। প্রধান রক্ষী রাত একটার গিনতির সময়ও তাদের দেখতে পান কিন্তু রাত তিনটের গিনতি করতে গিয়ে প্রধান রক্ষী দেখতে পান তালা বন্ধ ন'নম্বর ঘরে কোন বন্দী নেই, অনুসন্ধান করে একটা বড়সড় ফুটো আবিষ্কার করেন। এবং তারপরই দশ এগার এবং বার নম্বর ঘরের অর্গলমুক্ত দরজা তাঁর চোখে পড়ে। অক্ষত তালা কিন্তু লোহার কব্জা ভাঙা। পুলিশ এবং জেল কর্তৃপক্ষের অনুমান ন'নম্বর ঘরের দেওয়ালে মানুষ বেরতে পারে এমন পরিসরের একটি গর্ত করা হয় সেখান দিয়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এবং অন্য দুজন বন্দী বেরিয়ে এসে দশ এগার এবং বার নম্বর ঘরের দরজা খুলে দেয়। জেলখানার নানা মহলের সন্দেহ, ওরা দীর্ঘ দিন ধরেই ঘরের দেওয়াল ভেজাচ্ছিল, প্রাচীন চুন সুরকির গাঁথনি এবং পলেস্তারা এতদিন ভেজার ফলে বেশ নরম হয়েই ছিল। লোহার কোন তীক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে আঘাত করে পলেস্তারা খসান গেছে অনায়াসে তারপর কেবল একটা ইট কোনভাবে বের করে আনা, ব্যাস্! চুন সুরকির গাঁথনি থেকে একটা ইট খুলে আনতে পারলে আশপাশের ইট খুলে মানুষ বেরনর মতো একটা গর্ত তৈরি করতে সময় লাগে মাত্র পাঁচ



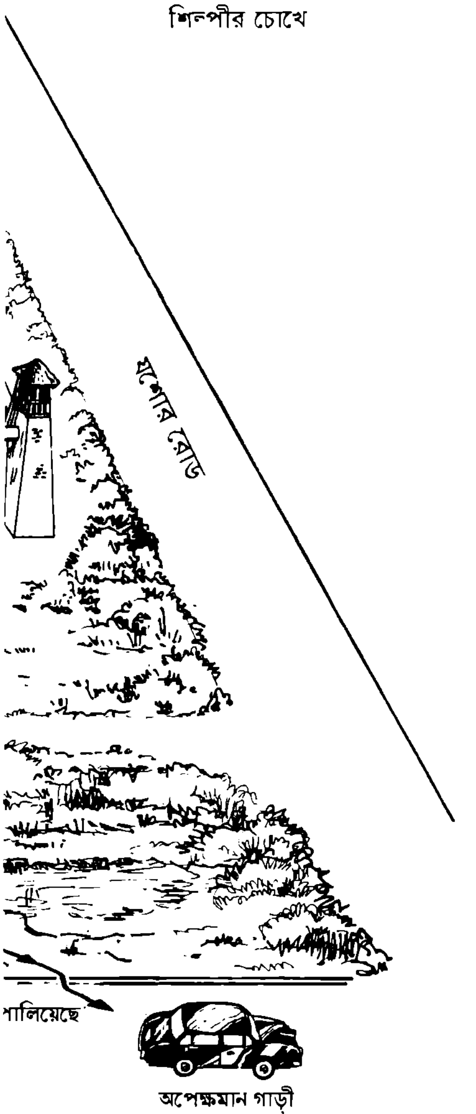
মিনিট, একথা পুলিশের বড়কর্তারাই স্বীকার করেছেন। কিন্তু বিচারাধীন বন্দী তীক্ষ্ম অস্ত্র বা লোহার রড পেল কোথা থেকে ?



জেলরক্ষী এবং কর্মীদের সূত্র থেকে জানা গেছে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঘরের ভিতর স্টোভ জ্বেলে নিজেদের রান্না নিজেরা করে নিত। ফলে তাদের কাছে ফল বা সবজি কাটার ছুরি ছিলই। এবং খানিকটা নীতি লঙ্ঘন করেই জেল কর্তৃপক্ষ নকশালপন্থী বিচারাধীন বন্দীদের দিয়ে বাগানের কাজ করিয়েছে। এবং বাগানের কাজে ব্যবহৃত নিড়ানি, খুর্পি ইত্যাদি যন্ত্রপাতি তাদের ঘরেই থাকত। চুন সুরকির পুরনো দেওয়াল থেকে ইট খুলে গর্ত তৈরি করতে ওই ধরনের যন্ত্রপাতিই যথেষ্ট। তাছাড়া ছ'নম্বর ওয়ার্ডে রাখা হয় হিংস্র পাগলদের। পাগলরা সারা দিনরাত এতই চিৎকার এবং আওয়াজ করে যে পাঁচ বা সাত নম্বর ওয়ার্ডের কোন ছোটখাট আওয়াজ পাহারারত জেলরক্ষীর কানে না পৌঁছতেও পারে। ফলে পাগল ওয়ার্ডের লাগাতার আওয়াজ হয়ত ছিল কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় তাহলে পাহারারত রক্ষীরা কি ঘুমিয়ে পড়েছিল ? এ ব্যাপারে ওয়ার্ডারদের সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ কারারক্ষী সমিতি জানায় যে, কেবল দুটি ওয়ার্ডের জন্য ৪ জন রক্ষী থাকার কথা কিন্তু ওই রাতে ছিল মাত্র ১ জন। ঘটনার রাতে কারারক্ষী কানাই বোসের দায়িত্বে ছিল ৪ এবং ৫ নং ওয়ার্ড। ৪ জনের কাজ কানাইবাবু একা করছিলেন। দুটি ওয়ার্ডের মোট ৯৬টা ঘরের দায়িত্ব তাঁর ওপর ছিল। বরখাস্ত হওয়া ওই কারারক্ষীর সহকর্মীরা অভিযোগ করেছেন, একজন রক্ষীর

দমদম সেণ্ট্রাল জেল থেকে বন্দীরা যেভাবে পালিয়েছিল

শিল্পীর চোখে



স্কেচ : গৌতম ব্যানার্জী

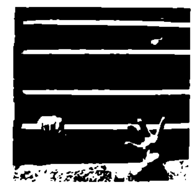
পক্ষে দিনে এবং রাতে দুবার করে ডিউটি করে সব সময় সতর্ক হয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব। ওই এক সূত্র থেকে জানা গেছে সেদিন কানাইবাবু দুপুরে ১২টা – ৬টা ডিউটি দিয়ে আবার শেষ রাতের ডিউটিতে যান।

একজন কারারক্ষীর ঘাড়ে দোষের পুরো বোঝাটা চাপিয়ে দিয়ে লাভ নেই। কারণ কানাই বোস ছাড়াও আরও ১১জন কারারক্ষী ওই রাতে পাহারায় ছিলেন। দমদম সেণ্ট্রাল জেলের মতো একটি প্রধান জেলে রাতের প্রহরীর সংখ্যা মাত্র ১২। কেউ পালাতে চাইলে এর চেয়ে আর অনুকূল জেল কোথায় পাওয়া যাবে। জেলে মোট কারারক্ষীর সংখ্যা কিন্তু ২২৬। তবে কেন ওই রাতে পাহারায় ছিল মাত্র ১২ জন? এরও একটা আপাত গ্রহণযোগ্য হিসেব পাওয়া গেছে কারারক্ষীদের সমিতির তরফ থেকে। কারারক্ষীদের মতে জেলকে সুরক্ষিত রাখতে গেলে এক এক শিফটে ৪৫ জন করে কারারক্ষী দরকার অর্থাৎ দমদম সেণ্ট্রাল জেলের জন্য দরকার মোট ৩১৫ জন কারারক্ষী। বর্তমানে একজন চিফ হেড ওয়ার্ডার। ২০ জন হেড ওয়ার্ডার এবং ২০৫ জন ওয়ার্ডার আছে দমদম জেলে। এই ২২৬ জন কারারক্ষী সবাই উপস্থিত থাকলে এবং সুস্থ থাকলে প্রতি শিফটে ডিউটির জন্য পাওয়া যেতে পারে ৩৩ জনকে। কিন্তু অসুস্থতা, ছুটি, সাপ্তাহিক বিশ্রাম এবং অনেক সময় বাইরের ডিউটি থাকার ফলে জেল চত্বর সুরক্ষিত রাখার জন্য ওই ৩৩ জনকেও প্রায় পাওয়া যায় না কখনো। ঘটনার দিন কোন অজ্ঞাত কারণে উপস্থিতির সংখ্যা কমে গিয়েছিল একটু অস্বাভাবিক রকমের। সমিতির হিসেব অনুযায়ী হাসপাতালে ভর্তি ছিল ৫০ জন, ৩৪ জন ছিল ছুটিতে। বাইরের হাসপাতালে রাখা অসুস্থ বন্দীদের পাহারায় ছিল ১২ জন কারারক্ষী আর ১৬ জনের সাপ্তাহিক বিশ্রামের দিন পড়ে গিয়েছিল ওই বুধবারেই। এছাড়া জেল গেট এবং জেলের অস্ত্রাগার ইত্যাদি পাহারার জন্য নিয়োজিত থাকে ৩০ জন। সমিতির আরো অভিযোগ, কর্তৃপক্ষকে বার বার দাবি জানিয়েও অতিরিক্ত কারারক্ষীর ব্যবস্থা করা যায়নি। তবে আশার কথা ওই ঘটনার পর কর্তৃপক্ষ জেল পাহারা দেবার জন্য এন. ভি. এফ এবং হোমগার্ড আনার কথা ভাবছেন।



দীর্ঘদিন জেল খেটেছেন এমন একজন তাঁর কথা বলতে গিয়ে জানালেন যে, বন্দীদের সংগে থাকতে থাকতে কারারক্ষীদের একটা বিশেষ ঘ্রাণশক্তি জন্মায়, জেলের ভেতরে কোন চক্রান্ত শুরু হলে ওরা তার আঁচ পেয়ে যায় বেশিরভাগ সময়ে। ওরা অনুমান করতে পারে কোন একটা চক্রান্ত অত্যন্ত গোপনে হলেও দানা বেঁধে উঠছে। চাকরি এবং জীবন বাঁচাবার জন্যই অনেকে ছুটি নিয়ে নেয় শুধুমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করে। কারণ ওরা জানে জেল ভাঙার ঘটনা ঘটলে কর্তব্যরত রক্ষীর চাকরি যাবে, আবার বাধা দিলে প্রাণের বিনিময়ে তার মূল্য দিতে হতে পারে। এই অনুমান যদিও ভিত্তিহীন তবু প্রশ্নটা কায়দা করে এড়িয়ে গেছেন প্রত্যেকেই।

প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে সরকার সাসপেন্ড করেছেন জেল সুপারিন্টেনডেন্টকে। সুপার অমিতাভ দত্ত বা সাসপেন্ডেড জেলাররা তাঁদের কোয়ার্টারেই আছে। অমিতাভ দত্তর সংগে যোগাযোগ করতে চাইলে তিনি কথা বলতে অস্বীকার করেন। পরিমল দাসও মুখ খুলছেন না। তবে এই প্রথম জেল পালাবার কোন ঘটনার পর সাধারণ ওয়ার্ডারের সংগে সংগে সর্বোচ্চ পদাধিকারী জেল সুপারও সাসপেন্ড হলেন। মোট ৯ জনকে এ পর্যন্ত সাসপেন্ড করা হয়েছে. দুজন জেলার, দুজন ডেপুটি জেলার, একজন হেড ওয়ার্ডার, তিনজন ওয়ার্ডার এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।



জেলখানার 'লাস্ট সিকিউরিটি' নাকি 'ওয়াল গার্ড' অর্থাৎ জেলখানার বাইরে প্রাচীর বরাবর ভ্রাম্যমান পাহারা থাকার কথা। এবং এই দায়িত্ব সশস্ত্র পুলিশের। কারারক্ষীরা জানালেন গত দু বছর হল ওয়াল গার্ডের পাট উঠে গেছে। সে খবর বন্দীরা রাখে। তাছাড়া ঠিক যে জায়গাটা দিয়ে ওরা প্রাচীর টপকেছে তার সামনেই স্টাফ কোয়ার্টারের ওপরে আছে জেল দফতরের ওয়াচ টাওয়ার। সেখানে সবসময় পাহারা থাকার কথা কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, লোক কম থাকায় ওয়াচ টাওয়ারে সবসময় পাহারা রাখা যায় না।

যাই হোক, পাঁচ ওয়ার্ডের তিনতলা থেকে দোতলায় নেমে আসে সিঁড়ির কোলাপসিবল গেটটা খুলে। লোহা কাটা করাত বা ঐ জাতীয় কোন যন্ত্র দিয়ে দোতলার ফেন্সিংটা কেটে জলের পাইপ বেয়ে আটজন নেমে আসে নিচে। প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ঘেরা থাকে মোটা তারের জাল দিয়ে। তারের জালের একটা অংশ ওরা ভেঙে ফেলেন। তারের খোঁচায় যাতে গা ছড়ে না যায় তার জন্য ভাঙা জায়গায় একটা কম্বল গলিয়ে একে একে বেরিয়ে আসে। সাতটা তিনতলা ওয়ার্ড ঘেরা রয়েছে ছ ফুট উঁচু প্রাচীর দিয়ে, প্রাচীরের ওপর আছে কাঁটা তার। কাঁটা তারের ওপর কম্বল বিছিয়ে দিয়ে পেরিয়ে আসে ছ ফুট উঁচু প্রাচীর। তারপর ওরা পৌঁছে যায় জেলখানার ১৮ ফুট উঁচু শেষ প্রাচীরের নিচে।

জেলের কর্তৃপক্ষ মনে করছেন হয়ত একজনের কাঁধে আর একজন উঠে পিরামিডের মতো তৈরি করেছিল। তারপর একজন জেলের প্রাচীরের ওপর উঠে ব্যাণ্ডেজ কাপড় এবং লিউকোপ্লাস্ট দিয়ে তৈরি দড়ি-মই দিয়ে অন্যদের প্রাচীরের ওপরে তুলে নেয় এবং একইভাবে বাইরের দিকে নামিয়ে দেয়। আবার কেউ অনুমান করছেন – জেলের বাইরে প্রাচীরের নিচে লোক ছিল তারা বন্দীদের সাহায্য করেছে প্রাচীর টপকে বেরিয়ে

চেয়ারে বসে এর বেশি বলা সম্ভব নয় ঃ কারামন্ত্রী

পরিবর্তন ঃ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে এখন কতজন নকশালপন্থী বন্দী আছেন

কারামন্ত্রী ঃ ৪৫ জন।

পরিবর্তন ঃ নকশালপন্থীদের আপনারা কি রাজনৈতিক বন্দী মনে করেন

কারামন্ত্রী ঃ বিধানসভায় যা বলেছি সেটা পুনরাবৃত্তি করছি না। এই সমস্ত বন্দীদের বিরুদ্ধে পুলিশ বিভিন্ন ধারায় কেস দিয়েছে। তার ভিত্তিতে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন জেলে তাদের রাখা হয়েছে। আমাদের কাজ শুধুমাত্র তাদের জেলে রাখা। তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। ওদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কিছু নির্দিষ্ট চার্জের ভিত্তিতে।

পরিবর্তন ঃ কিন্তু কিছুদিন আগেই এক সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে, পশ্চিমবঙ্গে কোন রাজনৈতিক বন্দী নেই

কারামন্ত্রী ঃ আমি এ ব্যাপারে নতুন কোন কথা বলব না। এই চেয়ারে বসে এর থেকে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।

পরিবর্তন ঃ এ ব্যাপারে আপনার পার্টি আর এস পি-র কোন আলাদা বক্তব্য নেই

কারামন্ত্রী ঃ এর বাইরে আমি কিছু বলব না। আপাতত এই চেয়ারে বসে যতটুকু বলা সম্ভব, তা কাগজকে বলেছি।

পরিবর্তন ঃ নকশালপন্থী বন্দীরা কি কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধা জেলে পেতেন

কারামন্ত্রী ঃ না। এদের অন্য কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা নেই।

পরিবর্তন ঃ কিন্তু দমদম সেন্ট্রাল জেলে নকশালবন্দীরা বাগানে কাজ করত, নিজেরা রান্না করে খেত। কীভাবে

কারামন্ত্রী ঃ বন্দীরা যেখানে থাকত, তার পাশেই বাগান ছিল। বন্দীরা একঘেয়েমি কাটাতে ওখানে গিয়ে মাঝে মাঝে বাগান করত। ফুল লাগাত। তবে সেটা বাধ্যতামূলক ছিল না। ওরা নিজেরা অবসর বিনোদনের জন্য ওটা করত।

আর রান্না করে নিজেরা সবসময় খেত না। অসুস্থ বন্দীদের জন্য কোন কোন সময় দুধ গরম করা বা জল গরম করার জন্য ওদের জেলের ভেতরে ওই সুযোগ দেওয়া হত। সেটা সম্পূর্ণ মানবিক কারণেই। অসুস্থ রুগীদের এই সুযোগ দিতেই হবে।

পরিবর্তন ঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বা অন্যান্য বন্দীদের কাছে যে ওষুধ, গজ এবং লিউকোপ্লাস্ট পৌঁছত, তা কি জেলার সরাসরি দিতেন ? নাকি রীতি অনুযায়ী কম্পাউন্ডারের কাছ থেকে পেত ?

কারামন্ত্রী ঃ ডাক্তাররা যতটা দিতে বলতেন, ততটাই তাদের পৌঁছে দেওয়া হত। বেশি দেওয়া হয়েছিল কি না, সেটা নিয়ে তো তদন্ত চলছেই। তদন্ত রিপোর্ট থেকে জানা যাবে।

পরিবর্তন ঃ দমদম সেন্ট্রাল জেলে মোট ওয়ার্ডারের সংখ্যা কত ?

কারামন্ত্রী ঃ ৩১৫।

পরিবর্তন ঃ কিন্তু কেন মাত্র ১২ জন ওয়ার্ডার সেদিন ডিউটিতে ছিলেন ?

কারামন্ত্রী ঃ সেটা নিয়ে তো তদন্ত চলছে। এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।

পরিবর্তন ঃ নকশাল বন্দীদের নামে এত বেশি কেস দেওয়া হচ্ছে কেন আপনি কি নিজে মনে করেন একজনের পক্ষে এতগুলি অপরাধ করা সম্ভব

কারামন্ত্রী ঃ আবার সেই বিষয়গুলো এসে যাচ্ছে। কেস তো আমরা দিই না। ওটা স্বরাষ্ট্রদপ্তরের ব্যাপার।

পরিবর্তন ঃ কিন্তু আপনি নিজে একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে কি মনে করেন, একজনের পক্ষে এতগুলি অপরাধ সম্ভব

কারামন্ত্রী ঃ বলছি তো এই চেয়ারে বসে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। জেল কর্তৃপক্ষ আদালতের নির্দেশের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল।

পরিবর্তন ঃ দমদম সেন্ট্রাল জেলে আপনার পার্টি আর এস পি ও সি. পি এম পরিচালিত কারারক্ষীদের দুটি ইউনিয়ন রয়েছে। এদের মধ্যে বিরোধ জেল প্রশাসনে মাঝেমধ্যে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে।

কারামন্ত্রী ঃ এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে রাজী নই। কে কার সংগে যুক্ত আমি জানি না।

পরিবর্তন ঃ জেল পালানোর ব্যাপারে সরকারি তদন্তে নতুন কোন তথ্য পাওয়া গেছে কি ?

কারামন্ত্রী ঃ সরকারি তদন্তে আর নতুন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। ডাক্তারদের সাসপেন্ড করার ব্যাপারে অযথা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা কাউকে সাসপেন্ড করিনি। তাদের বদলি করা হয়েছে। করেছেন স্বাস্থ্য দপ্তর।

সাক্ষাৎকার ঃ
দুর্বার গঙ্গোপাধ্যায়

আসতে। আর জেলখানার প্রাচীরের নিচেই রাস্তার দুপাশ জুড়ে আগাছার ঘন জংগল, ফলে জেল থেকে বেরিয়ে লুকিয়ে পড়তে কোন অসুবিধে হয়নি ওদের। জংগলের ভিতর দিয়েই ওরা পৌঁছে গেছে আর.বি. সি. রোডে। সামনের গ্লাস ফ্যাক্টরির রাতের দারোয়ান পুলিশের কাছে বলেছে যে, গভীর রাতে কতকগুলো সশস্ত্র যুবককে সে দেখেছে আর বি. সি. রোডের ওপর একটা অ্যামবাসাডার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। একজনকে বয়ে নিয়ে যেতেও সে নাকি দেখেছে।

পাঁচ নং ওয়ার্ডের বন্দীরা তিনতলা থেকে লক্ষ রেখেছে যে ঠিক পাঁচটার সময় ওয়াচ টাওয়ার থেকে পাহারাদার চলে যায়। এবং রাতে কোন পাহারা থাকে না। তিনতলায় থাকার ফলেই ওরা নাকি বাইরের রাস্তাঘাট সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠতে সুযোগ পেয়েছে। কারারক্ষীদের বক্তব্য, তাঁরা জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন বার বার জানিয়েছেন যে, নকশাল বন্দীদের যেন তিনতলা থেকে নামিয়ে একতলায় নিয়ে আসা হয়। কর্তৃপক্ষ তাদের কথা শোনেনি। ঘটনা ঘটে যাবার পর বাকি সব নকশাল বন্দীকে নামিয়ে একতলায় নিয়ে আসা হয়েছে।

একটা অভিযোগ বেশ জোরদার হয়েছে, বন্দীরা এত ব্যান্ডেজ এবং লিউকোপ্লাস্ট পেল কীভাবে। অভিযোগ এবং সন্দেহ এমনকি এই স্তরেও পৌঁছে যাচ্ছে যেন বা ব্যান্ডেজ এবং লিউকোপ্লাস্টের সাহায্যেই ওরা জেল ভেঙেছে। ফলে দোষারোপের একটি অংগুলি ডাক্তারদের দিকেও নির্দিষ্ট হচ্ছে। দমদম সেন্ট্রাল জেলে ডাক্তার থাকার কথা ৫জন, আছে দুজন। একজন সাধারণ চিকিৎসক, সাড়ে চারশ পাগলের জন্য একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। ডাক্তারদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর সত্যতা যাচাই করে নেবার জন্য আমরা মানসিক রোগ চিকিৎসক ডঃ জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরীর সংগে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কোন ব্যাপারেই তাঁরা মুখ খুলতে রাজি নন। তবে ব্যান্ডেজ, লিউকোপ্লাস্ট বন্দীদের কাছে সরবরাহ করার ব্যাপারে ডাক্তারদের দায় কতটা, এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করেন কারারক্ষীরা। গৌতম চক্রবর্তীর মাথার ক্ষত এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর পাঁজরা এবং পায়ের ক্ষতের জন্য গজ এবং লিউকোপ্লাস্ট তাদের পাওনা হত ঠিকই তবে তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাদের কাছে সরবরাহ করা হয়েছে কিনা সেটাই দেখার। জেলে ঢুকে অবধি ব্যবহৃত সমস্ত ব্যান্ডেজ এবং লিউকোপ্লাস্ট তারা সঞ্চয় করে রেখেছিল – এই ভাবনাটা খুব অমূলক হয় না। দমদম সেন্ট্রাল জেলে গৌতম চক্রবর্তী হয়ত মাত্র আট মাস আগে এসেছে কিন্তু বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তো ১৯৮৬ সাল থেকেই এই জেলে বাস করছিল।



তবে খটকা থেকে যায় অন্য জায়গায়। কারারক্ষীরা অভিযোগ করেছেন, যত ওষুধ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীরা পেত তার সবই সরবরাহ করা হত জেলার এবং সুপারের কাছ থেকে সরাসরি। এবং এটা করা হত জেল কোড না মেনেই। কারণ জেলের নিয়ম হল কোন রোগীর জন্য প্রেসক্রিপশান করবেন ডাক্তার, সেই প্রেসক্রিপশান রেকমেন্ড করে জেলার বাইরে থেকে ওষুধ আনিয়ে তা পাঠিয়ে দেবেন কম্পাউন্ডারের কাছে। খাওয়ার বা অন্য কোনভাবে ব্যবহারের ওষুধ হলে বন্দী তা সংগ্রহ করে নেবে কম্পাউন্ডারের কাছ থেকে আর ইঞ্জেকশান হলে কম্পাউন্ডার তা নিজেই দেবেন বন্দীর শরীরে। কিন্তু এক্ষেত্রে ওই নীতির কিছু ব্যতয় ঘটেছে। পাঁজরার ব্যথার কারণে বিশ্বনাথের পেথিড়িন লাগত প্রতিদিন। অনেকদিন তাকে একাধিক পেথিড়িন ইঞ্জেকশান নিতে হত। কিন্তু পেথিড়িন দরকার পড়লেই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কারারক্ষীর হাতে একটা চিরকুট পাঠিয়ে দিতেন জেলারের কাছে আর জেলার পাঠিয়ে দিতেন পেথিড়িন সরাসরি। নিজের ইঞ্জেকশান বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সম্ভবত নিজেই নিতেন। কারারক্ষীরা অবশ্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকে কখনো ইঞ্জেকশান নিতে দেখেননি। যাই হোক, জেল কর্তৃপক্ষ এবং জেলকর্মীদের মমতা এবং মানবিকতার সূক্ষ্ম ছিদ্র বেয়ে যে সুযোগ সুবিধাটুকু বিশ্বনাথ চক্রবর্তীরা পেয়েছিলেন তার পুরোটাই তাঁরা কাজে লাগিয়েছেন।

পুলিশ রাজ্যে ভিতর এবং বাইরে প্রবল খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে। আর এটা করতে গিয়ে তাদের সূক্ষ্ম ছাঁকনিতে উঠে আসছে নকশালপন্থী বহু রাজনৈতিক কর্মী। অবশ্য পলাতক আসামীদের খুঁজতে গিয়েই পুলিশ একটা বড় দাঁও মেরেছে কমিউনিস্ট অরগানাইজিং ব্যুরোর অমর ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করে। দমদম সেন্ট্রাল জেলের ঘটনার পর সারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এখন পর্যন্ত ১০ জনেরও বেশি নকশালপন্থীকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে পলাতক কোন বন্দীর আজও নাগাল পায়নি পুলিশ।



পরিকল্পনার গোটা ছক থেকেই বোঝা যায় যে, দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতি চলেছে ভিতরে এবং বাইরে। একটা বাড়তি সুবিধে অবশ্য এদের ছিলই কারণ দমদম সেন্ট্রাল জেলের নকশালবন্দীরা তাদের সংগে পেয়েছেন ১৯৮৫ সালে কোচবিহার জেল ভাঙার অভিজ্ঞতা আছে এমন একজনকে। যখন দেখি দুজন অসুস্থ বন্দীদের বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে সাত নং ওয়ার্ডের সামনে থেকে কাটা পেয়ারা গাছের ডাল আর কম্বল দিয়ে তৈরি স্ট্রেচার করে তখন বোঝা যায় যে, এই যাবতীয় সাংগঠনিক কুশলতার মধ্যে কোথাও রাজনৈতিক বিশ্বাস নিশ্চয়ই আছে। যে আটজন বন্দী জেল ভেঙেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই যুক্ত সি. পি. আই. (এম-এল)-এর দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির সংগে। নকশালপন্থী এই গ্রুপটিই এখন পর্যন্ত শ্রেণী শত্রু খতম এবং জেল ভাঙার নকশালপন্থী সাবেকি লাইনে পূর্ণ আস্থা রেখে চলেছে। এবং ১৯৮৫ সালের মে মাসে এই গ্রুপের নেতৃত্বাধীন ৬ জন সদস্য কোচবিহার জেল ভেঙে পালায়। দমদমের সাম্প্রতিক ঘটনার আগে সেটাই ছিল শেষ জেল ভাঙার ঘটনা। পরে তাদের প্রায় সবই ধরা পড়ে। কিন্তু এবার এক পক্ষকাল কেটে যাবার পরেও পুলিশ একজনকেও ধরতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এই বিপুল নেটওয়ার্কের কোন ছ্যাঁদা দিয়ে তারা গলে যেতে পারল! দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির এক সক্রিয় কর্মীর কাছে এ প্রশ্ন নিয়ে আমরা যোগাযোগ করি। তাঁর বক্তব্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাঁরা কৃষকদের সংগঠিত করছেন এবং শ্রেণী শত্রু খতমের মধ্য দিয়ে ওঁরা চেষ্টা করে চলেছেন শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করার। তাঁর মতে দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির কাজকর্ম সাধারণ মানুষের মধ্যে

জেল ভাঙার ঘটনার আগেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন অমর ভট্টাচার্য

দমদম সেন্ট্রাল জেল ভাঙার রোমহর্ষক বিবরণ প্রকাশিত হবার পর পুলিশ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ছিল অনেকটাই। যেমন এ ঘটনার সংগে যুক্ত থাকার অভিযোগে অন্তত কিছু মানুষকে গ্রেপ্তার করা। পরের কাজটি ছিল সেই গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশ করে সাফল্যের ছবিটা স্পষ্ট করা। প্রত্যেকটি কাজেই তাদের আন্তরিক প্রয়াস ছিল। কিন্ত মুশকিল হয়ে গেছে প্রথমেই। ৬ নভেম্বরের সংবাদপত্রে বড় করে খবর প্রকাশিত হল যে 'নকশাল নেতা অমর ভট্টাচার্য ধৃত'। ব্যাপারটা পুলিশ কর্তৃপক্ষ এমনভাবে জানিয়েছিলেন যাতে এটাই মনে হয় যে জেল ভাঙার ঘটনার সংগে জড়িত থাকার দায়েই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। কিন্তু আসল তথ্যটি অন্যরকম। নকশালপন্থীদের একটি গোষ্ঠী সি ও বি-র প্রতিষ্ঠাতা বলে কথিত অমর ভট্টাচার্যকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ২৭ অক্টোবর। প্রথমে তাঁকে রাখা হয় আলিপুর রিটিট হোমে। সেখান থেকে ১ নভেম্বর তাকে আদালতে হাজির করা হয়। দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে নকশাল বন্দীদের পালানোর ঘটনাটি ঘটেছে ৪ নভেম্বর গভীর রাতে।

পুলিশ নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে এই বলে খবরটা ছড়ালেন যেন এই ঘটনার সংগে যুক্ত থাকার অপরাধেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অমরবাবুকে যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেটা তাঁর পরিবারের লোকে প্রথমে জানেন ৬ নভেম্বরের কাগজ পড়ে। তারপরই ওই অঞ্চলে আবার পুলিশ বাহিনীর যাতায়াত বাড়তে থাকে। ১২ নভেম্বর একটি সংবাদপত্রে অমরবাবুর স্ত্রী ডরথি ভট্টাচার্যের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। তিনি অভিযোগ করেন, বিভিন্ন মহলে ছোটাছুটি করেও তাঁর স্বামীর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি আশংকা প্রকাশ করেন যে, গোপনে তাঁকে লুকিয়ে রেখে অকথ্য অত্যাচার করা হচ্ছে।

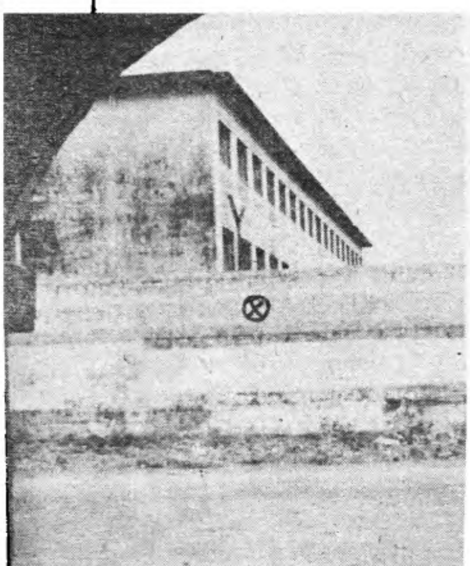
খবর পাওয়া গেছে অমরবাবু এখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে অন্তরীণ। তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের লোকেরা প্রত্যেকদিনই জেলে গিয়ে ফিরে আসছেন। কারণ, অমরবাবুর সংগে তাঁদের দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না।

যত অভিযোগই থাকুক, অমরবাবুর সংগে পরিবারের লোকজনকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না কেন, এর কোন সদুত্তর নেই।

৩৬ বছর বয়স্ক পানিহাটির ইলিয়াস রোডের বাসিন্দা অমরবাবুর বিরুদ্ধে জেল পালানোর সংগে জড়িত থাকার কোন অভিযোগের প্রমাণ থাকতে পারে না। কারণ, তিনি ঘটনার অনেক আগেই গ্রেপ্তার হয়েছেন। অমরবাবু ছিলেন স্থানীয় 'দিশারি' ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা। তাঁর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে স্থানীয় মানুষেরা প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। স্থানীয় ১৪৬ জন বিশিষ্ট নাগরিক স্বাক্ষর করে একটি খোলা আবেদনপত্র ছেড়েছেন অমরবাবুর মুক্তির দাবিতে।

দুর্বার গংগোপাধ্যায়

এতটাই ব্যাপৃত যে আটজন 'কমরেড'কে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে তাদের কোন অসুবিধাই হবে না। ১৯৭০-৭১ সালের ধরনে গোপন সংগঠনে বিশ্বাসী এই গ্রুপের সদস্যটি আমাদের আরও জানিয়েছেন যে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে জাতিগত প্রশ্নে যাঁরা লড়ছেন তাঁদের সংগে দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির যোগাযোগ খুবই নিবিড়। বিশেষত নাগাল্যান্ড সোসালিস্ট কাউন্সিলের সংগে নানা ইসুতে ওঁরা 'কাজকর্ম' করছেন। ওঁরা জাতিগত দ্বন্দ্বকে শ্রেণীসংগ্রামে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে চলেছেন। দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির

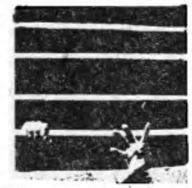

ফটো : সৌগত রায় বর্মন

চিহ্নিত অংশ দিয়েই বন্দীরা পালায়

ওই সদস্য স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে পলাতক আটজনকে তাঁরা দরকার হলে উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেবেন নিরাপদে। বাংলাদেশের নিষিদ্ধ মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী পার্টির সংগে দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির যোগাযোগের কথাও তিনি স্বীকার করেন। তবে বাংলাদেশের গ্রুপটির পরিচয় দিতে তিনি অস্বীকার করেন। দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির যে গ্রুপটির কথা এতক্ষণ বলা হল সেটি সুবীর তালুকদারের নেতৃত্বাধীন। কৃষ্ণনগরের রমেন সাহাও তালুকদার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অন্য একটি গোষ্ঠীর নেতৃত্বে আছেন অর্জুন মুখার্জী। ১৯৭৮ সালে গঠিত এই গ্রুপটি তখন ছিল আজিজুল হক এবং নিশীথ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন কিন্তু ১৯৮৪ সালে এই দুই নেতাকেই পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয় – তখন তারা জেলে। পরে, ১৯৮৬ সালে দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বিধাবিভক্ত হয়। দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি ভাগ হয় গণ-লাইনের প্রশ্নে। কমিউনিস্ট অর্গানাইজিং ব্যুরো না, আর একটি গোষ্ঠী নকশালপন্থার সাবেকি লাইনটা মেনে চলে। এই গোষ্ঠীর নেতা অমর ভট্টাচার্য কিছুদিন আগে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। এছাড়া মহাদেব মুখার্জীর নেতৃত্বাধীন একটি গোষ্ঠী, পার্টি ইউনিটি, কানু সান্যালের নেতৃত্বাধীন ও. সি. সি. আর এবং সাধন সরকারের নেতৃত্বাধীন একটি গোষ্ঠী পশ্চিমবংগের বিভিন্ন এলাকায় তাদের ক্ষমতা এবং প্রভাব অনুযায়ী সক্রিয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সক্রিয় গোষ্ঠী হল ইন্ডিয়ান পিপলস ফ্রন্ট। এঁরা মূলত প্রকাশ্য গণ আন্দোলনের পথেই আস্থা রাখেন। সম্প্রতি জেল ভাঙার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আই পি এফ কারামন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে অভিযোগ করেছে যে আজও বিনাবিচারে বহু রাজনৈতিক কর্মীকে জেলে আটকে রাখা হয়েছে। তাঁরা সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি এবং জেল ও পুলিশ লকাপে অত্যাচারের প্রতিবাদ জানান ওই চিঠিতে। ৭০-এর দশকের শুরু থেকে মানবাধিকার সংগঠনগুলো এই ধরনের অভিযোগ এবং প্রতিবাদ জানিয়ে চলেছে। বিনা বিচারে আটক কিন্তু থেকেই যাচ্ছে জেলে।



ফলে আজও জেল ভাঙার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে। গত বিশ বছরে পশ্চিমবংগে প্রায় দশবার জেল ভাঙার ঘটনা ঘটেছে। ১৯৭১ সালেই নকশালপন্থীরা মোট তিনবার জেল ভেঙেছে। ওই বছর ৩০ জানুয়ারি কার্শিয়াং জেল ভেঙে তিন জন নকশালপন্থী বেরিয়ে যায়। ২১ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি সেন্ট্রাল জেল ভেঙে পালাতে সক্ষম হয় ১১ জন নকশালবন্দী। সম্ভবত ওই একই বছর বহরমপুর স্পেশাল জেল এবং কৃষ্ণনগর জেল ভেঙে নকশালবন্দীরা পালায়। কিন্তু ১৯৭১ সালের জেল ভাঙার সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটে দমদম সেন্ট্রাল জেলে। ১৪ মে ৫০ জন নকশালবন্দী প্রকাশ্য দিবালোকে জেল ভেঙে পালায়। পরে জেলের ভিতর কারারক্ষী এবং সশস্ত্র পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে এবং পিটিয়ে ৩২ জনকে হত্যা করে। ১৯৭৬ সালে জরুরি অবস্থা চলাকালীন আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেল থেকে ৫৬ জন নকশালপন্থী পালায়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বাঁকুড়া ও আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ভেঙে নকশাল পন্থীরা পালিয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টার ন্যাশনালের এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের জুন পর্যন্ত পশ্চিমবংগের বিভিন্ন জেলে ৬২ জন বন্দীকে গুলি করে এবং পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৭০ সালের ১৬ ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলে মারা যায় ১০ জন। ওই একই জেলে ১৯৭১,৬ ফেব্রুয়ারি ১ জনকে মারা হয়। বহরমপুর জেলে ১০ জনকে হত্যা করা হয় ৭১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি, দমদম সেন্ট্রাল জেলে ১৬ জনকে মারা হয় মে মাসে, আলিপুর স্পেশাল জেলে ২১ জুলাই ৬ জনের মৃত্যু হয়। আলিপুরেই আরও ৬ জনের মৃত্যু হয় ২৬ নভেম্বর, আসানসোল স্পেশাল জেলে ৫ আগস্ট ৯ জন খুন হয়। ১৯৭২ সালে ৭ ফেব্রুয়ারি হুগলি জেলে ১ জন এবং ২৮ মে বর্ধমান জেলে ২ জনকে হত্যা করা হয়।



নকশাল দমনের এই প্রক্রিয়া থেমে যায়নি কোন ভাবেই। ১৯৮৫ সালের মে মাসে পুরীর সমুদ্র বেলায় পশ্চিমবংগ, অন্ধ্র, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের পুলিশের বড় কর্তারা নকশাল দমন করার একটি সাধারণ কৌশল খুঁজে বের করার জন্য আলোচনায় বসেন। সেই আলোচনার ফলাফলেই রাজ্যে রাজ্যে গঠিত হয়েছিল অ্যান্টি-নকশাল সেল এবং পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয় আইন। এ নিয়ে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রতিবাদে কোন ফল হয়নি এবং বিনা বিচারে জেলের ভিতর আটকে রাখার পুলিশি প্রবণতারও কোন ইতর বিশেষ ঘটেনি আজও। পুলিশ কোন নকশালপন্থীকে গ্রেপ্তার করার পরেই তার ঘাড়ে অনায়াসে চাপিয়ে দিতে পারে একাধিক মামলা। একা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ২৩টা মামলার আসামী। বিষ্টু সর্দারের আছে ১৯টা মামলা। পশ্চিমবংগের বিভিন্ন থানার এই মামলাগুলোর জামিনের ব্যবস্থা করতে পারলেও কারো পক্ষে প্রায় জেলের বাইরে বেরনো সম্ভব নয় যদি না সরকার বিনাশর্তে মামলাগুলো খারিজ করে দেবার কোন ব্যবস্থা করে। যেমনটি ঘটেছিল ১৯৭৭ সালে। বন্দীর পক্ষে আইন আছে। আমাদের সংবিধানে বন্দীর আত্মরক্ষা করার মতো আইন বিশেষ অপ্রতুল নয়। তবে কেন বন্দীরা বিচারাধীন অবস্থায় জেলের মধ্যেই থেকে যেতে বাধ্য হয় আইনে আছে বন্দীকে ৮৯ দিনের মধ্যে চার্জশিট দিতে হবে অর্থাৎ তাকে জানাতে হবে বন্দী ঠিক কোন কোন দোষে দোষী। চার্জশিট না দিতে পারলে বন্দীকে আদালত জামিন দিতে বাধ্য। কিন্তু মামলা একটা নয়, বহু। ফলে ৮৯ দিনের অনেক অনেক গুনিতকে তার জেলের মেয়াদ বাড়তে থাকে। তাছাড়া জামিন নেওয়া আইনত যত সহজ, কার্যত তত সহজ নয়। নকশালপন্থীদের বেশিরভাগই গ্রামের ভূমিহীন চাষী কিংবা শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের, তাদের পক্ষে জামিনের অর্থ-মূল্য সংগ্রহ করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। একটা জামিন নিতে খরচ হয় গড়ে ১০০০ থেকে ১২০০ টাকা। আলিপুর কোর্টে মোট যা জামিন মূল্য তার একটা বড় অংশ জমা দিতে হয় তাছাড়া পেশাদার জামিনদার আছে তাদের

জন্যও বেশ কিছু টাকা খরচ হয়ে যায়। অন্যদিকে যে সব কোর্টে মোট জামিন মূল্যের কম শতাংশ জমা দিতে হয় সেখানে জামিন মূল্য সাংঘাতিক চড়া। তাছাড়া জামিনের শর্তগুলো এতই জটিল এবং কড়া যে সবার পক্ষে কোর্ট আরোপিত শর্তে জামিনদার পাওয়াই অসম্ভব হয়ে পড়ে। জামিনদারকে অনেক সময় তার জমির দলিল কোর্টে জমা রাখতে হয়। কোর্ট কখনো আবার জামিনদারের চাকরির কাগজপত্র চেয়ে বসে। এত সব ঝক্কি সামলে যদি কোন উদ্যোগী জামিনের ব্যবস্থা করতে পারে তার পরে থাকে পুলিশের শর্ত। যা পূরণ করা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। রথীন চক্রবর্তী নামে দমদমের একটি ছেলে রায়গঞ্জ থানায় ধরা পড়ে ১৯৮১ সালে জামিন পায় কিন্তু তাকে শর্ত দেওয়া হয় যে সে রায়গঞ্জ শহরের বাইরে যেতে পারবে না। অথচ জেল থেকে বেরিয়ে তাকে দমদমেই ফিরে আসতে হবে তার বাড়িতে। তার এমন আর্থিক সংগতি নেই যে সে রায়গঞ্জে বাস করে।



জেলে ওয়েলফেয়ার অফিসার বলে একটা পদ আছে জেল কর্তৃপক্ষের সংগে তার কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয়। তিনি একজন তৃতীয় ব্যক্তি যাঁর মাধ্যমে বন্দীরা আইনি সাহায্য নেবে। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীরা তাঁর সাহায্য পায় না কারণ জামিনের চেষ্টা করলে ওয়েল ফেয়ার অফিসার সে খবর পুলিশকে জানিয়ে দিতে দ্বিধা করে না আর লিগ্যাল এড কমিটির কথা নাই বা বললাম তাঁদের যেহেতু একটা বিশেষ রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হয় তাই বেশিরভাগ সময়েই নকশাল বন্দীরা সেখান থেকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পায় না। তাছাড়া উকিল-মোক্তারের কাছে পৌঁছন এবং ছোটা ছুটি করার মতো লোকের অভাবও তাদের ক্ষেত্রে একটা বড় অন্তরায়। ফলে বিচারাধীন নকশাল বন্দীরা অনেক সময়েই জামিন নেবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে – গ্রাস করে এক গভীর হতাশা। কারাগারের স্থূল বেষ্টনী ক্রমেই তার চারপাশ ঘিরে ছোট হতে থাকে।

এবারের পলাতক আসামী বিষ্টু সর্দারের নামে ত্রিবেণী, বসিরহাট, ভাঙড় হাসনাবাদ, হাড়োয়া, বারাসত, হাবড়া আর যাদবপুর থানায় মামলা চলছিল। ১৯৮২-তে বিষ্টু সর্দার জেলে যায়। বাইরের সহযোগীদের সাহায্য নিয়ে আট মামলারই জামিনের ব্যবস্থা প্রায় করে এনেছিল, এমন সময় তার ঘাড়ে চেপে গেল হাওড়া চক্রান্ত মামলা, বালুরঘাট চক্রান্ত মামলা, পূর্বস্থলী আর ব্যারাকপুর থানার মামলা। স্বাভাবিকভাবেই এরপর তার আর মামলা চালানর উৎসাহ থাকেনি। উগ্রপন্থী রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং তথাকথিত রাষ্ট্রদ্রোহিতার পরেও যদি কারো মামলা চালানর সদিচ্ছা দেখা দেয়, তবে প্রশাসনের যে প্রতিক্রিয়া হয় তার থেকে যে হতাশা জন্ম নেয়, যে অনিশ্চয়তা দানা বাঁধে, যে অন্ধকার তার দৃষ্টিকে অংকুরিত করে, সেখানে কি ওই পলাতকদের গড়ে ওঠার কোন সূত্র লুকিয়ে থাকে? ওরা মাত্র আট জন পালিয়েছে, আরও প্রায় ৪৬ জন নকশালপন্থী, দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, কারাগারের ভেতরে রয়ে গেছে। যদি ধরে নিই যারা পলাতক তাদের বাইরের জীবনও রাজনৈতিক হতাশা, অসহায়তা আর ফেরারী জীবনের অনিশ্চয়তায় কাটাতে হবে, তবু একটার পর একটা মামলা নিয়ে, সাজান চক্রান্তের অপরাধ ঘাড়ে নিয়ে, আদালতের জটিলতায় পর্যুদস্ত হয়ে, প্রশাসনের অবহেলায় পিষ্ট হয়ে তার চারপাশ ঘিরে কারাগারের ১৮ ফুট প্রাচীরের বেষ্টনী ক্রমেই ছোট হয়ে আসার ভয়াবহ ভবিষ্যৎ হাতের চেটোয় নিয়ে আর কোন মুক্তিসূত্র তার সামনে থাকতে পারে? □

প্রশাসন ও পুলিশ : অভিযোগের চাপান উতোর

দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে আটজন নকশাল বন্দী দুঃসাহসিকভাবে পালিয়ে যাবার পরে আচমকা কাঁচা ঘুম ভেঙেছে জেল বিভাগ আর পুলিশের। বিস্তর ছোটাছুটি, ফাইল চালাচালি, সাসপেনশন, ট্রান্সফার ইত্যাদি হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে তর্জন গর্জন। ফলে প্রায় সব অফিসারদের মুখে কুলুপ – যদি বেফাঁস কিছু বেরিয়ে পড়ে?

জেলে নানা রকমের দুর্নীতির অভিযোগ তো আছেই। তার সংগে রয়েছে অজস্র অব্যবস্থা। জেলের এক শ্রেণীর কর্মীদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ বিস্তর। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আর এস পি-র দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় কারা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে কাজ করার সময়ে এ বিষয়ে প্রথম দিকে কঠোর ভূমিকা নেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর উদ্যোগ জেলের হালচাল খুব বদলাতে পারেনি। তৃতীয়বার বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে কারা বিভাগের ভার দেবব্রতবাবুর কাছ থেকে চলে গেছে তাঁরই দলের বিশ্বনাথ চৌধুরীর হাতে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রের বক্তব্য হল, মূলত রাজনৈতিক কারণ এবং ব্যাপক দুর্নীতির হাল রাজ্যের কারা প্রশাসনের সমস্যাকে জটিল করে তুলেছে। জেল কর্মীদের প্রধান দুটি ইউনিয়নের একটি সি পি এম এর। অপরটি আর এস পি-র। এঁদের খেয়োখেয়িতে মহাকরণের ওপর মহলও জড়িয়ে গেছে। কাজেই প্রশাসনিক কোনও ব্যবস্থা নিতে গিয়ে অফিসাররা নানা সময়ে রাজনৈতিক কারণে বাধা পান। ফলে সমস্যা বা অভিযোগের প্রতিকার আর হয়ে ওঠে না। দুর্নীতি বা অব্যবস্থা সম্পর্কে কোনও কড়া ভূমিকা নেওয়াও একই কারণে শক্ত হয়ে ওঠে। কিছুদিন আগে কারা বিভাগের আই জি হিসেবে তরুণ অফিসার সুমন্ত চৌধুরী কঠোর মনোভাব নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের কাছে তিনি কাজ করতে গিয়ে বাধা পাবার কথা বার বার বলতেন। আচমকাই তিনি দিল্লিতে অন্য পদে বদলি হয়ে যাবার সময়ে বলেই ফেলেছিলেন – বাঁচা গেল।

কারা বিভাগ স্বরাষ্ট্র বিভাগের অধীন। স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্বে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। অনেকেরই প্রশ্ন গোটা অব্যবস্থার কথা কি তাঁকে পুরোপুরি জানানো হয়েছে?

দমদম সেন্ট্রাল জেলের সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের গোয়েন্দা শাখার কাজকর্ম নিয়েও অভিযোগ আছে। মূল অভিযোগ স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ আর ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের বিরুদ্ধেই। তাঁরা নকশালদের চিন্তাভাবনা আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার আগাম খবর নাকি দিতে পারেননি। পুলিশ কর্তৃপক্ষের সেই বাঁধাধরা গৎ – নো কমেন্ট। লর্ড সিনহা রোডের এই দুটি বিভাগের তদন্তের মান ইদানিংকালে আদৌ ভালো নয়। এর কারণ হিসেবে একটি মহলের বক্তব্য – বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গোয়েন্দাগিরি প্রায় বন্ধ। সোর্স শুকিয়ে গেছে। কর্মীদের ওপরে অন্য কাজের চাপও আছে। কাজেই অসুবিধা হতেই পারে। এই অবস্থায় আরও বড় বিপদ ঘটাও কিছু মাত্র বিচিত্র নয়।

শ্যামল সান্যাল

এরশাদ হঠাও আন্দোলনে বাংলাদেশ উত্তাল

বাংলাদেশ আবার অগ্নিগর্ভ। সামরিক নায়ক হুসেন মোহাম্মদ এরশাদকে ক্ষমতার শীর্ষকেন্দ্র থেকে হঠাবার জন্য হাসিনা ও খালিদা জিয়ার যুগ্ম নেতৃত্বে শুরু হয়েছে ব্যাপক গণ আন্দোলন। চলছে লাঠি-গুলি-গ্যাস। অগ্নিসংযোগ, বোমা বর্ষণ। চলছে ব্যাপক ধরপাকড়, হত্যা, লুণ্ঠন। জনতার রুদ্ররোষে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে প্রেসিডেন্ট এরশাদের শ্বশুরালয়। ভস্মীভূত একাধিক মন্ত্রীর আবাসগৃহ, পৈতৃক ভিটে। এরশাদ বিচলিত, আতঙ্কিত। এ আন্দোলনের শেষ কোথায় তা এখনি বলা মুশকিল। তবে সময়ই বলে দেবে বাংলাদেশে কী ঘটতে চলেছে।

বাংলাদেশ আবার সংবাদপত্রে শিরোনাম। বাংলাদেশ আবার উত্তাল। 'গণ' নামক সমুদ্রের বিশাল ফণা আছড়ে পড়েছে বাংলাদেশের চুয়ান্ন হাজার বর্গমাইলের প্রতিটি প্রান্তে। আবার জেগে উঠেছে, ফুঁসে উঠেছে দামাল বাংলার লক্ষ লক্ষ গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ মানুষ। তাদের কণ্ঠে একই আওয়াজ – এরশাদের পদত্যাগ চাই। চাই জনগণের শাসন। সামরিকতন্ত্রের অবসান।

প্রেসিডেন্ট হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে বাংলাদেশের দুই বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামি লিগ ও বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি সংক্ষেপে বি এন পি। আওয়ামি লিগের সংগে রয়েছে আরো সাতটি বিরোধী দল। নাম হয়েছে আট দলীয় জোট। বি এন পি-র জোটের নাম সাত দলীয়। এ ছাড়া কম্যুনিস্টদের পাঁচ দলীয় জোট এবং জামাতে ইসলামিকে নিয়ে মোট ২১ দলের জোট এবার জংগী আন্দোলনে হাতে হাত মিলিয়েছে সমর নায়ক এরশাদকে গদীচ্যুত করার জন্য। এই জোটের যুগ্ম নেত্রী হলেন আওয়ামি লিগের সভানেত্রী ও মুজিব-কন্যা শেখ হাসিনা ওয়াজেদ এবং বি এন পি-র সভা নেত্রী ও জিয়া পত্নী বেগম খালিদা জিয়া।

বাংলাদেশের জনপ্রিয় এই দুই নেত্রী হাসিনা ও খালিদা হাতে হাত মেলানোয় এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের পালে জোর হাওয়া লেগেছে। গণ সংগঠন বলতে যা বোঝায়, তার প্রতিটি উপাদান উপকরণ রয়েছে আওয়ামি লিগ ও বি এন পি দলে। বাংলাদেশে এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে আওয়ামি লিগের সংগঠন নেই। এত বিশাল সাংগঠনিক শক্তি আছে বলেই আওয়ামি লিগের ডাক যে কোন জঙ্গি কর্মসূচী শাসকশ্রেণীকে ভাবিয়ে তোলে সময়ে অসময়ে।

আন্দোলন কেন

প্রেসিডেন্ট হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ দেশকে গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত করবেন – এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে জনতার অভিযোগ, তিনি গণতন্ত্র হত্যাকারী। এরশাদ ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তারকে গদীচ্যুত করে ঢাকার ক্ষমতা দখল করেন।









সাত্তার সাহেবের বিরুদ্ধে জেনারেল এরশাদ 'রক্তপাতহীন' সামরিক অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়ে জনমনে রোষের বীজ রোপন করেন। সাত্তার সাহেব ছিলেন বি এন পি দল ও সরকারের প্রধান। নির্বাচিত বি এন পি সরকারকে বন্দুক দেখিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করে এরশাদ সেদিন প্রথম ক্ষেপিয়ে তোলেন বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির কর্মী ও সমর্থকদের।

ক্ষমতা দখল করে এরশাদ অতীতের অন্যান্য অভ্যুত্থান নায়কের মত দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। দেরি করে হলেও তিনি বাংলাদেশে সংসদীয় নির্বাচন করেছেন, প্রেসিডেন্ট ভোট করিয়েছেন। সংবিধান অনুসারে দেশ ও সরকার পরিচালনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইউনিয়ন বোর্ড, পুরসভা ও জেলা পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রশাসনিক সুবিধার জন্য জেলাগুলি ভেঙে উপজেলা সৃষ্টি করেছেন। স্থায়ীভাবে জনগণের সেবা করবেন বলে জাতীয় পার্টি নামে একটি দল গড়েছেন। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন রাজনীতিক ও দলছুটদের নিয়ে তিনি তাঁর রাজনৈতিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। এত সব করেও প্রেসিডেন্ট এরশাদ জনগণের মন জয় করতে পারেননি। হতে পারেননি জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট কিংবা জনদরদী জননেতা। এরশাদ কবিতা লেখেন। কবিতা পড়তে ভালওবাসেন। জনগণের উদ্দেশ্যে গণ্ড গণ্ডা কবিতা লিখে কিংবা রাষ্ট্রপতিভবনে কবিতা পাঠের আসর বসিয়েও তিনি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে নিজের কোন ভাবমূর্তি ছড়িয়ে দিতে পারেননি।

জনপ্রিয় হবার জন্য তাঁর পূর্বসূরী জেনারেল জিয়াউর রহমান যে পদ্ধতিতে এগিয়েছিলেন, এরশাদ অনেকটা সেভাবেই জয়ী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা হল না। বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বি এন পি-কে চটাতে গিয়ে আওয়ামি লিগকে তিনি সংগে পাননি। ঢাকার ক্ষমতা দখলের পর এরশাদ বি এন পি-র নেতা ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযোগ ও অভিযান শুরু করেছিলেন। ক্ষমতাচ্যুত মন্ত্রী ও নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তাঁদের ঠিকানা নির্দিষ্ট করেছিলেন ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার। এরশাদের ওই বি এন পি বিরোধী অভিযানে স্বভাবতই আওয়ামি লিগ খুশি হয়েছিল।

মুজিব-বিরোধী ও মুজিব খুনীদের নিয়েই বি এন পি দল গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশে মুজিবের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করা এবং জাতির জনকের মর্যাদাপূর্ণ পদ থেকে মুজিবকে মুছে ফেলার কৌশলি-কর্মে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বি এন পি-র প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। আওয়ামি লিগের সাংগঠনিক ভিত ভেঙে চুরমার করে দিতে জিয়া দেখিয়েছিলেন অতিশয় নির্মমতা। জিয়ার শাসনকালে আওয়ামি লিগের নেতা ও কর্মীদের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সইতে হয়েছে। তাই আওয়ামি লিগ কোনদিন বি এন পি-কে ক্ষমা করতে পারবে না।

এরশাদ চেয়েছিলেন প্রথমে বি এন পি-কে আঘাত করে ভেঙে দিতে। সে কাজে সফল হলে তিনি নির্মম হতেন আওয়ামি লিগের বিরুদ্ধে। শাহ আজিজকে দিয়ে তিনি বি এন পি-তে ভাঙন ধরিয়েছিলেন। কিন্তু বেগম খালিদা জিয়া ও ওবায়দুর রহমানের অক্লান্ত প্রয়াসে দলের কর্মী বাহিনীতে বিরাট কোন ভাঙন ধরেনি।

আওয়ামি লিগ ও বি এন পি পরস্পরের শত্রু। তাদের এই শত্রুতা নীতির, আদর্শের। আওয়ামি লিগ মনে করে শেখ মুজিবুর রহমানের খুনের ষড়যন্ত্রের নেপথ্যচারীদের অনেকেই পরবর্তীতে বি এন পি র কর্মকর্তা হয়েছেন, মন্ত্রী হয়েছেন। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট জিয়া মুজিব খুনী ডালিম ফারুকদের বিচার না করে তাঁদেরকে বিদেশে কূটনীতিকের চাকরি দিয়েছেন। জিয়ার এই পৃষ্ঠপোষকতাকে আওয়ামি লিগ চিরদিন ধিক্কৃত করবে এটাই স্বাভাবিক।

অন্যদিকে বি এন পি র রাজনীতির মূল বক্তব্য হল জিয়ার শাসনকালের গুণকীর্তন, মুজিবের অপশাসন থেকে দেশবাসীকে মুক্তির স্বাদ এনে দেওয়া ইত্যাদি। রাজনীতির বক্তব্যে দুটি দল দু'মেরুতে অবস্থান করায় আখেরে লাভবান হয়েছেন এরশাদ।

আওয়ামি লিগ ও বি এন পি সহ ঢাকার রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের সকলেরই মত হল এরশাদকে সরিয়ে বাংলাদেশে প্রকৃত

একনজরে ৭৫ থেকে ৮৬

দুঃশাসনের খাওয়ান

বাংলার জনজীবন দুঃসহ-দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে লুণ্ঠন, জুলুম আর অত্যাচারে।



	১৯৭৫	১৯৮৬
(১) চাউল	৩.৭৫	১০.৫০ টাকা ও উর্দ্ধে
(২) ডাল	২.00	২২.00
(৩) চিনি	৫.৫0	২৪.00
(৪) গোস্ত গরু	৮.00	৫0.00
খাসী	১০.00	৭0.00
(৫) মরিচ	১২.৫0	৩৮.00
(৬) পেঁয়াজ	১.00	৮.00
(৭) ইলিশ মাছ	৫.00 – ১০.00	২৫.00–৫0.00
(৮) তৈল	৭.৭৫	৪0.00
(৯) সাবান	৬.00	২৫.00
(১০) মুরগী	৭.00	৪৫.00

[illegible] দ্রব্যের দামের তুলনায় দুইশত গুণ দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।
(১২) কাপড় চোপড়ের দাম প্রায় চারশত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
(১৩) বই-পুস্তক কাগজ-কলমের দাম বেড়েছে চার শত ভাগের ওপর।
(১৪) অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং শিক্ষা ব্যয় বেড়েছে হাজার ভাগের ওপর।

আর্থ সামাজিক [illegible]

(১) ১৯৭৫ এ ভূমিহীন নাগরিক ৩০ শতাংশ — ১৯৮৬ তে ৬৫ শতাংশ
(২) পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা এবং পাকিস্তান আমলে বকেয়া সমুদয় খাজনা বঙ্গবন্ধু মওকুফ করে দিয়েছিলেন। পঁচাত্তরের পর নতুন করে অনেকাংশে বর্ধিতভাবে খাজনা চালু করা হয় এবং মওকুফকৃত খাজনা পুনরায় আদায় করা হয়।
(৩) সারের মূল্য ৬০ টাকা হতে ৪০.00 টাকায় কমিয়ে আনা হয়েছিলো। বর্তমানে সারের মূল্য — ১৮৬.00 টাকা
(৪) বঙ্গ-বন্ধু ব্যাংক-বীমা বড় বড় কল কারখানা জাতীয়করণ করে ছিলেন। জাতীয়করণের ফলে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছিল দেশের জনগন। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই জিয়া-এরশাদ ষড়যন্ত্র করে শুধু [illegible] অবাঙ্গালীদের হাতে তুলে দিয়ে বাঙ্গালীর আর্থিক [illegible] গুড়ো গুড়ো করে দিয়েছে।
(৫) ব্ল্যাক মার্কেটিং, চোরাচালান, চুরি, লুণ্ঠনের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ।
(৬) মধ্যপ্রাচ্য ভারত, পাকিস্তানসহ অন্যান্য দেশে বাঙ্গালী যুবতীরা আজ বাজারের পণ্য — বাঙ্গালী মা-বোনের কান্নায় বিক্ষিপ্ত দেশের জেলখানা ভারাক্রান্ত।

দুরাচাররা কি করে বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের বদনাম করে

জনগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে হলে হাসিনা ও খালিদা জিয়াকে হাতে হাত মেলাতেই হবে। এই দুই নেত্রীকে একত্রিত করার জন্য দু'দলের নিচুতলার কর্মীরা যেমনি চাপ দিয়েছেন তেমনি প্রভাব খাটিয়েছেন ঢাকার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা।

১৯৮৬ সালের প্রথম দিকে হাসিনা ও খালিদা যুগ্মভাবে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। নির্বাচনের দাবিতে গোটা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। গণ আন্দোলনের চাপে এরশাদ সংসদীয় নির্বাচনে সম্মত হন। অবশেষে ৮৬'র ৭ মে বাংলাদেশে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে অংশ নেয়া না নেয়া নিয়ে হাসিনা ও খালিদার মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়। ভেঙে যায় ১৫ দলীয় বিরোধী জোট হাসিনা ৮ দলকে সংগে নিয়ে ভোটে যান। খালিদা ভোট বয়কট করেন ৩৩০টি আসনের মধ্যে বিরোধীরা পায় ১১৭টি। ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ওঠে হাসিনা ১০০টি কেন্দ্রে পুনরায় ভোটের দাবি জানান।

সংসদীয় নির্বাচনের সময় খালিদা জিয়া বলেছিলেন, এরশাদ ক্ষমতায় থাকলে দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া সম্ভব নয়। তাই তাঁর একটাই দাবি এরশাদকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হবে।

ওই বছর জুলাই মাসে নতুন করে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। আওয়ামি লিগ ও বি এন পি আলাদা আলাদা মঞ্চ থেকে এরশাদকে আক্রমণ শুরু করে। এরই মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ১৫ অক্টোবর ১৯৮৬ সালে।

এ বছর জুলাই মাসে বাংলাদেশ সংসদে জেলা পরিষদ বিল অনুমোদিত হয়। ওই বিলে পরিষদের কার্যক্রমে সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণকে বিধিবদ্ধ রূপ দেয়া হয় আওয়ামি লিগ সহ সংসদের সকল বিরোধী দল ওই বিলের তীব্র বিরোধিতা করে। তাদের বক্তব্য, জেলা পরিষদের মত নির্বাচিত বডিতে সেনা অফিসারদের উপস্থিতি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নীতি গ্রাহ্য হতে পারে না। অন্যদিকে এরশাদ চান দেশের শাসন ক্ষমতায় ও প্রশাসনে সেনাবাহিনীর ভূমিকাকে সাংবিধানিক চেহারা দিতে।

জেলা পরিষদ বিল নিয়ে বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলিও সোচ্চার হয়ে ওঠে। বেকায়দায় পড়ে যান প্রেসিডেন্ট এরশাদ। গণ অসন্তোষের ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরে তিনি সংসদ-অনুমোদিত বিলটি স্বাক্ষর না করে ফেরত পাঠিয়ে দেন সংসদের পুনর্বিবেচনার জন্য। জেলা পরিষদ বিলের বিরোধিতা করতে গিয়ে নতুন করে আবার জোটবদ্ধ হন হাসিনা ও খালিদা জিয়া। এবার গঠিত হয়েছে ২১ দলীয় বিরোধী জোট। দাবি একটি – এরশাদকে পদত্যাগ করতে হবে।

আন্দোলনের শেষ কোথায় ?

ঠিক ছিল এরশাদ-হটাও আন্দোলন শুরু হবে সেপ্টেম্বর থেকেই। কিন্ত ব্যাপক বন্যার কারণে আন্দোলন দুমাস পিছিয়ে যায়। বন্যার জল নেমে যাবার পর শুরু হয় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ। এই সময় এরশাদ বিরোধীজোটকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আন্দোলনের নামে ত্রাণের কাজে বাধা দিলে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। এরশাদের হুমকিকে অগ্রাহ্য করে হাসিনা ও খালিদা নভেম্বরের ১০ তারিখ থেকে ঢাকা অবরোধের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। নতুন করে হাসিনা-খালিদা জোটবদ্ধ হওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়েন প্রেসিডেন্ট এরশাদ। বিরোধীদের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী বানচাল করতে তিনি নভেম্বরের ৩ তারিখ থেকে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে দেন। জেলায় জেলায় নির্দেশ পাঠানো হয়, যে কোন উপায়ে আন্দোলন মোকাবিলা করতে। লাঠি ও কাঁদানে গ্যাসে কাজ না হলে গুলি চালাবার নির্দেশও দেয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যেই হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে বন্দী করা হয়েছে। গৃহে অন্তরীণ করা হয়েছে আওয়ামি লিগ নেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ও বি এন পি প্রধান বেগম খালিদা জিয়াকে। বি এন পি'র জংগী সাধারণ সম্পাদক খন্দোকার ওবায়দুর রহমানও বন্দী।

২১ দলের প্রথম সারির নেতারা অধিকাংশই বন্দী হয়েছেন। তা সত্ত্বেও আন্দোলন থেমে যায়নি। চলছে বন্ধ, বিক্ষোভ, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর। চলছে বিস্ফোরণ, বোমা, লাঠি, গুলি। ইতিমধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন জনা ত্রিশেক। আহতের সংখ্যা কয়েক শ।

আন্দোলন চলছে। জনতার রুদ্র রোষে প্রজ্বলিত হয়েছে এরশাদের শ্বশুরালয়। ভস্মীভূত হয়েছে একাধিক মন্ত্রীর আবাসস্থল, পৈতৃক ভিটা ও বিষয়সম্পত্তি। বিচলিত এরশাদ ফরমান জারি করেছেন – আগুন লাগানো বা সম্পত্তি ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হলে অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

'বাংলাদেশে যে কোন সময় জরুরি অবস্থা জারি হতে পারে – এমন আশংকা এখন সবার মুখে মুখে। আশংকা ছাড়াও ছড়িয়ে পড়েছে হরেক গুজব। কেউ ভাবছেন, অবস্থা বেগতিক দেখলে এরশাদ সেনাবাহিনীকে মাঠে নামাবেন। শুরু করে দেবেন ব্যাপক উৎপীড়ন। আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানের আশংকাও করছেন কেউ কেউ।

সবরকম পরিণতির কথাই ভেবে রেখেছেন বিরোধী নেতারা। বিরোধীদের আন্দোলন আজ যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে পিছিয়ে যাবার উপায় নেই।

এবারের আন্দোলন যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে ১৯৬৯-এর ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের তুলনা করা যায়। সেবার আওয়ামি লিগ বিশেষ করে তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পাকিস্তানের লৌহমানব প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সেই আন্দোলনে তৎকালীন মোনেম মন্ত্রিসভার সদস্য ও শাসক মুসলিম লিগ নেতাদের ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল। আন্দোলনের তীব্র দাবানল তেতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সব শ্রেণীর মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। লাঠি-বন্দুক ও উর্দিপরা জওয়ানের রক্ত চক্ষু উদ্দাম জনস্রোতকে সামলাতে পারেনি। অবশেষে এক হতাশা সন্ধ্যায় বিষাদ কণ্ঠে প্রেসিডেন্ট আয়ুব ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াবার কথা দেশবাসীকে জানিয়ে দেন।

বাংলাদেশে এরশাদ-বিরোধী যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তা কিভাবে শেষ হবে বা তার পরিণতিই বা কী তা এখনি বলা যাবে না। এই জিজ্ঞাসার উত্তর পেতে আমাদের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় ঢাকা থেকে সর্ব শেষ যে সংবাদ পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয় বিরোধীদের সংগে এরশাদের সমঝোতা-প্রয়াস সফল নাও হতে পারে। এরশাদ আগামী বছর গোড়ার দিকে নতুন করে সংসদীয় ভোটের ব্যবস্থা করবেন এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন। এছাড়া আওয়ামি লিগের দৈনিক বাংলার বাণীর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞাও তুলে নেওয়া হতে পারে। আন্দোলন চলা কালে আটক নেতা ও কর্মীদের ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও এরশাদ দিতে পারেন।

অস্পষ্ট অদৃশ্য হাত

সমস্যায় জর্জরিত বিকাশশীল দেশে যে কোন গণআন্দোলনের পেছনে বা নেপথ্যে অদৃশ্য বৃহৎ হাতের সনাক্তকরণ একটি স্বাভাবিক সহজাত প্রবণতা। বাংলাদেশের চলতি আন্দোলনের পেছনে কার বা কোন দেশের হাত রয়েছে, তা নিয়েও মতভেদ রয়েছে। বেগম খালিদা জিয়ার বি এন পি-র পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদত রয়েছে এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। অন্য দিকে এরশাদকেও ওয়াশিংটন মদত দিয়ে থাকে। এই সমীকরণ থেকে এবারের আন্দোলনে নেপথ্য অদৃশ্য হাত খুঁজে বের করা একটু জটিল বৈকি। সংবাদে প্রকাশ, বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি সহ তিনটি দল নিষিদ্ধ করার কথা ভাবছেন। বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি মূলত মস্কোপন্থী। এরশাদ প্রশাসনের ধারণা, বাংলাদেশে সবরকম ঝামেলার পেছনে রয়েছে কম্যুনিস্ট পার্টি।□

মিহির কর্মকার

সতী নিয়ে বেসাতি

রূপ কানোয়ারের সতী সংবাদে সারা ভারতের বুদ্ধিজীবী মহল বিচলিত। এই মধ্যযুগীয় কান্ডটিকে অনেকেই অগ্নিময় পাতিব্রত্য না বলে বলেছেন স্রেফ খুন। যাই হোক, বিংশ শতাব্দীর এই শেষ রাতে প্রাচীন অন্ধকার থেকে উঠে আসা বেহুলার ভেলাটি বেশ সমস্যায় ফেলেছে। সতীর সংজ্ঞা নিয়ে অনেক স্ববিরোধী ব্যাপার থেকে গেছে। দেখা যায় আজও ধর্মের চেয়ে ধর্মীয় আচারকেই বড় করা হয়।

শুধু পতিব্রতা স্ত্রীরাই সতী হওয়ার অধিকারী নয়, সেকালে অনেক রক্ষিতাদেরও সহমরণে যেতে দেখা গেছে। রামমোহন কি আইন করে সতীদাহ-রোধের বিরোধী ছিলেন? কী বলেছিলেন তিনি উইলিয়াম বেন্টিংককে? রাণী রাসমণির মত কী ছিল? শুধু হিন্দু নয়, মুসলমান রমণীরাও মৃত স্বামীর সঙ্গে সহসমাধিতে যেতেন। সতী নিয়ে গান্ধীজির মন্তব্য বেশ মূল্যবান। কিন্তু রূপের চিতাভস্ম কি ধর্মের কুটির ছেড়ে উঠে আসছে রাজনীতির প্রাসাদগুলির দিকে? সৌরেন মিত্রের কলমে বিধৃত ইতিহাস ও বর্তমান।



বয়স প্রায় ৯০। নাম স্বর্ণপ্রভা দেবী। উত্তর কলকাতায় একটি গলির মধ্যে আলো বাতাস বন্ধ ছোট ঘরে বয়সের ভারে গুটিয়ে বসেছিলেন। তাঁকে বৈধব্যের পোশাকটি অংগে ধারণ করতে হয়েছিল ১৭ বছর বয়সেই। সন্তানহীনা এই বৃদ্ধাকে বললাম রূপ কানোয়ারের কথা। যিনি ১৭ বছর বয়সে মৃত স্বামীর চিতায় উঠলেন গত ৪ সেপ্টেম্বর '৮৭-তে। স্বর্ণপ্রভা রূপ কানোয়ারের সব খবরই রাখেন দেখলাম। এঁর কাছে যাওয়ার অন্যতম কারণ হল এনার নিঃসংগ জীবনের একমাত্র

সংগী পড়াশোনা। এখন চোখে ভাল দেখতে না পেলেও পাশের বাড়ির এক শিক্ষিকা প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়ে শুনিয়ে যান। ৯ বছর বয়সে বিয়ে হলেও স্বর্ণপ্রভাদেবী স্বামীকে কাছে পেয়েছিলেন মাত্র বছর দুয়েক।

জিগ্যেস করলাম – আচ্ছা, দিদিমা আপনি তো সেকেলে মানুষ। রূপ কানোয়ারের এই করুণ মৃত্যুর খবর কাগজে পড়ে আপনার কী মনে হল?

ঘোলাটে চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। বললেন, 'এ তো স্রেফ খুন। এমন মেয়ে খুন তো প্রতিদিন অনেকভাবে হচ্ছে তবে এই খুনটার পেছনে ধর্ম আছে, এই যা। আইন যতই থাক ধর্ম এমনই জিনিস এসব ঘটনা দু-চারটে ঘটবেই। এ নিয়ে এত মাতামাতিই বা কেন। এই যে বিদ্যাসাগর যখন বিধবাদের বিয়ে দিতে শুরু করলেন তখন হিঁদুসমাজ কতভাবে তাঁকে বাধা দিয়েছিল। এখন তো বিধবা বিয়ে জলভাত হয়ে গেছে, তবুও কি সব বিধবারই স্বামী মলে বিয়ে ফিরে হচ্ছে? সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে অনেকেই বাঁচতে চায়। সে শিক্ষিতই হোক আর অশিক্ষিত হোক। কাগজে দেখলাম ঐ কানোয়ার পরিবার তো মুখ্যু ছিল না। এরকম ঘটনা এক-আধটা ঘটবেই।'

বৃদ্ধার কথা শুনে মনে হল উনি বলতে চাইলেন রূপ কানোয়ারের স্বামীর চিতায় অগ্নিস্নানের ঘটনাটি সমাজের মূল স্রোতের বাইরে। জিগ্যেস করলাম – তাহলে কি আপনি ঘটনাটায় বেশি গুরুত্ব দিতে চান না?

'চাই বৈকি। যতদিন এ ঘটনা ঘটবে ততদিন এর পিছনে লেগে থাকতে হবে। কারণ এর পিছনে মোটেই পতিপ্রেম নেই। বঙ্গদর্শনে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'সতীদাহ' নামে একটি প্রবন্ধ আছে। আমার এখনও মনে আছে। প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, হিন্দু মেয়ের ধর্ম পতিভক্তি, পতিপ্রেম নয়। হিন্দু সমাজ মেয়েদের শেখায় যে, স্বামী দেবতা, তাঁকে ভক্তি করতে হবে, তাঁর প্রসাদ খেতে হবে, তাঁর পাদোদক সেবন করতে হবে কিন্তু স্বামীকে ভালবাসতে হবে এ শিক্ষা হিন্দু সমাজ দেয়নি। হিন্দু সমাজ নারীকে ভক্তি শিক্ষা দিয়েছে। ভালবাসার শিক্ষা যেটা, সেটা দিয়েছে পাশ্চাত্য। অবশ্য এ প্রবন্ধের প্রতিবাদও হয়েছিল। তা আমি বলি কি বাবা, ধর্মকর্মে অন্ধ ভক্তি সাংঘাতিক জিনিস। মানুষকে মারাত্মক দিকে টেনে নিয়ে যায়। কুসংস্কারের জন্ম দেয়। বোধহয় এটাই রাজা রামমোহনের চোখে বেশি করে ধরা পড়েছিল। আসলে 'সতী' কথাটার সংজ্ঞাতেই তো ভুল আছে। একটা মেয়ে স্বামীর চিতায় পুড়ে মরে প্রমাণ করবে সে সতী! এ তো বড় আশ্চর্যের কথা। কেন, আমার মত আজীবন যারা বিধবা হয়ে জীবন কাটালো, অন্য কোন পুরুষের কাছে গেল না তারা সতী নয়? রামমোহন তো ব্রহ্মচর্যের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। সতী হতে হবে আত্মহত্যা করে? অথচ বেহুলা, সাবিত্রী এঁরা তো না মরেও সতী হয়েছিল। পাঁচ স্বামীর ঘর করেও দ্রৌপদী যদিও সীতা সাবিত্রীর মত সতী নাম পাননি তবু নিত্য স্মরণীয়া পঞ্চকন্যার একজন ছিলেন।'

বৃদ্ধার শেষের কথাগুলি বেশ সাংঘাতিক। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য যদি সমাজদর্পণ হয় তবে সেসব অনেক স্ববিরোধী ব্যাপারে ঠাসা। মনে হয় একটি পৌরাণিক কাহিনী থেকে 'সতী'-র উৎপত্তি। রাজা দক্ষের যজ্ঞশালায় দেবতাদের সামনে দক্ষ শিবনিন্দা করছিলেন। পতিনিন্দা শুনে দক্ষকন্যা দেহত্যাগ করেন। কারণ স্বামীর নিন্দা শোনাটাও পাপ। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় যে, বেঁচে থেকে মেয়েদের সতী হওয়া সম্ভব নয়। সেই ট্রাডিশন এখনও চলছে। কিন্তু বেহুলা সাবিত্রী তো বেঁচে থেকেও সতী হয়েছিলেন। এ আলোচনায় পরে আসছি।

সংস্কারের কেউটে

রূপ কানোয়ারের ঘটনা যদিও একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা তাহলেও কমপিউটর শাসিত এই বৃদ্ধ বিংশশতাব্দী তা ঘাড় থেকে নামাতে পারলো না। ভারতের নানা জায়গায় মৌলবাদীদের প্রশ্রয়ে এ ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটছে। চমকে উঠছে লোকসভা বিধানসভা এবং বুদ্ধিজীবীমহল। কিন্তু আইন করেও এই বিষবৃক্ষটির মূল শেকড়টা গত দেড়শো বছরেও ওপড়ানো যায়নি। এই তো ক বছর আগে ১৯৮৩-তে ঐ রাজস্থানেই সতী হয়েছিলেন এক রমণী। সেদিনও 'সতী দেবী কি জয় বলে' কাতারে কাতারে মানুষ ছুটে এসেছিল। পুলিশ বাধা দিতে এসেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা ক্ষিপ্ত জনতার কাছে তারা হার মানে। অথচ যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন একটু জঙ্গি হলে পুলিশ অবলীলাক্রমে তা থামিয়ে দেয় জ্বলন্ত সীসের গুলিতে। তাহলে কি ইদানীং ধর্মীয় কু-সংস্কারের পিছনে শাসকশ্রেণীর মধ্যে যে মৌলবাদীরা রয়েছেন তাঁদের প্রচ্ছন্ন মদত থাকছে?

১৯৮৫। এবার দেবীপুরা গ্রামের যশোবন্ত কানোয়ার। এই প্রৌঢ়া রমণী অবশ্য পুলিশের বাধাদানের ফলেই সতী হতে পারেননি। ১৯৮৭। কিছুদিন আগে জব্বলপুর থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরে 'মাজগাওয়ান' গ্রামের ৬০ বছরের দারিয়া বাঈ স্বামীর চিতায় উঠতে চেয়েছিলেন। বাধা এসেছিল তাঁর পুত্রের কাছ থেকে। দারিয়ার স্বামী দরবারী লাল মারা যান ৭৫ বছর বয়সে। স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় দারিয়া হঠাৎ ঝাঁপ দিতে যান। তাঁর বিরুদ্ধে আত্মহত্যার অভিযোগে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

হিন্দু সমাজ-কাঠামোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে কুটিল চোখে ছোবলের অপেক্ষায় আছে একটি বিষধর। তার নাম কু-সংস্কার। তাই কুসংস্কারের হাত ধরে আসে সতীদাহ বা মাঝে মধ্যে নরবলির ঘটনা। সম্ভবত যার উৎপত্তি ধর্মীয় অনুশাসন থেকে।

রাজস্থানের নারী জীবনের রূপরেখা একটু আলাদা। আগে তো রাজস্থানী নারীদের সংগে তুলনা চলতো বিপ্লবপূর্ব চীনের নারীদের সংগে। যদিও হিন্দু সমাজ সারা ভারতের নারীকেই দূর ইতিহাসের প্রত্যূষ থেকেই পণ্যদ্রব্য করে রেখেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রাজপুত রমণীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। টডের রাজস্থানের ইতিহাস পড়লে রাজপুত রমণীদের একটি শোচনীয় চিত্র পাওয়া যায়। সে যুগে রাজপুত সমাজে শিশুকন্যা হত্যার রেওয়াজ ছিল। শৈশবে আফিংফুলের বিষ বা যৌবনে আগুনের লেলিহান শিখায় আত্মসমর্পণ – এসব ছিল সাধারণ ঘটনা। ঐ গ্রন্থে এক রাজকুমারীর আত্মকথন আছে 'আমরা আজন্ম বলি প্রদত্ত, পৃথিবীতে আসতে না আসতেই আমাদের এখান থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আমার পিতা যে আমাকে এতদিন বাঁচতে দিয়েছেন তার জন্যে তাঁকে সহস্র ধন্যবাদ।'

শুধু রাজস্থানের ইতিহাসের পাতাতেই এসব ঘটনা বন্দী নেই। ট্রাডিশন আজও বহমান। সংস্কারের রথের রথীর অভাব নেই রক্ষণশীলদের কল্যাণে। সতের বছরের রূপ কানোয়ারের কোমল শরীর আগুনে পুড়িয়েও অপরাধবোধের বদলে কিছুদিন পরেই দেওবালা গ্রামে চুনরি উৎসব হল বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে। আর প্রায় হাজার কয়েক রাজপুত যুবক সতীস্থল পাহারা দিল তীক্ষ্ণ তরবারি উঁচিয়ে। শুধু কি তাই, রাজস্থান সরকারের অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে এবং সতীদাহর পক্ষে মিছিল বের হয়। রামলীলা ময়দানে ধর্মরক্ষা সমিতির সভায় যে কথাটা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল তা হল – সতী হওয়ার অধিকার নারীর জন্মগত অধিকার।

পতিব্রতা অগ্নিময়

মরুময় রাজস্থানের ক্যাকটাস বনে সতীদাহর পুণ্য অগ্নিঝড় ছাই করেছিল বহু রাজবধূকেও। অম্বর এবং জয়পুর রাজপরিবারের মধ্যেও সতীপ্রথা ছিল।

আসলে 'সতী' কথাটার সংজ্ঞাতেই তো ভুল আছে। একটা মেয়ে স্বামীর চিতায় পুড়ে মরে প্রমাণ করবে সে সতী! এ তো বড় আশ্চর্যের কথা।



মাড়োয়ার রাজ অজিত সিংহ (অষ্টাদশ শতাব্দী) যখন মারা যান তাঁর সংগে চিতায় উঠেছিলেন তাঁর ৬৪ জন রাণী। বুঁদিরাজ বুধদেও-এর চিতায় প্রাণ দিয়েছিলেন ৪৪ জন রাণী।

রাজস্হানে ধর্মের বন্ধন রাজপুত রমণীদের একটা গর্বের জিনিস। যুদ্ধে রাজপুতদের পরাজয় ঘটলে সদলে রাজপুত রমণীরা জহরব্রত পালন করত। অবশ্য জয়পুর নগরীর প্রতিষ্ঠাতা রাজা সোয়াই জয় সিংহ সতীপ্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন।

রাজস্হানের সতীপ্রথার আপাতত শেষ উত্তরাধিকারিণী রূপ কানোয়ার। রূপের বাপের বাড়ি রাঁচি। '৭১-এর ১৫ আগস্ট জন্ম। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা। ওর বাপের বাড়িতেও একটি ধর্মীয় বাতাবরণ ছিলই। যা থেকে রূপের বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। ওর বাড়ির কাছেই ছিল একটি সতীমন্দির। সেখানে নাকি রূপ পুজো দিতে যেত।

স্বেচ্ছামৃতা না খুন?

রূপ কানোয়ার যে স্বামী সোহাগিনী হয়ে অগ্নি আলিংগন করেননি তা প্রমাণ করেছেন বম্বে ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস-এর উইমেন অ্যান্ড মিডিয়া কমিটি। এই কমিটির তিন সদস্যের এক সমীক্ষক দল ঘটনাস্হল অনুসন্ধান করে দেখেন যে রূপের মৃত্যুর পিছনে কোন কালোহাত খেলা করেছে কিনা। পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী, মহিলা সংগঠন ইত্যাদির সংগে কথা বলে সমীক্ষকদলটি নিশ্চিন্ত হয়েছেন যে, রূপকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ও বাঁচতে চেয়েছিল।

রূপের ধর্মবোধ বা আবেগ নিশ্চয় মৃত্যুর মুহূর্তে কাজ করেনি। কারণ সমীক্ষক দলটি জেনেছে যে, রূপকে একটি শস্যগোলা থেকে টেনে হিঁচড়ে চিতায় তোলা হয়। রূপ গোলার মধ্যে প্রাণভয়ে আত্মগোপন করেছিল। সমীক্ষকদলটি সিদ্ধান্তে আসেন যে, এটি পরিষ্কার হত্যাকান্ড।

রূপের প্রাণ হননের পিছনে কি অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল? ধর্মের পাত্রে কি ধরা ছিল তরল লোভ? রূপের বিয়েতে ছিল যৌতুকের প্রাচুর্য। ৪৪০ গ্রাম সোনা। ৩০ হাজার টাকার ফিক্সড ডিপোজিট। রঙিন টি ভি, ফ্রিজ, কুকিং রেঞ্জ। সতী মন্দির বানাতে চাঁদাও উঠে গেল ৫০ লক্ষ টাকা প্রায় সংগে সংগে।

এরকম একটা কান্ড ঘটে গেল অথচ রাজস্হানের মুখ্যমন্ত্রী অদ্ভুত রকম নরম মনোভাব দেখিয়ে চলেছেন। মাঝে মাঝে একটু আধটু ধমক-ধামক দিচ্ছেন না যে তা নয়। কিন্ত অর্ডিন্যান্স জারি হল ১ অক্টোবর ৮৭-তে। অর্থাৎ রূপ দাহর প্রায় একমাস পরে ততক্ষণে চিতার আগুন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। জনমতের চাপে অবশ্য কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

'মুসলমান সমাজে সতী-প্রথার সুযোগ কোথায়?'

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

রাজস্হানের অষ্টাদশী রূপ কানোয়ারের সহমরণের পর শুরু হয়েছে এক অস্বাস্হ্যকর প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন মহলে এই ঘটনাকে গৌরবান্বিত করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু কেন এটাতো হত্যাকান্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। অপরাধ অবশ্যই যুক্তিগ্রাহ্য। অনেকে ধর্মের দোহাই দেবেন। ধর্মের নামে একসময় নরবলি প্রথাও চালু ছিল। তাহলে কি এটা মেনে নেওয়া সম্ভব? এককথায় এই রীতিটির অংকুরেই বিনাশ প্রয়োজন। অবাক লাগে ভাবতে, 'সতীদাহ'-এর ব্যাখ্যা কিন্তু মেলে না বুদ্ধিতে।

পুরুষরা চান, নারীরা হবেন পতিব্রতা, প্রেমে নিষ্ঠাবতী ও সেবাপরায়ণা। কিন্তু ঠিক তার উল্টোটাও তো একজন নারীর দাবি হতে পারে। তাঁরাও তো চান স্বামীও হবেন প্রেমে নিষ্ঠাবান, সেবাপরায়ণ এবং অবশ্যই পত্নীব্রতী। ভেবে দেখার বিষয়, কথায় ও কাজের মধ্যে কিন্তু যোজন দূরত্ব। অন্তত পুরুষদের।

সতী শব্দটির আগে কেন সৎ শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না শুধুমাত্র সতী শব্দটি অকারণে কেন ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হবে স্নেহ, বাৎসল্য, দয়া মায়া এই গুণগুলি আমরা নারীদের মধ্যে যতটা দেখি একজন পুরুষের মধ্যে ততটা দেখি না। কীসের ভিত্তিতে এবং কোন্ নিক্তিতে যাচাই হবে মাহাত্ম্য একজন শুধুমাত্র একতরফাভাবে সর্বস্ব দেবেন আর পাবার অংকটা হবে শূন্য এটা কোন সভ্য সমাজের রীতি হতে পারে না। মাহাত্ম্য প্রচারের চেয়ে বর্তমান সময়ে সৎ পুরুষ কীভাবে হওয়া যায় সেটা নিয়ে চিন্তা করা দরকার। আমার ধারণা, জায়া, জননী, কন্যার ছবিটা ইদানীং মলিন হয়ে যাচ্ছে। নারীকে আমরা ভোগ্যপণ্য দ্রব্যের মতো ব্যবহার করছি।

সম্প্রতি এক গবেষক লিখেছেন মুসলমান সমাজেও এই প্রথা চালু। এটা ভুয়ো, মিথ্যা। এই প্রথা আদৌ নেই। বস্তুত মিথ্যা। মুসলমান সমাজে সতীদাহ প্রথা ঢোকার সুযোগ কোথায়

ধর্ম হিসেবে 'ইসলাম' অনেক সুসংবদ্ধ। এর প্রবর্তকই এভাবে এটা গড়েছেন। এই ধর্মাবলম্বী কোন বিধবার সসম্মানে পুনর্বিবাহেও কোন বাধা নেই।

ব্যক্তি হিসাবে ইসলামে নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত। একজন নারী তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি পান নিজের ভাইয়ের পাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক। কারণ, পরবর্তীকালে তিনি অন্য ঘরের ঘরণী হন বলে। প্রসংগক্রমে এসে যায় বোরখার কথা। বোরখা পরেন্ বলে তিনি কিন্তু অসূর্যম্পশ্যা নন। বোরখা পরে তিনি বাইরের যাবতীয় কাজ করতে পারেন।

অনেকের মনে উঁকি দেবে হারেমের বিষয়টি। প্রাচীন কালের বাদশাদের মধ্যে এই রীতি চালু ছিল। হিন্দু রাজারাও এর ব্যতিক্রম নন। বলা বাহুল্য, এর সংগে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। বলা যায়, উঁচু উঁচু মহলের ঘটনা অন্তঃপুরে রাখতেই এইসব বিধিনিষেধ ছিল সেইসময়।

আমি কিন্তু কোন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এসব কথা বলছি না। বলছি সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' – তাই হিন্দু বা মুসলমান কেউই রক্তমাংসের মানুষ হয়ে মানুষের অবমাননা, নরহত্যা কোনভাবেই সমর্থন করতে পারবেন না।

আসলে রাজস্হানের এই মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে মাহাত্ম্য প্রচারের নামে যা চলছে তা সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলের মুনাফা লাভের ধান্দা।

দ্বিতীয়বার যাতে কোন রূপ কানোয়ারের ঘটনা না ঘটে তার জন্য অনেকে জনগণের মধ্যে চেতনা সঞ্চার, সামাজিক আন্দোলনের কথা বলেছেন। কিন্তু এর বীজ নিহিত রয়েছে অনেক গভীরে। কারণ, সমস্যাটি স্রেফ ধর্মঘটিত নয়। ঘটনা, নরহত্যার।

জনসাধারণ বহু ঘটনা নিজেরা দমন করতে পারেন না বলেই ভোট দেন, সরকার গড়েন। আইন-রক্ষক হিসেবে এখানে সরকারি হস্তক্ষেপ এই মুহূর্তে জরুরি। সরকার কীভাবে কী করছেন সেটাই বিবেচ্য।

সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে – দীপংকর পাল

আমাদের দেশে রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রীরা মানবতা-বিরোধী ধর্মীয় কুসংস্কারে হাত লাগাতে চান না সম্ভবত গদি টলে যাবার ভয়ে। বরং পরোক্ষে প্রশ্রয় দেন। এমন নারকীয় ঘটনার পরেও তাঁদের নাকের ডগায় কী করে সতীমন্দির তৈরির তোড়জোড় চলে? আর এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অনেক রাজনৈতিক গোত্রের ভি আই পি-কেও দেখা যায়। খোদ রাজধানীতেই ১৯৮৩ সালের ২৮ নভেম্বর একটি 'সতী' মিছিল পথ পরিক্রমা করে। পরিচালনায় ছিল – 'রাণী সতী সর্ব সংঘ' নামে একটি মহিলা সংগঠন। মিছিলে ছিলেন ১০৮ জন মহিলা। বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদেরও দেখা গেছে সতী অনুষ্ঠানে। সতী সর্ব সংঘ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে খুরশিদ আলম খাঁ যোগদান করেছিলেন, শংকরদয়াল শর্মাকেও দেখা গেছে একটি সতীপুজোর অনুষ্ঠানে। দিল্লির হরিনগরে মধ্যপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিং প্রতিষ্ঠা করেছেন একটি সতীমন্দির। এসব ঘটনা আপাত নিরীহ হলেও মিয়ানো বারুদ। শুধু একটু নির্বোধ উত্তাপের অপেক্ষায় থাকে। উত্তাপ পেলেই রূপ কানোয়ারের ঘটনা ঘটে যায়। রাজনৈতিক বিশ্বকর্মাদের উচিত ধর্মীয় সংস্কারের সরষে ভর ছিদ্রটুকুও বন্ধ করা। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা কে বাঁধবে। বরং উল্টোটাই দেখা যায় – ধর্মের সংগে রাজনীতির গাঁটছড়া বেঁধে রাজনৈতিক ফয়দা লোটা।

গান্ধীজির চোখে সতী

সতীর পুণ্যের দোহাই দিয়ে এই বীভৎস প্রথার প্রতিবাদ করেছিলেন গান্ধীজিও। তিনি ইয়ং ইন্ডিয়া (২১ মে ১৯৩১)-র পাতায় লিখেছিলেন : আজ পর্যন্ত এমন কোন স্বামীর কথা শুনিনি আমরা যিনি পত্নীর চিতায় আত্মবিসর্জনে উৎসুক। আসলে তথাকথিত চিংকৃত স্বামীত্বের বিকৃত অহংবোধেই এই আচারের মূল। সতীত্ব তো পবিত্রতারই আকর। এই পবিত্রতা কখনও চিতায় আত্মাহুতি দিয়ে অর্জন করা যায় না। তার জন্যে চাই আত্মবোধের আকুতি। ব্যাপ্ত জীবনধর্মের সাধনা। সহমরণ শাস্ত্রীয় কদাচারের পরাকাষ্ঠা হলেও হতে পারে কিন্তু সতীত্বের কখনওই নয়। বরং সতী বলি তাঁকে যিনি স্বামীকে ভালবাসার দাবিতেই জগত আর জীবনকে ভালবাসেন। আপন কর্মের গৌরবেই পরকে আপন করেন। সেটাই সতীর ধর্ম। সতীর ব্রত। এমন ব্রতচারিণীর শুদ্ধ জীবনাচরণ মৃত স্বামীকেও অমরত্বে বৃত করে। আর এমন শুদ্ধচারিণী বৈধব্যের শুভ্রতার বেশেও সতী।

রূপের রূপরেখা

রূপ কানোয়ারের আগে শত শত বছর ধরে হয়তো কয়েক লক্ষ রূপ ছাই হয়ে গেছে, কেউ অনিচ্ছায় কেউ স্বেচ্ছায়। রূপ যদি স্বেচ্ছায় সহমৃতা হয়েও থাকে তাহলে তার জন্যে দায়ী একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় পরিবেশ।

প্রখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক ডঃ কে জি থানভি রূপ সম্বন্ধে বলেছেন, 'দৃঢ়বদ্ধ কুসংস্কারে এই ধরনের মনোভাব শক্তিশালী হয়, আর তার থেকেই জন্ম নেয় অনড় প্রত্যয়। রূপ কানোয়ার ছিলেন প্রাচীনপন্থী পারিবারিক পরিবেশে মানুষ। মনস্তত্ত্বের ভাষায় যাকে বলে learning behaviour। ও সতীপ্রথার আদর্শেই মধ্যেই বড় হয়েছিল। এর সংগে তাৎক্ষণিক নৈরাশ্যমগ্ন চিত্ত তাকে আত্মোৎসর্গে অনুপ্রাণিত করেছিল।

যাইহোক রূপ কানোয়ারের মানসিক অবস্থা যখন এরকম তখন শোকমগ্ন রূপকে জীবনের পথে ফিরিয়ে না এনে গ্রামবাসীরাই তাকে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে এই বর্বর প্রথার দিকে ঠেলে দেয়। তা হলেই দেখা যাচ্ছে রূপের মধ্যযুগীয় এই কুসংস্কারের শিকার হওয়ার মূলে ছিল দেওরালা গ্রামের নিষ্ঠুর পরিবেশ। অতএব একে হত্যা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়।

সতী অসতী

সতী এবং অসতীর সংজ্ঞা নিয়ে অনেক পরস্পরবিরোধী মতবাদ প্রচলিত। যে রমণী শুধুই পতিব্রতা কিন্তু জীবনের অন্যদিকে সৎ নন তিনি সতী। আর পতিব্রতা না হয়েও জীবনের সর্বক্ষেত্রে যিনি সৎ, তিনিও কি সতী সম্ভবত এখানে দৈহিক সূচিতার প্রশ্নটিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই একটি বধূকে স্বামীর চিতায় পুড়ে মরে প্রমাণ দিয়ে যেতে হত যে, তিনি দৈহিক সূচিতা রক্ষা করে গেলেন। বৈধব্য জীবনে ভ্রষ্টাচারী হয়ে সামাজিক সমস্যার দায় তাঁর আর রইল না।

তাহলে সতী অর্থে যদি দৈহিক শুচিতাকে ধরা যায় তবে তো মহাভারত পুরাণে এমন ভূরি ভূরি নারী চরিত্র আছে যাঁরা ভ্রষ্টা হয়েও দেবীত্বের মর্যাদা পেয়েছেন। স্বামী থাকতেও যারা অন্যপুরুষে উপগত হতেন এবং তাঁদের ঔরসজাত সন্তান গর্ভে ধারণ করতেন।

মহাভারত পুরাণ ইত্যাদি প্রাচীন সাহিত্য সেকালের জীবন দর্পণ। অবশ্য পণ্ডিতমহল এগুলিকে ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা দিয়েছেন। তাই হিন্দু ধর্মে এবং আচার আচরণে স্ববিরোধী ব্যাপারটা এত প্রকট। অনেক ক্ষেত্রেই নারীর দৈহিক শুচিতা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে সরষের ভেতর ভূত থেকে গেছে! ধর্মের ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের রকমারি বিধান দেওয়াটাও এর একটা বড় কারণ। এবং হিন্দুধর্ম আর দর্শন গুলিয়ে ফেলাটাও বোধহয় তার একটা বড় কারণ। অনেক আচার-আচরণকে ধর্মের সংগে একাসনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে জন্যেই নরবলি বা সতীদাহর মত বীভৎস আচার ধর্মের ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে গেছে হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা অনেক বেশি উদার। সমুদ্রের মত। তাই নানা পথ নানা মত নদী হয়ে মিশেছে। কিন্তু ধর্ম যখন ক্রমশ আচার সর্বস্ব হয়ে ওঠে তখন শুরু হয় কু-সংস্কারের কাঁটাগাছের জন্ম।

সতীর জের টেনে এখানে আরও একটা কথা

জাল ছবি : সতী নিয়ে বেসাতির পশরা



বলতে হয় যে, এই পুরুষশাসিত সমাজ নিদারুণ অবিচারের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে নারীর ওপর। একজন পুরুষ একাধিক নারী সম্ভোগেও সৎ, কিন্তু নারী নয়। অথচ স্ববিরোধী ব্যাপারটা এখানেই যে সতীদাহর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে শুধু পতিব্রতারাই নয় যুগে যুগে কতশত রক্ষিতা বা উপপত্নী তাদের দয়িতের চিতায় আত্মবিসর্জন দিয়েছে এবং সে মৃত্যু ছিল প্ররোচনাহীন। এমনকি রক্ষিতাদের সতী হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় ১৮১৭ সালে সরকারি ঘোষণা করতে হয়েছে – 'একমাত্র পতিব্রতা ধর্মপত্নীই সতী হবার অধিকারী। রক্ষিতা বা ব্যভিচারিণী স্ত্রীর সে অধিকার নেই।' তাহলে দেখা যাচ্ছে 'সতী' শব্দটির বিশেষ কোন সংজ্ঞা দেওয়াই মুশকিল।

উড়িষ্যায় কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হলে তাঁর যত রক্ষিতা থাকতো তাদের সহমৃতা হওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। এই রীতি ছিল গুজরাটেও। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্যটক বারবোসার লেখায় পাওয়া যায় বিজয়নগরের এক রাজার সঙ্গে প্রায় পাঁচশো জনের সহমৃতা হওয়ার সংবাদ। আরও বিচিত্র সংবাদ ১৮১৭ সালে নেপালের এক রাজার। এই রাজা যখন মারা যান তাঁর সঙ্গে সহমৃতা হয়েছিলেন ১৬-বছরের সুন্দরী রাণী, পাঁচজন দাসী আর একজন রক্ষিতা। ১৮৪৪ সালে মৃত্যু হয় রাজা সুচেত সিং-এর। মোট ৩১০ জন নারীকে তাঁর সঙ্গে সহমৃতা হতে হয়। এই ৩১০ জনের মধ্যে তাঁর রাণী ছিলেন দশজন, বাকিরা রক্ষিতা।

এসব দূষিত ক্ষতের দাগ ইতিহাসের পাতায় ছেয়ে আছে। কোন কোন ক্ষতের চেহারা বেশ বিচিত্রও। যেমন, স্বামীর কাছে বিশ্বস্ত নয়, এমন কোন নারী যিনি অন্য পুরুষে আসক্ত তাকেও দেখা গেছে স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে সতী হতে। আবার এমন ঘটনাও আছে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর দিব্যি অন্য পুরুষের ঘর করছে, হঠাৎ স্বামী প্রেমের স্মৃতি তাকে অনুমরণে বাধ্য করল। এ কাহিনী ১৮২২ সালে 'জৌনপুরের উদাসীর'। কিন্তু জালালাবাদের শিবনিয়ার কাহিনী আরও বিচিত্র। তার স্বামীকে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছিল স্ত্রী সহমৃতা হচ্ছে উপপতির গলা জড়িয়ে। শুধু হিন্দু নয়, সতী হওয়ার ব্যাপার মুসলমান মেয়েদের মধ্যেও পাওয়া যায়, যাঁরা স্বামীর সঙ্গে 'সহসমাধিস্থ' হয়েছিলেন।

তাহলে একটা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, সব ক্ষেত্রেই ধর্মীয় চোখ রাঙানির ভূমিকা ছিল কি? এর একটাই উত্তর – ছিলই তো। শুরুতে ধর্মীয় চোখ রাঙানিটাই পরে সংস্কার হয়ে রক্তে ঢুকেছিল। আর সে রক্ত উত্তরাধিকার সূত্রে বহমান। আমি তো একবার দেখেছিলাম এক ৭০ বছরের বৃদ্ধাকে কোন এক ধর্মস্থানে প্রায় দেড় মাইল দণ্ডী কাটতে।

এবার প্রাচীনত্বের আদর্শে সতী অসতীর প্রশ্নে আসা যাক। সে প্রশ্নের উত্তর দেবে মহাভারত পুরাণের একাধিক নারী চরিত্র। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্মের ইতিহাসে তাঁদের মায়ের সতীত্বের কোন বালাই ছিল না, সতীর সংজ্ঞা অনুযায়ী। আবার কুন্তি ও মাদ্রীর গর্ভে পাণ্ডবভাইদের জন্ম ইতিহাস মোটেই ঐ দুই নারীর সতীত্বের গৌরব অর্জন করে না। শুধু কি তাই। কুন্তি ও মাদ্রীর পরপুরুষের দ্বারা গর্ভধারণ স্বামীর উৎসাহেই হয়েছিল। পরপুরুষ কামনা করে মহাভারতের অনেক রমণীই ক্ষেত্রজ সন্তান গ্রহণ করতেন, এমনকি নেহাৎই যৌনকাতর হয়েও পরপুরুষে উপগত হতেন। সতীত্বের শুচিবায়ুগ্রস্ততা তাঁদের স্পর্শ করেনি কেন? আবার দেখা যাচ্ছে রাজা পাণ্ডুর মৃত্যুতে মাদ্রী সহমৃতা হয়ে সতী হলেন। তাহলে সতী অসতীর সংজ্ঞাটা একটু গোলমেলে নয় কি? সতীত্বের প্রশ্নে আরও অনেক গোলমেলে ব্যাপার প্রাচীন উপাখ্যানগুলিতেই রয়ে গেছে। যেমন স্বামী জীবিত থাকা সত্ত্বেও গৌরী সতী হয়েছিলেন। তিনি পিতার মুখে শিবনিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী হয়েছিলেন। আবার বেহুলা সাবিত্রী লখিন্দর সত্যবানের সঙ্গে সহমৃতা না হয়ে তাঁদের পুনর্জীবনের সাধনায় সতী হলেন। কিন্তু বিনা দোষে সীতাকে অগ্নিপথ পার হয়ে সতীত্বের প্রমাণ দিতে হয়েছিল রামচন্দ্রের কাছে। অতএব দেখা যাচ্ছে সতীত্বের প্রশ্নটি হাস্যকর রকমের স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। এক আইনবিদ ধর্মীয় আচার, সংস্কারকে মেঠো পথের সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন – চলার প্রয়োজনেই মানুষের পায়ে পায়ে আঁকাবাঁকা পথের জন্ম। ঠিক কীভাবে তৈরি হয়েছিল কেউ বলতে পারে না। ধর্মীয় আচারের সৃষ্টিও এভাবেই।

পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই বেশি করে ধর্মের আচার-আচরণকে ধরে রাখে। সংস্কারের কাঁটা পেরেকে জর্জরিত হয়েও বেশ হাসিমুখেই সেসব মেনে নেয়। সম্ভবত পুণ্য অর্জনের আশায় কিংবা একটা অজানা ভয় থেকেই এর জন্ম। তাই সতীদাহ যেদিন আইন করে নিষিদ্ধ হয়েছিল সেদিন রাণী রাসমণির মত মহিলাও মেনে নিতে পারেননি। সতীদাহ নিষিদ্ধ আইনের কথা স্বামী রাজচন্দ্রের মুখে শুনে রাসমণি মন্তব্য করেছিলেন – 'আমাদের দেশের কামিনীদের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহা প্রচলিত থাকাই ভাল।'

এক বিদ্রোহী রাজা

সারা ভারতের শ্মশানে শ্মশানে যখন জীবন্ত নারীর মাংস পোড়ার গন্ধে বাতাস ভারী তখন এক রাজা শপথ করলেন, একটি অন্ধ কুসংস্কারকে ঐ জ্বলন্ত চিতায় না চাপিয়ে ছুটি নেবেন না। এই শপথের জন্যে অনেক মূল্যই রাজা রামমোহনকে দিতে হয়েছিল। যদিও সতীদাহ রোধ করার কাজে রামমোহনের আগেও অনেকে অনেকভাবে

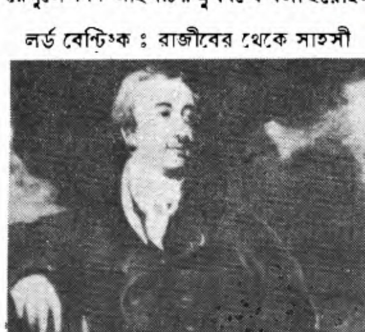


রামমোহন : যদি আজ থাকতেন

এসেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউই সমস্যাটির গভীরে ঢোকেননি বা লেগে থাকেননি। রামমোহন প্রথম দিকে সতীদাহ প্রথা আইন করে রদ করার বিরুদ্ধে মত পোষণ করতেন। তিনি সমস্যাটির মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন সামাজিক অবরোধ সৃষ্টি করে, প্রগতিশীল চিন্তার উন্মেষ ঘটিয়ে। শুধু এর পেছনে থাকবে জোরদার সরকারি মদত। তাই ১৮২৯-এর জুলাইয়ে গভর্নর হাউসে বেন্টিঙ্ক সাহেবকে সতীদাহ রোধের আলোচনায় জানিয়েছিলেন – 'না, বলপ্রয়োগে একে নিষিদ্ধ করা হলে লোকে আমাদের উদ্দেশ্যকে ভুল বুঝবে। বরং আরো বিধিনিষেধ জারি করে, এবং পুলিশের পরোক্ষ সাহায্যে এ-প্রথা অনায়াসে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি না করেই নিষিদ্ধ করা সম্ভব। এ বিষয়ে আইন পাশ হলে লোকের মনে হবে, ইংরেজরা একচ্ছত্র ক্ষমতা পেয়ে আমাদের ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমাদের ওপর তাদের ধর্ম চাপিয়ে দিতে ব্যস্ত।'

কিন্তু মাস কয়েক পরে লর্ড বেন্টিঙ্ক যখন ৪ ডিসেম্বর ১৮২৯ সালে সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে আইন পাশ করেন তার মাস দেড়েক পরে ১৮৩০-এর ১৬ জানুয়ারি-তে রামমোহন সবান্ধবে গভর্নর হাউসে গিয়ে সাহেবকে অভিনন্দন জানিয়ে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায়, কুঞ্জবিহারী রায় এবং আরও কয়েকজন। এই সতীপ্রথা 'illegal and punishable by the criminal courts' বলে কাউন্সিলে গৃহীত হল। এটি ছিল ১৮২৯ সালের ১৭ নং রেগুলেশন। আইনটির মুখবন্ধে বলা হয়েছিল

লর্ড বেন্টিঙ্ক : রাজীবের থেকে সাহসী



– 'সতীপ্রথা মানবিক অনুভূতির পরিপন্থী। হিন্দুধর্মে একে কোথাও আবশ্যিক বলা হয়নি, বরং ব্রহ্মচর্যে কালক্ষেপণই বিধবার পক্ষে বিধেয়। সারা ভারতে জনসংখ্যার বিরাট অংশ এ প্রথা পালন করে না। দেশের অভ্যন্তরে অনেক প্রদেশে এ প্রথার চল নেই। যে সব অঞ্চলে এ প্রথা সবচেয়ে প্রচলিত, সেখানে অনেক সময় বলপ্রয়োগ করা হয় – হিন্দুদের নিজেদের কাছেই যা বীভৎস, অশাস্ত্রীয় ও নিষ্ঠুর। এ পর্যন্ত এ প্রথা দমনে গৃহীত ব্যবস্থাদি ব্যর্থ হয়েছে, এবং সপার্ষদ গবর্নর জেনারেল এ বিষয়ে একমত, সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা ছাড়া এ প্রথাজনিত অমংগল দূর করা সম্ভব নয়। এইসব বিবেচনা করে সপার্ষদ গবর্ণর জেনারেল ব্রিটিশ সরকারের প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ নীতি সর্বশ্রেণীর লোকের ধর্মীয়কৃত্য। (যতক্ষণ না তা ন্যায় ও মানবতার পরিপন্থী হয়ে ওঠে) পালনের স্বাধীনতার কথা মনে রেখে নিম্নলিখিত আইন এখন থেকে ফোর্ট উইলিয়মের সীমানার মধ্যে বলবৎ করতে মনস্থ করেছেন।'

সতী কলকাতার আশেপাশে

১৮০৪ সালের ১৫ এপ্রিল থেকে ১৫ অক্টোবর – এই কলকাতার ৩০ মাইলের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশনারিরা যে সমীক্ষা চালান, তাতে দেখা যায় এই ৬ মাসে এই অঞ্চলে ১১৬ জন সতী হয়। গড়িয়া থেকে বারুইপুরের মধ্যে ১১ জায়গায় মোট ১৮ জন। টালির নালার মুখ থেকে গড়িয়ার মধ্যে ১৮ জায়গায় মোট ৩৬ জন। বারুইপুর থেকে বাহিপুরের মধ্যে ৭ জায়গায় মোট ১২ জন। শিবপুর থেকে বালির মধ্যে ৫ জায়গায় মোট ১০ জন। বালি থেকে বৈদ্যবাটির মধ্যে ৩ জায়গায় মোট ৩জন। বৈদ্যবাটি থেকে বাঁশবেড়িয়ার মধ্যে ৫ জায়গায় মোট ১০ জন। কলকাতা থেকে বরানগরের মধ্যে ৪ জায়গায় মোট ৬ জন। বরানগর থেকে চানকের (বারাকপুর) মধ্যে ৬ জায়গায় মোট ১৩ জন। চানক থেকে কাঁচড়াপাড়ার ৪ জায়গায় মোট ৮ জন।

তথ্য : স্বপন বসু



জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা চিতার আগুন কখনো সমাজকে আলোকিত করে না। কারণ সংস্কারের ডোম বড় নিষ্ঠুর। সতীর নামে ঐ অন্যায় চিতায় পুড়ছে মানবধর্ম।

বিলতো পাশ হল। কিন্তু তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ সহজে ছেড়ে দিতে চাইলো না। রাধাকান্ত দেব, কালীকৃষ্ণ দেব, ভবাণীচরণ সমাজপতি প্রমুখ ভদ্রজন এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এবং সতী সমর্থকদের পক্ষ থেকে দুটি আর্জিও গভর্নর সাহেবের কাছে পেশ করা হয় – যাতে ১১৪৬ জনের স্বাক্ষর ছিল। স্বাক্ষরদাতারা সবাই বিশিষ্ট ব্যক্তি।

সতীর চিতা যেমন প্রাচীন, তার উত্তাপও যুগ-যুগ ধরে শতশত প্রতিবাদীর হৃদয় পুড়িয়ে আসছে। দীর্ঘকাল ধরেই এইসব প্রতিবাদীরা রামমোহনের মত একটা কথাই বুঝতে পেরেছিলেন, এই জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা চিতার আগুন কখনো সমাজকে আলোকিত করে না। কারণ সংস্কারের ডোম বড় নিষ্ঠুর। সতীর নামে ঐ অন্যায় চিতায় পুড়ছে মানবধর্ম।

প্রাচীনকালেই অনেক হিন্দু চিন্তাবিদ নানাভাবে এর প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁদের অনেকেই বলেছিলেন এ প্রথা আত্মহনন ছাড়া কিছুই নয়। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বানভট্ট সতীপ্রথার তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন 'ভর্ত্তা উপরত হইলে তাহার অনুগমন করা মূর্খতা প্রকাশ মাত্র।' দক্ষিণ ভারতীয় লেখক দেবেন ভট্ট (দ্বাদশ শতাব্দী)। সতীদাহকে 'নিম্নস্তরের ধর্মানুষ্ঠান বলেছেন। চৈতনাদেবও এ প্রথার বিরোধিতা করেছেন। বিভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন ভারত পর্যটক সতীদাহ দেখে নিন্দা করেছেন। মোগল আমলেও এই প্রথাকে নানাভাবে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন সম্রাটরা। তারপর ইংরেজ আমল। রাজা নবকৃষ্ণ একজন বিধবাকে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করলে বিধবাটি অনাহারে আত্মবিসর্জন দেয়। মিঃ ন্যাথানিয়েল স্মিথ ছিলেন কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের চেয়ারম্যান। ১৭৭৩ সালে তাঁর অনুরোধে হেস্টিংস সতীর শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। ১৭৭৫ সালে মিঃ উইলকিন্সও এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালান। কিন্তু বৃটিশ পার্লামেন্ট সেদিন ধর্মে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করে। হেনরি কোলব্রুক ১৭৯৫ সালের 'এশিয়াটিক রিসার্চেস-এর ৪র্থ সংখ্যায় 'পতিব্রতা হিন্দু বিধবার কর্তব্য' বিষয়ে একটি প্রবন্ধে সতীপ্রথা সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্রকার মতভেদের কথা তুলে ধরেন। ১৮১৩ সালে একটি সরকারি আদেশে দেখা যায় ম্যাজিস্ট্রেটরা সতী সম্পর্কে পুলিশ দারোগাদের কয়েকটি নির্দেশ দেন : কাউকে যেন বলপ্রয়োগে বা মাদক প্রয়োগ করে সতী করা না হয়। সতীর বয়স যেন ১৬-র কম না হয়। সতীবিষয়ে পুলিশকে তাদের মাসিক রিপোর্ট দেবার নির্দেশ দেওয়া হল।'

এইসব সরকারি আদেশ তেমন জোরালো ছিল না, কারণ ইংরেজও বুঝেছিল যে, কোন ধর্মীয় সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করতে হলে ধীরে ধীরে এগোতে হবে।

১৮২৯ সালে সতীদাহ আইন বলবৎ হওয়ার ঠিক আগের দশ বছরে (১৮১৯-২৮) কলকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা, কাশী, বেরিলিতে সতীদাহ সংখ্যা ৫৭৬৮।

১৮২৪ সালে সতী সংখ্যা

জেলা	মোট সতীসংখ্যা	পুলিশের উপস্থিতি
যশোর	৩০	২৯
মেদিনীপুর	২২	২০
নদীয়া	৭৩	৭৩
কলকাতা শহরতলী	৩৪	৩৪
২৪ পরগণা	২২	২০
কটক	১১	৯
ঢাকা	২৩	২১
মুর্শিদাবাদ	৮	৭
রামগড়	১০	৩
সারণ	১২	১১
শাহাবাদ	১৮	২
বেনারস	১৬	১৬
গাজিপুর	৩৩	৫
গোরক্ষপুর	১৭	০
মির্জাপুর	৬	৫
১৫	৩৩৫	২৫৫

তথ্য : স্বপন বসু



রাজা রামমোহনই দীর্ঘদিন আন্দোলন চালিয়েছিলেন। অনেকের মতে তাঁর এক নিকট আত্মীয়াকে সতীদাহ করা হয় এবং এই ঘটনাটি তাঁকে বিচলিত করে। আবার অনেকের মতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সে যাই হোক এই মুকুটহীন রাজাই জঘন্য কুসংস্কারটিকে চিতায় তুললেন। প্রথমে আন্দোলন তিনি একাই শুরু করেন তারপর তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শতশত মানুষ পাশে এসে দাঁড়ায়। এক বিদ্রোহীই যে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে শত বিদ্রোহী গড়ে দিতে পারে রামমোহন এটা প্রমাণ করলেন।

প্রাচীন অন্ধকার থেকে

সতী এখন কলকাতায়। কলকাতা বরাবরই কিছু একটা নিয়ে মেতে থাকতে ভালবাসে। বিশ্বক্রিকেট, সাফ, সতী সবই কলকাতা আপন করে নিতে জানে। কলকাতার এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে দু-চারটে সতী মন্দির। এতদিন কারো চোখে পড়েনি। দেওরালার চিতার আগুন ছুটে এসে তা জানিয়ে দিল। কিন্তু মন্দিরগুলির বয়স কোন কোনটা শতাব্দী উত্তীর্ণ। এতদিন ধরে পুজোও হচ্ছিল, কিন্তু কী পুজো হচ্ছিল সেই মেয়েলি খবর সম্ভবত পুরুষেরা রাখতেন না। রূপ কানোয়ার তা পাল্টে দিয়ে গেল। সংগে সংগে ব্যাপারটা রাজনীতিগন্ধীও হয়ে উঠলো। এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীতো কলকাতার সতী মন্দিরের ব্যাপারটা ভাল করে না জেনেই জ্যোতি বসুর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিলেন। বললেন 'জ্যোতি বসুর রাজত্বে সম্ভব।' তিনি বাঙালি হয়ে এটুকু ভেবে দেখলেন না যে, ঐ মন্দিরগুলি শুধু জ্যোতি বসুর রাজত্বেই নয়, সিদ্ধার্থশংকর, প্রফুল্ল সেন, বিধান রায়, সারাবর্দি, ফজলুল হক, এবং সম্ভবত সিরাজের আমল থেকে রয়ে গেছে। এখন অন্তত রূপ কানোয়ারের মৃত্যুর সংগে এ মন্দিরের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন রূপ কানোয়ারের মৃত্যু দেখে কি বলা যায় রাজীবের রাজত্বে সবই সম্ভব প্রাচীন কালে কালীমন্দিরে নরবলি হত। এখনও এক আধটা খবর শোনা যায় হৈ-চৈও হয় কিন্তু তার জন্যে যত কালীমন্দির আছে তার বিগ্রহ বিসর্জনের কথা ভাবা হয় না।

উত্তেজনা নয়। সংস্কারকে নির্মূল করার রাস্তা অন্য। ভারতের মানুষ এখন অনেক বেশি রাজনীতি-সচেতন হলেও ধর্মীয় সংস্কারের কাছে দুর্বল। তাই অনেক বড় বড় রাজনৈতিক নেতাকে দেখা যায় 'সতী' অনুষ্ঠানে। ধর্মীয় কুসংস্কার দিয়ে তৈরি মাদকের কড়াঘুম কি একটা রূপ কানোয়ারের মৃত্যু ভাঙাতে পারে? বিংশ শতাব্দীর এই শেষ রাতেও সেই প্রাচীন অন্ধকার থেকে উঠে আসা বেহুলার ভেলাটি চলেছে একবিংশ শতাব্দীর দিকে। এটা তো আমাদেরই লজ্জা। □

সতী হওয়ার খরচ

একটি মেয়ের সতী হওয়ার খরচ কত? ঠিক বলা যায় না। তবে ১৯. ৮ ১৮২৪-এ কটকে একটি মেয়ের সতী হওয়ার খরচের একটি হিসাব পণ্ডিতদের কাছে পাওয়া যায়

ঘি – তিন টাকা
কাপড় - এক টাকা
সতীর নতুন কাপড় – আড়াই টাকা
কাঠ – তিন টাকা
পুরোহিত-তিন টাকা
সতীর বিলি করার জন্যে – এক টাকা
চাল – এক আনা
পান – দু পয়সা
ফুল – এক আনা
কর্পূর – এক আনা
শন – চার আনা
হলদী – এক আনা
চন্দন, ধূপ, নারকেল – পাঁচ পয়সা
বাহক – পাঁচ আনা
গায়ক-বাদক আট আনা
নখ কাটার জন্য চার আনা
কাঠ কাটার জন্য তিন আনা
মোট পনেরো টাকা পাঁচ আনা তিন পয়সা।শ্রাদ্ধবাবদ খরচ ১৫ ২০ টাকা।

তথ্য : স্বপন বসু



বিতর্ক : সতী – সেকাল ও একাল

মনে হয়েছিল দেড়শো বছর আগেই বিতর্কটা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু না। অন্ধ সংস্কারের ও সম্পত্তিচেতনার গভীরে যার মূল প্রোথিত বারবারই যে তা বিষবৃক্ষের রূপ নিতে পারে সেটা আর একবার বোঝা গেল রূপ কানোয়ারের 'সতী' হবার বা তাঁকে 'সতী' করার ঘটনায়। বিতর্কটা তাই আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তবে দেড়শ বছরের আগের বাংলায় বিষয়টা যত সরাসরি ছিল এখন তো তা অত সহজে উঠে আসার জো নেই। তাই বিতর্কটা ভোল বদলে ভেক ধরেছে মাত্র। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর দেড়শো বছর আগেও ছিল, এখনও আছে এবং প্রবলভাবেই আছে। আর মৌলবাদীরা আগে যেমন প্রবলভাবে ছিল এখন আর তারা তেমন পরাক্রান্ত নয়, কিন্তু আগের তুলনায় অনেক চতুর। তবে এটা বাংলায়। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জনসত্তার মত পত্রিকা কিন্তু মৌলবাদীদের দেড়শ বছরের আগের পরাক্রম দেখিয়েই সম্পাদকীয় নিবন্ধে (সম্পাদক প্রভাত যোশি) সতীদাহকে সমর্থন যুগিয়েছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই বিবেকবান মানুষের ঘৃণার বিষ বর্ষিত হয়েছে তাদের ওপর। কিন্তু এ বঙ্গে যারা চতুরতার সঙ্গে একই কাজ করছে তাদের মুখোশের আড়ালের মুখগুলো কি চেনার প্রয়োজন নেই ? এই নিবন্ধে সেকালের মৌলবাদী ও প্রতিবাদীদের বক্তব্য তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে একালের চতুরদেরও বক্তব্য তুলে ধরা হল।

ভারতে সতীদাহবিরোধী সংগঠিত আন্দোলনের জনক রাজা রামমোহন রায় ১৮২৯ সালের জুলাই মাসে যেদিন লর্ড বেন্টিংকের সঙ্গে দেখা করেন তারপর থেকেই কলকাতা শহরে খবর ছড়িয়ে যায় যে, সরকার সতীদাহবিরোধী আইন প্রণয়ন করতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে পত্রপত্রিকাগুলি পক্ষে বিপক্ষে নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকে।

৭.১১.১৮২৯ 'বেঙ্গল হেরাল্ড' লিখল : সরকার সতী নিবারণের সংকল্প নিয়েছেন অল্পদিনের মধ্যেই এ প্রথার বিলোপ হবে।

২৬.১১.১৮২৯-এ 'বেঙ্গল ক্রনিকল' আমরা নিশ্চন্ত যে খুব শীঘ্রই আমরা পাঠকবর্গ ও জনসাধারণকে কাউন্সিলে সতী নিষিদ্ধ হবার সিদ্ধান্ত শুনিয়ে খুশী করতে পারবো। এ ব্যবস্থার ফলে সারা ইউরোপ বৃটিশ ইন্ডিয়ান সরকারের প্রশংসামুখর হয়ে উঠবে। কালক্রমে হিন্দুরাও এর জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করবে। আর যদি বিরোধিতার কোন আশংকা থাকেও এই ব্যবস্থার ফলে যে মংগল হবে, সে কথা স্মরণ করে অতি ভীরু শাসকও এরকম ক্ষেত্রে আরো বেশী ঝুঁকি নিতে পারে।

২৬.১১.১৮২৯ 'জন বুল' আশা করি শীঘ্রই আমরা বৃটিশ রাজত্বে নির্মম ও অমানবিক সতীপ্রথা নিষিদ্ধ হবার কথা ঘোষণা করতে পারবো।

এইভাবে সতীদাহ বিরোধী আইনের পক্ষে যখন বিভিন্ন দেশি ও সাহেবি কাগজগুলো সোচ্চার তখন মৌলবাদের দুর্গ রক্ষার লড়াইয়ে নামলেন ভবানীচরণ 'সমাচার চন্দ্রিকা'য়। ১৯.১১.১৮২৯-এ ভবানীচরণ লিখলেন : আমাদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত শিউরে উঠছে। আমরা বিপন্ন, ভীত, বিস্মিত। এমনকি অত্যাচারী মুসলমান শাসকরাও আমাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করেননি। ন্যায়পরায়ণ কোন সরকারের আমলে তা যদি করা হয়, তাহলে তার চেয়ে দুঃখের আর কী হতে পারে। মনে হচ্ছে হিন্দুধর্মের শেষ অবস্থা উপস্থিত।

এর আগে 'কোলে হেরাল্ড' বলেছিলেন যে, কলকাতার বহু হিন্দু এ প্রথা উচ্ছেদের পক্ষে। তাই ভবানীচরণ আরো লিখলেন : কোন মূর্খ তাঁকে একথা বলেছে কলকাতার জ্ঞানী-গুণী-ধনী-ভদ্র-নম্র ব্যক্তির এ প্রথা রক্ষার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করাতে কৃতসংকল্প। খুব শীঘ্রই এই আবেদন পেশ করা হবে। আর কলকাতার অধিবাসীদের উপর আরোপিত কলংকের তাই হবে যথাযোগ্য উত্তর।

বেংগল হেরাল্ড, সমাচার দর্পণ, জনবুল, বেংগল হরকরা, ইন্ডিয়া গেজেট সবাই বলেছে, দেশীয় ব্যক্তিদের অনেকেই একে সমর্থন করেন না। তাই ২৬.১১.১৮২৯-এ ভবানীচরণ 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় চ্যালেঞ্জ জানালেন ঐসব ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করতে। তাঁর আরও বক্তব্য : সমস্তরকম ক্ষতির মধ্যে হিন্দুদের কাছে ধর্মনাশই সবচেয়ে গুরুতর – কারণ ধর্ম একবার নাশ হলে আর ফেরে না। সতী নিষিদ্ধ হলে হিন্দুর সেই ধর্মনাশই হবে।

এরপর 'সমাচার দর্পণ' এগিয়ে এলো 'সমাচার চন্দ্রিকা'কে বোঝাতে, ২৯.১১.১৮২৯ দর্পণ লিখলো : মনু সতীর কথা বলেননি, হিন্দুশাস্ত্রমতেও কাম্যমরণ উঁচুদরের ব্যাপার নয়। অমানবিক নিষ্ঠুর এ প্রথা নিষিদ্ধ হলে হিন্দুধর্মের কোন হানি হবে না এবং কেউ একে হিন্দুদের ধর্মনাশের চক্রান্ত মনে করবেন না।

কিন্তু ভবানীচরণ অপ্রতিরোধ্য। পরের দিনই (৩০.১১.১৮২৯) উত্তর দিলেন : মনু তো কোথাও সতীপ্রথাকে নিষিদ্ধ করেননি। দুর্গাপূজা, দোল ইত্যাদির কথাও তো তিনি কোথাও বলেননি। তাহলে যারা এগুলি করে তারা কি মনুকে মান্য করে না? আসলে সতী বিষয়ে মনুর নীরবতা তাঁর এ বিষয়ে সম্মতির লক্ষণ।

ভবানীচরণের মতে সতীদাহ ধর্মীয় কৃত্য, তাই অমানবিক নয়। যাই হোক, সমাচার এসব যুক্তি খন্ডন করার পর লিখলো : চন্দ্রিকাকার আমাদের কলকাতার সতীবিরোধীদের নাম প্রকাশ করতে বলেছেন কিন্তু তা করে আমাদের কাগজ ভরাতে চাই না। চন্দ্রিকাকার সতীপ্রথার সমর্থকদের নাম প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি, যাদের নাম তাঁর তালিকায় নেই, তারাই সতীপ্রথার বিরোধী।

এরপর জনৈক ইংরেজি শিক্ষিত ব্রাহ্মণ বেংগল হরকরায় অভিমত পোষণ করলেন যে, সতীদাহ নিষিদ্ধ করলে দেশে বেশ্যার সংখ্যা বেড়ে যাবে। এদিকে এত বিতর্কের মধ্যেও কিন্তু আশা ছাড়েননি ভবানীচরণ। ৩০.১২.১৮২৯-এ তিনি লিখলেন, গবর্নর জেনারেল 'শাস্ত্রবিচার না করিয়া কখন কোন আজ্ঞা দিবেন না, এক্ষণে যে সকল কথা উঠিয়াছে তাহা গোলযোগ মাত্র।'

কিন্তু তারপর দিনই ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮২৯ সমস্ত গোলযোগকে মিথ্যা প্রমাণিত করে গৃহীত হলো সতীবিরোধী আইন। সরকারি ঘোষণা হতে আরো কয়েকটা দিন কেটে গেল। তারপর ৭.১২.১৮২৯-এ 'বেংগল হরকরা' লিখল : সতী নিষিদ্ধ করে সরকারি ঘোষণা আজ থেকে বলবৎ হবে। অনুভূতিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষই যে বিষয়টিতে উৎফুল্ল হবে বলাই বাহুল্য।

ঐদিনই সন্ধ্যাবেলা গভর্নমেন্ট গেজেট আইনের বয়ান প্রকাশ করে লিখলো : আমাদের আজকের গেজেটে এমন একটি দলিল প্রকাশিত হয়েছে, যা দেখে প্রত্যেকটি মানবীয় হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। অবশেষে আমরা গভীর আনন্দের সংগে ভারতের দেশীয় ও ইউরোপীয় বাসিন্দাদের অভিনন্দন জানিয়ে ঘোষণা করছি – বীভৎস সতীপ্রথা নিষিদ্ধ হয়েছে। এই অমানুষিক প্রথা, যার কথা চিন্তা করলে পর্যন্ত শিউরে উঠতে হয়, ঐতিহাসিক স্মৃতিচারণা ছাড়া আর তার কথা শুনতে পাওয়া যাবে না।

আইনপ্রণয়নের পরেই ইংরেজি সংবাদপত্রগুলো সমস্বরে সরকারকে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। আর বেন্টিংকের উপর বর্ষিত হতে থাকলো প্রশংসা। ডিরোজিও কবিতা লিখলেন। লন্ডনের 'খ্রীশ্চান অবজার্ভার' এপ্রিল ১৮৩০-এ লিখলো : Tens of thousands of human beings will live to bless the present benevolent and enlighted governor general of India for this enactment.

এদিকে ধর্মনাশে ভীত হয়ে ভবানীচরণের দল ১১৪৬ জন সতীসমর্থকের স্বাক্ষরযুক্ত দুটি আবেদনপত্র পেশ করলেন গভর্নর জেনারেলের কাছে। তাঁদের বক্তব্য সতীপ্রথা ধর্মীয় কৃত্য, এতে হস্তক্ষেপ অন্যায় ও অন্যায্য।

তাঁদের এই আবেদন ইংল্যান্ডের রাজদরবারে পৌছনোর জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকার পরিকল্পনা নিয়ে ধর্মসভার সমাজপতিরা যখন ব্যস্ত তখন সমাচার দর্পণের সম্পাদক প্রশ্ন তুললেন, যাঁরা ধর্মসভার সমর্থক নন তাঁরা কেন তাঁদের পক্ষের শাস্ত্রীয় যুক্তিগুলি পার্লামেন্টে পাঠাচ্ছেন না?

এখানে বলা দরকার সবসময় চিৎকার চেঁচামেচির জন্য ধর্মসভার নাম হয়ে গিয়েছিল 'গুড়ুমসভা'। আর ব্রাহ্মসভার শান্ত অনুত্তেজক ভাবের জন্য নাম ছিল 'শীতলসভা'। বলা বাহুল্য দুটো নামই ব্যংগার্থে।

যাই হোক সমাচার দর্পণের সম্পাদকের প্রশ্নের জবাব দিলেন কৌমুদী সম্পাদক। তিনি লিখলেন : সম্পাদক বোধহয় জানেন না যে, পরম পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে প্রচুর পরিমাণে সতীনিষেধক উক্তি সংগৃহীত হয়েছে এবং এজন্য যে সামান্য অর্থ লাগবে তাও। তবে এঁরা ধর্মসভার মত আদাজল খেয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহে বা অর্থ সংগ্রহে নামেননি, কারণ উদ্দেশ্য তাঁদের একটাই। যে ভদ্রলোকটি এইসব কাগজপত্র নিয়ে ইংলন্ডে যাবেন তাঁকে তাঁর যাবার খরচ হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাওয়া হয়। কিন্তু এদেশীয় মেয়েদের প্রাণরক্ষার আবেদন নিয়ে যাবার মত একটি ন্যায়সংগত কাজের জন্য তিনি কোন অর্থগ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, সতীপ্রথার বিলুপ্তি দেখতে পেলে তিনি যারপরনাই আনন্দিত হবেন। ইংলন্ডে এই আবেদনটি নিয়ে তিনি খুব শীঘ্রই যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত

বলা বাহুল্য এই মানুষটির নাম রাজা রামমোহন রায়।

একালের বিতর্ক

একালের বিতর্ক পর্যায়ে আমরা অতিসম্প্রতি কলকাতার সতীমন্দির ও সতীমেলা নিয়ে যে বিতর্ক হয় শুধু তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবো। পাঠককে তার আগে উনবিংশ শতকের অচেনা প্রেক্ষাপট থেকে ১৯৮৭ সালের চেনা রাজনৈতিক সামাজিক পরিবেশে মানসিকভাবে ফিরে আসা দরকার। এবং আরো একবার মনে করিয়ে দিই, ১৯৮৭ সালেও এই কলকাতা শহরে ভবানীচরণরা আছে, তবে অন্য বেশে।

১১.১১.১৯৮৭ প্রধানত খেলার দৈনিক বলে পরিচিত একটি পত্রিকায় 'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবংগের লজ্জা বাঁচাতে ব্যবস্থা নেবেন কি?' শিরোনামে চার তথ্যানুসন্ধানীর রিপোর্ট প্রথম প্রকাশ হল। প্রথম প্যারাগ্রাফে লেখা হল : রাজস্থানের দেওয়ালা গ্রামের তরুণী বধূ রূপ কানোয়ারের 'সতী' হওয়ার ঘটনায় গোটা দেশে একদিকে যেমন উঠেছে প্রতিবাদের ঝড় অন্যদিকে তেমনই মৌলবাদী

কিছু সংগঠন এই ঘটনার পক্ষ নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কলকাতা শহরেও 'সতী' ঘটনার বিরুদ্ধে মিটিং মিছিল হয়েছে। প্রগতিশীল বেশ কিছু সংগঠন প্রতিবাদসভা করেছেন। ঐসব প্রগতিশীল মানুষেরা জেনে অবাকই হবেন যে মাত্র ৪ দিন বাদেই এই কলকাতা শহরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে একটি সতী মেলা যেখানে রাজস্থানের রানী সতীর মাহাত্ম্য প্রচার করা হবে। পরদিনই (১২.১১.৮৭) ঐ পত্রিকা জানায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ খবর। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন সতীমাহাত্ম্য প্রচার করতে যে মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তা বন্ধ করতে। সি পি এম-এর কলকাতা জেলা কমিটি মেলা বন্ধ করার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে। এবং মহিলা কংগ্রেস মেলার দিন প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে যাবে। ১৩.১১.৮৭ তারিখে ঐ পত্রিকা কলকাতায় আরো বিভিন্ন সতীমন্দিরের খবর প্রকাশ করে দেয়। এক প্রতিবেদনে তারা প্রশ্ন রাখে : এ বছরও কি রাস্তায় বেরোচ্ছে রানী সতীর ট্যাবলো কমপিটিশন ?

একই দিনে প্রকাশিত হয় কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্র এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষের তীব্র সতীবিরোধী প্রতিক্রিয়া। ঐ সংবাদসূত্র ধরে সংসদে তুমুল বাকবিতন্ডা হয়ে গিয়েছে।

অদ্যাবধি পাঠকবর্গ নিশ্চিত হয়ে গেলেন কলকাতায় সতীমন্দির ও মেলা নিয়ে ঐ পত্রিকাটি কী ভূমিকা নিতে চাইছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অন্যান্য পত্রপত্রিকা তখনও প্রায় নীরব।

কলকাতার সাহেবি পত্রিকা একটা ছোট্ট খবরে ১৩.১১.৮৭-তে জানায় : The CPI controlled Paschim Banga Mahila Samiti at Thursday strongly protested against the plan to hold a mela near the Sati temple under Phulbagan police station in east Calcutta on Sunday.

একই তারিখে আর একটি ইংরেজি দৈনিক কোন মন্তব্য না করে বলেন : The West Bengal Government was taken by surprise over the existence of a Sati temple in the Beliaghata area of east Calcutta and the preparations for fair on the temple premises next Sunday to highlight the 'virtues' of the Sati cult.

তবে ১৩.১১.৮৭-তে বামপন্থীদের প্রধান মুখপত্র তীব্র ভাষায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখে : এই নারকীয় প্রথার পিছনে যে বিত্তলোভী ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের অভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা কাজ করছে, মধ্য কলকাতার বেলেঘোটার যোগোদ্যান ও শূড়া জুট মিল সংলগ্ন অঞ্চলে যোগোদ্যান লেনের 'সতী মন্দির'ই তার প্রমাণ। এখানকার কোন সতীদাহকে কেন্দ্র করে এই মন্দিরটি স্থাপিত হয়নি। ১৮২৯ সালের পরবর্তী আট বছরের মধ্যে স্থাপিত এই 'মন্দির'টি রাজস্থানের ঝুনঝুনুর রানী সতী মন্দিরের শাখারূপে কলকাতায় অবস্থিত রাজস্থানী ব্যবসায়ীদের অর্থানুকুল্যে জনৈক রাজস্থানী পুরোহিতের বংশানুক্রমিক সম্পত্তিরূপে এটি পরিচালিত হচ্ছে। ... আজ প্রশ্ন হলো, পশ্চিমবংগে এ জিনিস চলতে দেওয়া যায় কি ? সুদূর রাজস্থানে নয়, খোদ কলকাতায় প্রগতিশীল মানুষ ও সংগঠনগুলির কাছে বিশেষ করে পশ্চিমবংগের নারী সমাজ ও নারী সংগঠনগুলির কাছে এবং সতীদাহ-বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জরূপে আজ দেখা দিয়েছে।

কিন্তু ওই একই দৈনিক ১৭.১১.৮৭ তারিখে লিখছে : পত্রিকাকে কদিন ধরে সতীরোগে ধরেছে কিনা বোঝা মুশকিল। দিন পাঁচেক ধরে প্রথম পাতায় ফলাও করে রোজ প্রচার করেছে রাজস্থানের চুনরী মেলা বেলেঘাটায় বসতে চলেছে গেলো রবিবার। রবিবার এলো কিছুই হলো না। পাঁচদিন ধরে এই চিৎকার চেঁচামেচি ও অসভ্যতার মানে কী ? (রাজস্থানের সতীদাহ নিয়ে) লজ্জায় নত হয়ে গিয়েছে কংগ্রেস (আই) সরকারের মুখ। সারাদেশে ঘৃণা কুড়িয়েছে কংগ্রেস (আই)। কলঙ্কিত কংগ্রেস (আই)-এর মুখে চুনকাম করতে ... ... পত্রিকা কলকাতায় সতীমেলা বসিয়ে দিল। পাঁচদিন ধরে একটানা প্রচার চালিয়ে গেল, যাতে প্রচারটা হয়, মেলাটাও বসে আর কংগ্রেস (আই)-ও খুশী হয়।

১৪.১১.৮৭-তে কংগ্রেস (আই)-এর দুই বিধায়কের বক্তব্য প্রকাশিত হয়। রাজেশ খৈতানের মতে, এই ঘটনা ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ। তাই তিনি সতীমিছিলের বিরোধিতা করতে পারবেন না। দেওকিনন্দন পোদ্দার জানান, কলকাতার সতী মন্দিরগুলি আসলে শক্তি মন্দির। রাজেশ খৈতানকে বিদ্রূপ করে সেই দৈনিক নিবন্ধে লেখে 'অতি চালাকি' ১৫.১১.৮৭।

প্রসংগত বলা যেতে পারে এর আগে কোন মন্দির কর্তৃপক্ষই তাদের মন্দিরকে সতীমন্দির বলতে অস্বীকার করেননি। কিন্তু পরবর্তীকালে সবাই একই সুরে এই কথা বলতে থাকে।

ঠিক এই সময়ে আসরে আসে প্রাক্তন প্রাচীনপন্থী পত্রিকা। ১৪.১১.৮৭ তারিখে প্রাক্তন এম. পি. ও বিদগ্ধ পন্ডিত ঐ পত্রিকায় লেখেন : সতীমাহাত্ম্য প্রচার মানে সতীদাহমাহাত্ম্য প্রচার নয়। ব্যাপারটা ঘটেছে অজ্ঞতার ত্র্যহস্পর্শের ফলে। এক অজ্ঞ গবেষক (গো+এষক), দুই, প্রতিবেদক, তিন অজ্ঞ রাজনীতিক – এই ত্র্যহস্পর্শ।

লেখকের বক্তব্য এই সতী মন্দিরগুলো সতীদাহ মাহাত্ম্য প্রচার করে না। তাই হঠাৎ সতী মাহাত্ম্য প্রচার বন্ধ করার উৎসাহে লেগে যাবার কোন কারণ নেই।' তাঁর আরও বক্তব্য : সতী মাহাত্ম্য কথাটির অর্থ – 'স্বামীর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি, নিষ্ঠার সহিত স্বামীর সেবা এবং স্বামীর আজ্ঞা অনুসরণ'। এই মাহাত্ম্য প্রচারে কার কী আপত্তি থাকতে পারে ?

একই রচনায় লেখক সতীদাহ প্রসংগে বলছেন, 'এটা খুব একটা সুবুদ্ধিজাত নয়। প্রথাটির যথেষ্ট অপব্যবহারও হয়েছিল। ... লোভ স্বার্থপরতা থেকে সতীদাহ নিষ্ঠুর অমানবিক প্রথায় পরিণত হয়।' একেবারে শেষে লেখকের আবেদন : 'সমাজের স্বার্থেই সতীদাহ নির্মূল হোক, অক্ষুণ্ণ থাকুক সতী মাহাত্ম্য'।

পরদিনই ঐ পত্রিকা বিস্তৃতভাবে জানায় যে কিছু কিছু পত্রিকা 'সতীদাহের নামে সত্যাদাহ' করছে। তাদের বক্তব্য : এমনকি এই অবস্থায় কলকাতার মারোয়াড়ি সমাজ তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও পূজাপদ্ধতিতে সরকারি অনুপ্রবেশে ক্ষুব্ধ হয়ে এতদিনকার অর্জিত ধারণা পাল্টে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে, বামপন্থী সরকারের এই কি ধর্মনিরপেক্ষতার নমুনা ?'

যাই হোক, কোন বিতর্কে কান না দিয়ে সরকার মেলা মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। এমনকি মাইকের ব্যবহারও। ফলে ১৫.১১.৮৭ কলকাতায় সতীপুজো একেবারে ম্লান হয়ে গেল। পরদিন বিভিন্ন সংবাদপত্রে বেরোল সেই খবর।

খেলার দৈনিক বলে পরিচিত পত্রিকা লিখলো : মেলা বসেনি, মিছিল হয়নি, মাইক বাজেনি, মন্দিরে মন্দিরে পুলিশ।

সাহেবি পত্রিকা 'Sati rally, mela not held, police at temple.'

প্রাচীন পন্থী পত্রিকা : দুটি ক্ষণবিক্ষোভ ছাড়া সতীমন্দিরে পূজা শান্তিতে।

প্রাচীন পন্থী পত্রিকার প্রতিবেদকের কাছে স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা নাকি অভিযোগ করেন যে, এই মন্দির নিয়ে অযথা জল ঘোলা করা হয়েছে।

ঐ দৈনিক আরও জানায় যে, উত্তর কলকাতায় সতীমেলা কর্তৃপক্ষ পুলিশকে জোর ধোঁকা দিয়েছে। তারা ভোর চারটেয় কয়েকজন মিলে শোভাযাত্রা করে নিয়েছে। সেই মিছিলের ছবিও ছাপা হয়।

আশাকরি ওয়াকিবহাল পাঠক এই টুকরো মন্তব্যগুলোর মধ্য দিয়ে বুঝে নেবেন এই আধুনিক সতীবিতর্কে কে কোন ভূমিকা নিয়েছিল। □

সুজিত ঘোষ

ইঁদুরের বিদ্রোহ

ইঁদুর বাড়িতে রাখা দামী দামী বইপত্র, জামাকাপড় কেটে নষ্ট করে দেয়, ফসলের ক্ষেতে গিয়ে ফসল খেয়ে ফেলে, তাই ইঁদুরকে ধ্বংসকারী জীব হিসাবে আমরা চিহ্নিত করি। ইঁদুরের এই দুর্নামটা সত্যি সত্যিই প্রাপ্য। কিন্তু এই ইঁদুরের আর এক বিশেষণ মিলেছে বোম্বাই থেকে। সেটা হল 'বিদ্রোহী'। মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে কিন্তু ইঁদুর! হ্যাঁ ইঁদুররাও বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। আর তাদের বিদ্রোহের ফল যে কতটা মারাত্মক হতে পারে সম্প্রতি তার প্রমাণ পেয়েছেন বোম্বাই-এর বেশ কিছু লোক। সেখানে কিছুদিন ধরেই ইঁদুরের উপদ্রব বেড়েছিল। তাদের সেই উপদ্রবে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। বোম্বাই পৌর কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে ইঁদুর নিধনের কাজ শুরু করলেন। কদিনে প্রায় আড়াই লক্ষ ইঁদুর মারা হল। আর এটাই হল কাল। জীবিত ইঁদুর সমাজ ঘোষণা করলো বিদ্রোহ। স্বজাতি নিধনের প্রতিশোধ নিতে তারা মরিয়া হয়ে উঠল। এবার বাড়িতে জিনিসপত্র নষ্ট করা নয় ইঁদুরকুল এবার যেখানেই মানুষ দেখতে পায় সেখানে মানুষের হাতে পায়ে কামড়াতে শুরু করে দিয়েছে। ইঁদুরের কামড়ে সেখানে প্রতিদিন প্রায় দু হাজার করে মানুষ আহত হয়ে হাসপাতালে আসছেন চিকিৎসার জন্য। হাসপাতালে ইঁদুরে কামড়ানো রোগীদের চিকিৎসা করতে ডাক্তাররা বেশ হিমসিম খাচ্ছেন। তাঁরা এমন সাবধানবাণীও উচ্চারণ করেছেন যে, খুব শীঘ্রই হয়ত এই ইঁদুরের কামড় থেকে সেখানকার মানুষের মধ্যে ধনুষ্টংকার ও টাইফয়েড রোগ ছড়িয়ে পড়বে। ইঁদুররা কোন গোপন সভা করে এই বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কিনা জানা যায়নি। তবে তাদের বিদ্রোহ দমনে কর্তৃপক্ষ কী ব্যবস্থা নেয় তা দেখার।

কণ্ঠস্বরের বিচিত্র প্রতিযোগিতা

পৃথিবীতে অনেক রকমের প্রতিযোগিতার কথা আমরা শুনেছি। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কথা, ধূমপান প্রতিযোগিতার কথা, সংগীত, আবৃত্তি, নাটক প্রতিযোগিতার কথা প্রায়ই শোনা যায়। এই প্রতিযোগিতার খবর এখনো অনেকে পাননি। যাঁদের গলার স্বর খুব চড়া তাঁরা এই প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে দেখতে পারেন। কে জানে, হয়তো আপনাদের মধ্যে কেউ এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে পারেন। কী, জানতে চাইছেন, কোথায় এই প্রতিযোগিতাটা হয়? কথাটা অবশ্য এখন আর গোপন রাখা যাবে না। জাপানে প্রতি বছর এই প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। ১৯৮৬ সালের প্রতিযোগিতা সম্প্রতি শেষ হয়েছে। হয়ত আপনারা জানতে চাইবেন প্রতিযোগিতার ফলাফলটা কী হয়েছে? না, এক্ষেত্রে পুরুষদের প্রাধান্য কিন্তু এবার খর্ব করেছেন এক মহিলা। তিনি হয়েছেন মহিলা বিভাগে প্রথম। তাঁর কণ্ঠস্বরের মাত্রা শব্দমাপা যন্ত্রে ধরা পড়েছে ১১৫ ডেসিবল। অথচ পুরুষ বিভাগে যিনি প্রথম হয়েছেন তাঁর কণ্ঠস্বরের মাত্রা ১১৩ ডেসিবল। প্রথম স্থানাধিকারিণী মহিলার চেয়ে ২ ডেসিবল কম। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় পুরুষ প্রতিযোগীরা মহিলাদের কাছে হেরে গেছেন। এ থেকে কি এটাই প্রমাণিত হয় না যে, চিৎকার চেঁচামেচির ব্যাপারে মেয়েরা পুরুষের তুলনায় এগিয়ে আছেন? তা বলে যেন কেউ ভাববেন না মহিলারা বেশি ঝগড়াটে।

জনবিস্ফোরণ

সারা পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারটা আমাদের কাছে বিশেষ উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। সকলেই এখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে সচেষ্ট। সারা পৃথিবীতে জন্মহার যেভাবে বাড়ছে তাতে বর্তমান শতাব্দির শেষ নাগাদ জনসংখ্যা ছ'শো কোটিরও বেশি ছাড়িয়ে যেতে পারে। মার্কিন আদমসুমারি ব্যুরোর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, দু হাজার পঁয়ত্রিশ সালের মধ্যে ভারত জন্মহারের দিক থেকে চীনকে ছাড়িয়ে যাবে। বর্তমানে চীনে জন্মহার অনেক বেশি। জন্মহারের দিক থেকে এখন নাইজিরিয়া রয়েছে সারা পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থানে। ব্যাপারটা সত্যিই আশংকার। আর এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য যদি আমরা এখন থেকে আন্তরিকতার সংগে কাজ না করি, তবে পৃথিবীর সর্বত্র লোক গিজগিজ করবে। হয়তো বাড়িঘর করবার মত বিশেষ জমি আমরা পাবো না। যত্রতত্র আমাদের থাকতে হবে। জনসংখ্যা বিশারদরা এই আশংকা প্রকাশ করেছেন। তাদের আশংকা এই হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উন্নয়নের সুফল আমরা ততটা পাবো না। সুতরাং আর দেরি নয় -- পরিবার সীমিত রাখুন।

বৃক্ষমিত্র পুরস্কার

'চিপকো' শব্দটার আঞ্চলিক অর্থ হল 'জড়িয়ে ধরো, বাঁচাও'। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে এখন গাছ সংরক্ষণ আন্দোলনের সংগে কথাটা বিশেষভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এই গাছ সংরক্ষণ আন্দোলনের সংগে দেশের বেশ কিছু কর্মী জড়িত রয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার তাই স্থির করেছেন প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে গাছ সংরক্ষণ আন্দোলনের সংগে যাঁরা জড়িত তাদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিতে পুরস্কার দেবেন, পুরস্কারের নাম দেওয়া হয়েছে 'বৃক্ষমিত্র পুরস্কার'। বিভিন্ন রাজ্যে গাছ সংরক্ষণের কাজে নিযুক্ত লোকেদের ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নতুন দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে প্রথম বৃক্ষমিত্র পুরস্কার দিয়েছিলেন শ্রীরাজীব গান্ধী। মোট ৩১ জন পুরস্কৃত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের গৌরী দেবী। গৌরী দেবী তাঁর রাজ্যে নির্বিচারে গাছ কাটার বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। তারই স্বীকৃতিতে তিনি এই পুরস্কারটি পেয়েছেন।

ঘুমিয়ে বিচিত্র রোগে মৃত্যু

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অস্থায়ী শরণার্থী শিবিরে একটা অদ্ভূত ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। সেখানে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে যাওয়া শরণার্থীরা এই মারাত্মক রোগের শিকার হচ্ছেন। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে অনেকে সুস্থ শরীরে ঘুমোতে যাচ্ছেন, আর ভোরবেলায় দেখা যাচ্ছে তারা মৃত। কেউ ধরতে পারছেন না রোগটা কী? ঘুমের মধ্যে রোগীরা প্রাণ হারাচ্ছেন। ইতিমধ্যে ঐসব শরণার্থী শিবিরে অজ্ঞাত এই রোগে ১৩০ জনের মৃত্যু ঘটেছে। সবার মুখে একই কথা – রোগটা কী? রোগ না জানলে ডাক্তাররাই বা চিকিৎসা করবেন কী করে আর তার প্রতিষেধকই, বা পাওয়া যাবে কোত্থেকে? তবে রোগটা রোগীদের বেশিক্ষণ ভোগাচ্ছে না। শিবিরের লোকজনেরা একে নৈশাতংক বলে আখ্যা দিয়েছেন। মার্কিনিরা বলছেন, এটা তাদের দেশের রোগ নয়, এটা এশিয় মড়ক। এ নিয়ে এখন চলছে নানান টানাপোড়েন। আর প্রাণ হারাচ্ছেন নিরীহ শিবিরবাসীরা।

বিশ্বশান্তির জন্য

বিশ্বশান্তির জন্য সারা পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ দিকে দিকে সোচ্চার হচ্ছেন। এমনকি কিশোর কিশোরীরাও শান্তির জন্য কাতর আবেদন জানাচ্ছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ বছরের কিশোরী সামান্থা এই বিশ্বশান্তির জন্য তৎকালীন সোভিয়েত নেতা আন্দ্রে গোমিকের কাছে একটা চিঠি দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নে তার সেই চিঠিটা নিয়ে রীতিমত আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। বিশ্বশান্তির জন্য এরকম এক কিশোরীর এধরনের চিঠি লেখাটা বিরল ঘটনা। কিন্তু দুর্ভাগ্য সামান্থার। এর কিছুদিন পরে সে এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালো! সামান্থা নিহত হল বটে, কিন্ত বিশ্বশান্তির জন্য তার আকুল আবেদনের স্মৃতিকে জাগরুক রাখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অগাস্টাতে তৈরি করা হয়েছে তার একটা পূর্ণাবয়ব মূর্তি। তার হাত শান্তির প্রতীক একটা সাদা পায়রা ছেড়ে দিতে উদ্যত। তার পায়ের কাছে বিস্মিত দৃষ্টিতে বসে আছে একটা ভাল্লুক শাবক। সত্যি বিচিত্র মূর্তি বটে!

বিশ্বশান্তির জন্য জাপানের প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করতে হয়। এই বিশ্বশান্তির জন্য প্রার্থনাজানিয়ে ছোট ছোট শান্তি পিরামিড এখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। শংকু আকৃতির ৩ ইঞ্চির এই প্লাস্টিকের শান্তির প্রতীকটার উদ্ভাবক হল জাপান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই পিরামিড ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভারত হল ৬১ তম দেশ যে এই পিরামিডকে স্বাগত জানিয়েছে। জাপানের বিশ্বশান্তি প্রার্থনা সমিতি হল এর সংগঠক। দিল্লির কাছে ফরিদাবাদের এক জনশূন্য বনাঞ্চলে ইংরাজি ও হিন্দিতে বিশ্বশান্তির প্রার্থনা সম্বলিত এই প্রতীকটা রাখা হয়েছে। সেটিকে যখন সেখানে স্থাপন করা হয়, তখন জাপানি স্তোত্র পাঠ করা হয়েছিল। ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি।

সংকলন : বরুণ মজুমদার

চুরি দুর্নীতি গলা টিপে ধরেছে বেঙ্গল পটারিজের



একটি শিল্প সংস্থা বেঁচে থাকে তার দক্ষতায় এবং উৎপাদনের মধ্য দিয়ে। বেঙ্গল পটারিজের এই দুটি সামর্থই রয়েছে। অর্থের যোগান না থাকার জন্যই সংস্থাটি আর আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারল না। মালিকদের নিজেদের মধ্যেকার দলাদলিতে কোম্পানিটি যখন মাত্র দশ লক্ষ টাকার দেনার দায়ে ৭৬ সালে লিকুইডিসনে গেল তখনই শ্রমিক কর্মচারি আন্দোলনের চাপে ভারত সরকার এগিয়ে এলেন সংস্থাটির পরিচালনাভার গ্রহণ করতে। টাকা দিল কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প দপ্তরের অধীন তৎকালীন আই আর সি আই অধুনা যার নাম হয়েছে আই আর বি আই। বেশ ভালই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ কেন্দ্রীয় সরকার তার মত পালটে ফেললেন। ৮৭ সালের ১লা নভেম্বর আর তারা কোম্পানিটি চালাবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে নোটিশ জারি করেছেন। যাকে বলা হয় ডিনোটিফিকেসন।

কিন্তু কেন? ইউনিয়ন নেতারা কিন্তু এর যুক্তিতে অন্য কথা বলেছেন। বেঙ্গল পটারিজে এখন শ্রমিক কর্মচারির সংখ্যা প্রায় ৪৫০০। চারটি ইউনিয়ন। সিটু, এ আই টি ইউ সি, আই এন টি ইউ সি, এইচএম এস। চারটি ইউনিয়ন এই সাড়ে চার হাজার শ্রমিক কর্মচারীর জন্য একসাথে লড়ছে। যাচ্ছে একসঙ্গে ডেপুটেশনে দিল্লীতে। কিন্তু দিল্লীর অনমনীয় মনোভাবের কাছে চারটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নই পরাস্ত হয়েছেন। তবু দরবার চলছে। এগিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বেঙ্গল পটারিজকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য দফায় দফায় আলোচনা চালাচ্ছেন। কিন্তু আশু কোন ফল পাওয়া যায়নি। আই এন টি ইউ সি বাদে বাকী তিনটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন অভিযোগ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নির্বাচনী ক্ষেত্র আমেথিতে বেঙ্গল পটারিজের ধাঁচে একটি কারখানা গড়ে তোলার জন্য বিড়লাদের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। ঐ কারখানাটিকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার বেঙ্গল পটারিজের পরিচালনাভার ছেড়ে দিচ্ছেন বলে শ্রমিক কর্মচারিরা অভিযোগ করেছেন।

বেঙ্গল পটারিজ ভারতের শিল্প জগতে বিপ্লব এনেছে। তার ইতিহাস সুদীর্ঘ। প্রতিষ্ঠা ১৮৯৫ সালে। মালিকানা বাঙালীদের হাতেই প্রথমে ছিল। কিন্তু ১৯৩৫ সালে বেঙ্গল পটারিজ বাঙালীদের মালিকানা বদল হয়ে গেল। এলেন এম জি ভগৎ ৪০ শতাংশ শেয়ার কিনে। ষাট শতাংশ শেয়ার কিনে এলেন শ্রীরাম গ্রুপ। হাত বদল তার পরে আর হয়নি। মালিকদের পুত্র ও নাতিরা আসেন পরিচালনায়। কিন্তু শেষ রক্ষা আর করতে পারেননি তারা। ৬৪ সালে এম জি ভগতের জায়গায় নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে আসেন তার পুত্র জি কে ভগৎ। শোনা যায় এই সময় থেকেই শ্রীরামের দুই নাতি লালা চরতরাম এবং লালা ভরত রাম ৬০ শতাংশ শেয়ার থাকা সত্ত্বেও বেঙ্গল পটারিজকে বাঁচিয়ে রাখতে বিশেষ কোন উদ্যোগ নেননি। কোম্পানিটিকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কার কতটা উদ্যোগ সে প্রসঙ্গে না গিয়ে একথা বলা যায় যে মালিকদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্কলহ ছিল তীব্র। তা নাহলে ৭৬ সালে মাত্র দশ লক্ষ টাকার জন্য কোম্পানিটি দেউলিয়ার খাতায় নাম লেখাত না।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যখন এই কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং উৎপাদন চালু হয় তখন একে বলা হত 'পুতুল কল'। কারণ এখানে তৈরি হতো চীনা মাটির পুতুল। পরে তৈরি হতে আরম্ভ করে কাপ প্লেট ডিস অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে ক্রকারি। উৎপাদিত দ্রব্য ছিল উচ্চমানের। ৬১-৬২ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে বেঙ্গল পটারিজ শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের সম্মান পায়। ৬৪ সালেও কলকাতা বাণিজ্য মেলায় বেঙ্গল পটারিজ পায় কাপ। তৎকালীন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম জি ভগৎ ছিলেন একজন সিরামিক বিশেষজ্ঞ। তাঁর আমলে সংস্থাটির বাণিজ্য আসন ছিল শীর্ষে। ৬৪ সালে তিনি মারা যান তারপর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হন তার পুত্র জি কে ভগৎ। শুরু হয় বেঙ্গল পটারিজে অবক্ষয়। এখানকার সিটু ইউনিয়নের সভাপতি কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর বাদল কর এই জি কে ভগৎ সম্পর্কে বলেছেন তিনি শুধু অযোগ্য নন, চরম দুর্নীতিবাজও। দুর্নীতি ও অযোগ্যতার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে গেল। সেই প্রতিষ্ঠান শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার যখন পরিচালনভার নিলেন তখন সেই জি কে ভগৎকেই নতুন করে করা হল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। বাদল কর একটি সংবাদ দিয়েছেন যে জি কে ভগতের পিসি শ্রীমতী উষা ভগৎ প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে কাজ করেন।

কিন্তু এই জি কে ভগৎ যে দুর্নীতিপরায়ণ তার নজির আছে। সিটুর বাদল কর এবং এ আই টি ইউ সির তপন চট্টোপাধ্যায় জানান ৮৪ সালের জুন-জুলাই মাসে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর জি কে ভগৎ-এর বিরুদ্ধে পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাংক জালিয়াতির অভিযোগ আনে। পুলিশ তাকে এই অভিযোগে গ্রেপ্তারও করে। ইউনিয়ন নেতারা বুঝে উঠতে পারছেন না তারপরেও কেন্দ্রীয় সরকার কি করে জি কে ভগৎকে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের পদে রাখেন।

পশ্চিমবংগ থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের আচরনেও শ্রমিক কর্মচারিরা অবাক হয়ে গেছেন। সিটু ইউনিয়নের সভাপতি বাদল কর বলেন বেংগল পটারিজের ব্যাপারে দিল্লিতে বেশ কয়েকবার পশ্চিমবংগের এম পিদের বৈঠক ডাকা হয়। কিন্তু কংগ্রেস এম পি-রা উপস্থিত থাকেননি। কিছুদিন আগে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অশোক সেন এম পি দিল্লিতে পশ্চিমবংগের এম পি-দের একটি বৈঠক ডাকেন। সেখানে সর্বসম্মত প্রস্তাব নেওয়া হয় বেংগল পটারিজকে জাতীয়করণ করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সংগে যোগাযোগ করা হয়। প্রধানমন্ত্রীও বেংগল পটারিজ-এর নবজাগরনে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল কেন্দ্রীয় সরকার ডিনোটিফিকেশনের নোটিশ দিয়ে দিলেন। এর বিরুদ্ধে চারটি ইউনিয়নের পক্ষ কলকাতা হাইকোর্টে মহামান্য বিচারপতি অজিত সেনগুপ্তের এজলাসে আবেদন করা হয়। তার শুনানি হয় ১৬ নভেম্বর। ইউনিয়নগুলির পক্ষে লড়েন সোমনাথ চ্যাটার্জী ও তার দুই সহযোগি প্রণব চ্যাটার্জী ও সমরাদিত্য পাল। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কোন উকিল এদিন আদালতে হাজির ছিলেন না। মহামান্য বিচারপতি ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত শুনানী স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে টাটা ইকনমিক কনসালটেটিভ ফার্মের রিপোর্ট অনুযায়ি বেংগল পটারিজ চালু রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনাভার গ্রহণ করার পর বেংগল পটারিজকে সচল করতে এবং কিভাবে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করা যায় তার জন্য পাঁচটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিগুলি হল – গুপ্ত কমিটি, হীতেন ভায়া কমিটি, রামমূর্ত্তি কমিটি, মন্ডল কমিটি, টাটা কমিটি। রাজ্য সভার সদস্য গুরুদাস দাসগুপ্তর একটি প্রশ্নোত্তরে শিল্পমন্ত্রী ৮৭ সালের ৪ মে টাটা কমিটির সুপারিশ রাজ্যসভায় জানান। টাটা কমিটি বলেছে বেংগল পটারি একটি লাভজনক সংস্থা। নতুন করে কার্যকরি মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে বর্তমান উৎপাদিত দ্রব্য ছাড়াও উৎপাদনে নতুন দিক আনতে হবে। টাটা কমিটি বিদ্যুতের সাজ সরঞ্জামের অন্যতম অংশ ইনস্যুলেটর তৈরির কথা বলেন। যা বেংগল পটারি অনায়াসেই করতে পারে। এর বিরাট বাজার রয়েছে।

সাড়ে চার হাজার শ্রমিক কর্মচারি এবং তাদের পরিবারকে বাঁচাতে চারটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা যখন মরণপণ লড়ছে এবং দিল্লিতে দৌড়ঝাঁপ করছে তখন পশ্চিমবংগের মন্ত্রীদের ভূমিকা গৌণ থেকে গেছে। চলতি বছরের ৩০ অক্টোবর যখন দিল্লীতে শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী এবং সচিব পর্যায়ে ইউনিয়ন নেতাদের সংগে আলোচনা চলছে তখনও শিল্প মন্ত্রক বলে চলেছেন তারা 'বিষয়টি দেখছেন। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার ডিনোটিফিকেশনের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে ১৪ অক্টোবর। ঐ একই দিনে দিল্লিতে দুই মন্ত্রী অজিত পাঁজা এবং প্রিয় দাসমুন্সী ইউনিয়ন নেতাদের বলেছেন যাতে ডিনোটিফিকেশন না হয় সেজন্য তারা প্রধানমন্ত্রীর সংগে কথা বলবেন। সিটু নেতা বাদল কর বলেন দুই মন্ত্রী হয় এ ব্যাপারে কিছু জানেন না, নয়তো তারা মিথ্যা কথা বলেছেন।

এত টালমাটালের মধ্যেও চারটি ইউনিয়ন কিন্তু এক হয়ে বেংগল পটারিকে বাঁচিয়ে রাখতে লড়ছে। তাদের দাবি অবিলম্বে বেংগল পটারিকে জাতীয়করণ করতে হবে। প্রসংগত নব গঠিত অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনও এই লড়াইএ সামিল হয়েছে।

আবার কোম্পানির কথায় ফিরে আসা যাক। ৬৪ নাগাদ কোম্পানির আরও দুটি ফ্যাক্টরি গড়ে ওঠে। একটি ট্যাংরারই কাছে পাগলা ডাংগায়। এখানে ইলেকট্রিকের কাজের জন্য ব্যবহৃত ইনসুলেটর তৈরি হত এবং অপরদিকে তারাতলায় তৃতীয় ফ্যাকটরিটি গড়ে ওঠে। সেখানে জলছবি (কাপ, প্লেট ডিসে আঁকবার জন্য), প্লাস্টার অফ প্যারিস এবং বোন অ্যাশের কাজ হত। এ ভাবেই কোম্পানির ব্যবসা ৬০-এর দশকে ছিল বেশ রমরমা। সত্তরের দশকের গোড়া পর্যন্ত সংস্থার বাটিক বিক্রির পরিমান ছিল প্রায় ১৪ থেকে ১৫ কোটি টাকা।

কিন্তু ওই সত্তরের গোড়া থেকেই কোম্পানীর দুর্দিন শুরু। গোড়ায় এখানে ছিল শুধুমাত্র এ আই টি ইউ সির ইউনিয়ন। পরে ১৯৬২ সাল নাগাদ গঠিত হয় এইচএম এস বা হিন্দ মজদুর সভা। বেংগল পটারিজের এইচ এস এস এক সভাপতি ভজন দাশগুপ্তের মতে 'সত্তরের গোড়ায় যখন কংগ্রেস ঢুকতে চাইল তখন থেকেই গন্ডগোলের সূত্রপাত হয়। যদিও পরে ওদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়'।

সত্তরের দশকের গোড়া পর্যন্ত বিক্রির পরিমান সর্বাধিক হলেও '৭১ সাল থেকে কারখানা অশান্তির নানা কারণে বারেবারে বন্ধ হতে থাকে। '৭১ সালেই কারখানা ৭ মাস বন্ধ থাকে। '৭৪ সালে ৩ মাস। এরপর '৭৬ সাল থেকে টানা প্রায় ২২ মাস বন্ধ থাকার পর কোম্পানিতে মাল সরবরাহকারীরা ১০ লাখ টাকা অনাদায়ে আদালতে গেলে কোম্পানি 'লিকুইডেশন'-এ যায়। এর পর বছরই ১৫ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার কোম্পানির পরিচালন ভার হাতে নেন। ওই সময় স্বেচ্ছা অবসর নেন ৫০০ কর্মী এবং ১৯৭৭ মার্চ মাস থেকে উৎপাদন শুরু হয়। কেন্দ্রীয় সরকার যে বোর্ড গঠন করে দেন তাতে আই আর সি আই, আই বি আর ডি, বিভিন্ন অর্থলগ্নী সংস্থা,

পুতুল কলের ইতিকথা

প্রতিষ্ঠা ° ১৮৯৫ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের হাতে ('পুতুল কল' হিসেবে)

১৯১৭ : আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু হয়।

১৯৩৫ এম জি ভগত ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে কোম্পানিতে যোগদান করেন এবং ৪০ শতাংশ শেয়ার কিনে নেন। একই সংগে শ্রীরাম গ্রুপ ৬০ শতাংশ শেয়ার কেনেন। এই সময় থেকেই ক্রকারি উৎপাদন শুরু হয়।

১৯৬৪ ভগতের ছেলে জি কে ভগত কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হন।

১৯৭৬ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনভার হাতে নেন।

১৯৭৭ মার্চ পরিচালনভার হাতে নেয়ার পর উৎপাদন শুরু।

১৯৮৩ সমস্ত ইউনিয়ন এক যোগে প্রথম জাতীয় করণের দাবি করল।

১৯৮৩ কোম্পানি কন্দর সচল থাকতে পারবে এই নিয়ে প্রথম হিতেন ভায়ার নেতৃত্বে তিন সদস্যের কমিটি গঠন।

১৯৮৬ জুন টাটা ইকনমিক কন্সালটেন্সিকে নিয়োগ করা হয় ওই '৮৩ র উদ্দেশ্য নিয়ে।

১৯৮৬ জুন . টাটা ইকনমিক কন্সালটেন্সি প্রতিবেদন দাখিল করে।

১৯৮৭ : মে : বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৬১ জন সংসদ সদস্য রাজীব গান্ধীর সংগে দেখা করেন।

১৯৮৭ আগস্ট বেংগল পটারিজ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ শিল্পমন্ত্রী ভেংগল রাও এর সংগে দেখা করেন। তিনি আধুনিকীকরণ এবং উৎপাদন খাতে ১৫ কোটি টাকা দেওয়ার আশ্বাস দেন। সংগে এও বলেন এই সংস্থা কোনদিন বন্ধ হতে দেওয়া হবে না।

১৯৮৭ অক্টোবর ১৩ ভেংগল রাও ইউনিয়নগুলিকে ডি নোটিফিকেশনের সম্ভাবনার কথা জানান।

১৯৮৭ অক্টোবর ৩০ : ডিনোটিফিকেশন নোটিশ নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি কলকাতা হাইকোর্টে আসেন। ইউনিয়নগুলিও যায়। নোটিশ জারি করা বন্ধ হয়। পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয় ১৬ নভেম্বর।

১৯৮৭ নভেম্বর ১৬ আবার শুনানির দিন ধার্য হয় ১৬ ডিসেম্বর।

রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং জি কে ভগত একজিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে থাকেন। বেংগল পটারিজের এ আই টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক তপন চ্যাটার্জী বলেন, সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে সরকার সব জেনেশুনেও কেন ভগতের মত একজন দুর্নীতিবাদ লোককে একজিকিউটিভ ডিরেক্টর করলেন তা বলা যাচ্ছে না। প্রসংগত বলে রাখা ভাল শুধু শ্রী চ্যাটার্জী নন বহু কর্মীই মনে করেন শ্রী ভগত শুধু দুর্নীতি পরায়ণই নন অযোগ্য প্রশাসকও বটে। তা না হলে আজ কোম্পানির এই দশা হত না।

কোম্পানিকে সচল করার জন্য যে পাঁচটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল সে প্রসংগে ভজনবাবু বলেন, 'আমরা কখনই কমিটির লোকজনকে দেখিনি। তারা ছিলেন অদৃশ্য। এরপর পঞ্চম এবং সর্বশেষ কমিটি অর্থাৎ টাটা ইকনমিক কনসালটেন্সি গঠিত হয় ১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাসে। এবং তারা রিপোর্ট দেয় ১৯৮৬ সালের জুন মাসে। ওই বছরই ১৯ সেপ্টেম্বর শিল্প দপ্তরের সচিব এ ভি গোকক বেংগল পটারিজের সমস্ত ইউনিয়ন অর্থাৎ সিটু, আই এন টি ইউ সি, এইচ এম এস এ আই টি ইউ সি এবং অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক ডাকেন যেখানে তিনি কতকগুলি প্রস্তাব দেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল এক হাজারের মত কিছু কর্মীকে স্বেচ্ছা অবসর নেওয়ায় রাজী করানো। যার নাম দেওয়া হয় 'গোল্ডেন হ্যান্ড শেক' পদ্ধতি। অর্থাৎ যার যত বছর চাকরি আছে তার অর্ধেক বছরের মাইনে নিয়ে অবসর নেওয়া। অনেক ইউনিয়নের মতে এটা খোদ শিল্প মন্ত্রীরই প্রস্তাব ছিল। এই ইউনিয়নগুলি এই প্রস্তাবে বলে যদি কারখানা জাতীয়করণ করা হয় তাহলে তারা এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারে। কারণ ১৯৮৩ সাল থেকেই তারা জাতীয়করণের কথা বলে আসছিল। এরপর শ্রী গোকক 'ওয়েজ এবং ডি এ ফ্রিজ'এর কতকগুলি প্রস্তাব দেন। প্রত্যুত্তরে ইউনিয়ন নেতারা বলেন যদি ১. ১. ৮৭-র মূল্য অনুযায়ী আগামী তিন বছরে কাঁচা মাল এবং অন্যান্য জিনিসের দাম না বাড়ানো হয় অর্থাৎ যদি কোম্পানি একই দামে সব জিনিষ পায় তাহলে তারা ওই প্রস্তাব দুইটি মেনে নিতে পারেন। কিন্তু অদ্যাবধি সরকার এর একটিও পূরণ করতে পারেননি। ফলে এগুলি বাস্তবায়িত করার কোন প্রশ্ন ওঠেনি। তবে বেংগল পটারিজের কারখানায় গিয়ে দেখা গেছে হতোদ্যম কর্মীরা সব অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

এ বছর মে মাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রায় ৬১ জন সংসদ সদস্য ইন্দ্রজিত গুপ্তের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর সংগে দেখা করেন এবং তিনি জাতীয় করনের ব্যাপারে আশ্বাসও দেন।

শ্রী চ্যাটার্জী বলেন, এরপর ২৪ আগস্ট শিল্পমন্ত্রী ভেংগল রাও-এর সংগে এক বৈঠকে বেংগল পটারিজকে আধুনিকীকরণ এবং কাজ চালানর জন্য ১৫ কোটি টাকা দেওয়া সহ এই কারখানাটি ডি-নোটিফায়েড হতে দেওয়া হবে না বলে স্বয়ং শিল্প মন্ত্রীই জানান। অবশ্য ভজনবাবু দাবি করেন টাকার পরিমাণ আরও বেশী। শ্রী চ্যাটার্জী আরও বলেন, 'শ্রী রাও আশ্বাস দেন কোম্পানী কোনদিন বন্ধ হবে না। সংগে সংগে কোম্পানির মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানর আশ্বাসও দেওয়া হয়'। এরপর অবশ্য ২৫ সেপ্টেম্বর কোম্পানির মেয়াদ বাড়িয়ে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত করা হয়। এরই মধ্যে ১৩ অক্টোবর ইউনিয়ন নেতারা শ্রী রাও-এর সংগে দেখা করলে তিনি বলেন যে তারা যেন প্রধানমন্ত্রীর সংগে দেখা করেন কারণ পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে তিনি ৩০ অক্টোবর ডি-নোটিফিকেশন নোটিসে সই করতে বাধ্য হবেন। কারণ সংসদে এটা গৃহীত হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল শ্রী চ্যাটার্জী বলেন, 'আমরা খবর পেলাম শ্রী রাও গত ১৪ তারিখেই ডিনোটিফিকেশন নোটিসে সই করে দিয়েছেন'। যাই হোক, সব নেতারা খবর পেয়েই তড়িঘড়ি ২৩ অক্টোবর দিল্লিতে যান প্রধানমন্ত্রীর সংগে দেখা করতে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দেখা করেন না। এখানে বলে রাখা ভাল কথা প্রসংগে ভজনবাবু জানান, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী একবার আশ্বাস দিয়েছিলেন ৪ নভেম্বর '৮৪ তিনি বেংগল পটারিজ সম্পর্কে সব শুনবেন। হয়তবা তাঁর কিছু করার আগ্রহও ছিল কিন্তু তার আগেই ৩১ অক্টোবর তিনি প্রাণ হারান। তবে রাজীব গান্ধী হচ্ছে ঠিক তার উল্টো'। যাইহোক, ৩০ অক্টোবর শ্রী রাও-এর ওই নোটিস নিয়ে একজন দিল্লি থেকে এসে বিচারপতি মঞ্জুলা বসুর কোর্ট থেকে আদেশ বার করে নেন। কিন্তু তার আগেই ইউনিয়নগুলি বিচারপতি অজিত সেনের কোর্ট থেকে ওই নোটিসের স্থগিতাদেশ পেয়ে যাওয়ায় মঞ্জুলা বোসের জারি করা আদেশ কার্যকর হয়নি। মঞ্জুলা বোস নিজেই তা সংশোধন করে নিয়ে বলেন যে আগে থেকে জানা ছিল না বলে তিনি ওই আদেশ দিয়ে ছিলেন। পুনরায় এ ব্যাপারে শুনানি হয় ১৬ নভেম্বর। ওইদিন পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয় ১৬ ডিসেম্বর। শ্রী চ্যাটার্জী বলেন, অথচ ব্যাপার দেখুন, বেংগল পটারীজের মালের যে চাহিদা রয়েছে তা সহজেই বোঝা যায় একটা ঘটনার উদাহরণ দিলে। এ বছর মে-জুন মাস নাগাদ দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতের এজেন্টরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মাল ঘাটতির কথা জানিয়ে চিঠি দেন। 'তাহলে কেন বন্ধের প্রশ্ন আসছে' এর উত্তরে তিনি বলেন, 'আমরা যতদূর জানি প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্র আমেথিতে একটি পটারিজ কারখানা খোলা হচ্ছে। যার মালিক হবে বিড়লা গোষ্ঠী। আর তারই জন্য ঐ বেংগল পটারিজকে মারবার চেষ্টা। একই কথা অবশ্য ভজনবাবুও বলেন।

আই এন টি ইউ সি নেতা লালবাহাদুর সিং বলেন এত কিছু সত্ত্বেও কিছু কিছু মহল থেকে বেংগল পটারিজ বন্ধ করে দেবার এক গভীর এবং সুপরিকল্পিত চক্রান্ত দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। তিনি আরো বলেন কোম্পানিকে আই আর বি আই ৫২ কোটি টাকা এ পর্যন্ত বেতন দেবার জন্যে দিয়েছেন কিন্তু একসংগে ৩ কোটি টাকা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও দেওয়া হয়নি। বেংগল পটারিজের ভিৎ শক্ত করার জন্যে সেটাই ছিল বেশি জরুরী আই আর বি আই-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রয়াত তারকেশ্বর তেওয়ারিকে এ ব্যাপারে শ্রী সিং দায়ি করেন।

এদিকে সম্প্রতি কাগজে খবর বেরয় যে বেংগল পটারিজের জন্যে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সংগে সংগে এ আই টি ইউ সি পাওনা গন্ডার দাবি নিয়ে লড়াই শুরু করে। ফাইনান্স কণ্ট্রোলারের ঘরে ঢুকে তারা ভাঙচুর করে। এমনকি ফার্নেসের তাপমাত্রা কমিয়ে দিয়ে উৎপাদনে ক্ষতি করে এই খবর কেন্দ্রীয় সরকারের কানে গেলে তারা আর এই কোম্পানির দায় নিতে অস্বীকার করে পরিভাষায় তাকেই বলা হয় ডিনোটিফাই করা। অথচ মজার ব্যাপার গত পাঁচ বছর এই কোম্পানিতে কোন কাজ না হলেও সবাই বেতন পেয়ে গেছেন। পাঁচ বছর পর সবে মাত্র কোম্পানি একটি ২০ লাখ টাকার অর্ডার পেয়েছিল আর ঠিক তখনই কারখানাতে অন্তর্ঘাত করা হল।

এই সমীক্ষা থেকে পরিস্কার বোঝা যায় '৮৪ সাল থেকে আই আর বি আই শুধুমাত্র কর্মীদের মাস মাইনে এবং গাড়ির তেল কেনার টাকা দিচ্ছে। কিন্তু কাঁচা মাল কেনার জন্য কোন টাকাই আর দিচ্ছে না। ফলে একদিকে যেমন কর্মীরা কাজ করার তীব্র ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বসে বসে মাইনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন তেমনি উৎপাদনও বলতে গেলে শূন্যতে নেমে গেছে। যদি আই আর বি আই কাঁচা মাল কেনার টাকা দিত তাহলে বেংগল পটারিজ লাভের মুখ না দেখলেও লোকসানের বহর অনেক পরিমাণে কমে যেত এখন যেটুকু কাজ হচ্ছে তা মূলত আসছে আই টি ডি সি এবং অন্যান্য কয়েকটি কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে। যদিও বলে রাখা প্রয়োজন বাজারে বেংগল পটারিজের মালের বিরাট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার কেন এগিয়ে আসছে না সেটাই সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার ☐

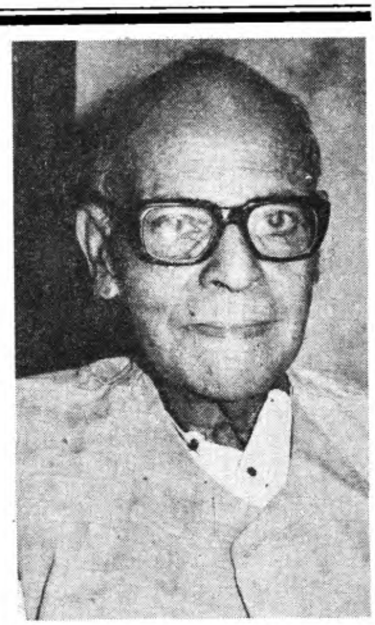
উজ্জ্বল পাল, দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়, নিরুপম চৌধুরি

দুই জনপ্রিয় টি ভি সিরিয়াল রামায়ণ ও বাহাদুর শাহ জাফরকে নিয়ে সম্প্রতি বিতর্কের ঝড় তুলেছে ইতিহাস সংসদ। মৌলবাদী গন্ধ খুঁজে বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে ওই দুটি সিরিয়াল। ইতিহাস সংসদের ওই দাবি কতটা যুক্তিযুক্ত, সে ব্যাপারে বিদগ্ধ মহল কি ভাবছেন, তা খতিয়ে দেখতেই এই একান্ত সাক্ষাৎকার। প্রথমটি ইনস্টিটিউট অব হিসটোরিকাল স্টাডিজের অধিকর্তা প্রবীণ ঐতিহাসিক নিশীথরঞ্জন রায়ের। দ্বিতীয়টি জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা ডঃ অশীন দাশগুপ্তের।

'কোথায় মৌলবাদ, বড়জোর মোটা দাগের বলা চলে'

ইতিহাসের রিসার্চ পেপার আর ঐতিহাসিক ঘটনা বা পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে করা টি ভি সিরিয়ালের মধ্যে উদ্দেশ্যের দিক থেকেই মৌলিক তফাৎ রয়েছে। জনশিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে ইতিহাসের গায়ে কল্পনা বা আবেগের রং লাগাতেই হয়। এতে আপত্তি করার কোনো কারণ নেই। ঐতিহাসিকরা তাঁদের জগৎ নিয়েই থাকুন না কেন। স্বাধীনতার পর থেকে এতদিনের মধ্যে জনশিক্ষার জন্যে তাঁরা কতটুকু করেছেন? যদি তাঁরা এ বিষয় নিয়ে ভাবতেন তাহলে এতদিনে জনসাধারণের সংগে তাঁদের যোগাযোগের মাধ্যম গড়ে উঠত। তাঁরা কি তা করেছেন? আমি বলব, তাঁরা এখনো বই ছাড়া অন্য কিছু ভাবুন। ইতিহাস কি সবসময় বই পড়েই জানতে হবে? এই চল্লিশ শতাংশের বর্ণপরিচয়ের দেশে এত বড় জনসমষ্টিকে আলোকিত করার জন্য তথ্যচিত্র, ভিডিও, ম্যাজিক লণ্ঠনের মত মাধ্যমের কথা ঐতিহাসিকদেরও ভাবতে হবে। এবং জনসাধারণের কাছে গ্রহণীয় করে তোলার স্বার্থে ইতিহাসের কথা বলতে হবে মোটা দাগ দিয়েই।

কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন কলকাতার ইনস্টিটিউট অব হিসটোরিক্যাল স্টাডিজের অধিকর্তা প্রবীণ ঐতিহাসিক নিশীথরঞ্জন রায়। সম্প্রতি ইতিহাস সংসদের পক্ষে এক বার্তায় দূরদর্শনের দুটি জনপ্রিয় সিরিয়াল – 'রামায়ণ' ও 'বাহাদুর শাহ জাফর' প্রচার সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন। বলা হয়েছে এই দুটি প্রযোজনাতেই মৌলবাদের গন্ধ আছে। এই বিষয়েই প্রবীণ ঐতিহাসিক অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায় তাঁর মতামত জানান। তিনি



নিশীথরঞ্জন রায় : মৌলবাদী নয় মোটা দাগের

স্পষ্ট বলেন, এই দুটিতেই মৌলবাদী চিন্তার কোন গন্ধ নেই। ইদানিং সবকিছুতেই মৌলবাদের ভূত দেখানো হচ্ছে। এটা অবশ্যই বাড়াবাড়ি। 'হিন্দু' পরিচিতি নিয়ে যে বাড়াবাড়ি, এটা নিয়েও তাই। অথচ প্রশ্ন জাগে, বিশুদ্ধ অমৌলিবাদী চিন্তা বলে কিছু আছে কি?

প্রসংগের গণ্ডি না রেখে ভারতের জাতীয়তা ও সংস্কৃতির গভীর বিশ্লেষণ টেনে অধ্যাপক রায় বলেন, ভৌগোলিক ভারতের অধিবাসীদের ভারতবাসী হিসেবে কি আদৌ কোন স্বকীয়তা আছে? আমাদের কি কখনো তেমন নির্দিষ্ট পরিচয়ের সীলমোহরে ভূষিত করা হয়েছে? গ্রীসে প্রাচীন যুগে নগররাষ্ট্রের সময়ে রাষ্ট্রের সংখ্যা তিনশোও ছিল। কিন্তু তাদের সূত্র ছিল ভাষা এবং ধমনীতে বহমান রক্তের মিল। তাই ওরা যখন বিশ্বজয়ে বেড়িয়েছে তখন সংগে নিয়ে গেছে অবিচ্ছিন্ন গ্রীস সংস্কৃতি। কাজেই প্রমাণ হয় রাজনৈতিক মিল ছাড়াও সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্ভব। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে ঠিক এমনটা ঘটেনি। ভারতীয় সংস্কৃতির উৎসে দেখতে পাই ভারতবাসীদের আরেকটা পরিচয় 'হিন্দু'। এই 'হিন্দু' কথাটাই যত গোলমাল বাধিয়েছে। তখন তো 'হিন্দু' বলতে একটা দেশের ভৌগোলিক গণ্ডির মানুষকেই বোঝাত। 'ভারতবাসী' কথার সমার্থক ছিল 'হিন্দু' ' সে যে ধর্মেরই হোক না কেন। কিন্তু মুসলীম রাজশক্তির সময় এই পরিচয় আসল মোড় নিল। শক-হূনদল কিন্তু সত্যিই মিশে গেছিল এই সংস্কৃতির দেহে। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'সাংগীকরণ' বলেছেন। কিন্তু মুসলিম আমলে আমাদের 'হিন্দু' ছুচিবাই জাগল। মুসলিমরাও আমাদের পরিচয় দিল 'হিন্দু' বলে। সেই থেকে 'হিন্দু' আর জাতিবাচক না থেকে হয়ে উঠল ধর্মবাচক। অথচ এখন জাতীয় মূল্যবোধ সংহত করতে চাইলেই দেখানো হচ্ছে 'হিন্দু' পানিক্কর ঠিকই বলেছিলেন যে, গৌতম বুদ্ধ যদি এখন আবার পৃথিবীতে আসেন তাহলে তিনি তাঁর শিষ্যদের চিনতে পারবেন এবং শিষ্যরাও তাঁকে চিনবেন। কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট পৃথিবীতে এলে তাঁর শিষ্যদের চিনতে পারবেন না, শিষ্যরাও চিনতে পারবেন না যীশুকে। আমাদের অবস্থাটা হয়েছে এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তের মত।

নিশীথরঞ্জন রায় বলেন, স্বীকার করি বা না করি, পোশাক, ভাষা বা রক্ত কোনটাতেই ভারতবাসীদের মধ্যে মিল নেই। ঐক্যের এসব উপাদান আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যও নয়। আমাদের জাতীয় একতার ক্ষীণ সূত্র এখনো ঐ সংস্কৃতিই। এই সংস্কৃতিকে যদি ভারতীয় বলি, তাহলে পুরাণ বা রামায়ণ মহাভারতে হিন্দুর ছোঁয়াচ ধরাটাকে বিকৃতিই বলব। তবে হ্যাঁ, রামায়ণে যা যা আছে তার সবটাই কি মেনে নেব? নিশ্চয়ই নয়। যা আপত্তিকর তা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়। একইভাবে ইলিয়ড-ওডিসিতেও কি আপত্তিকর কিছু নেই? বিশেষ করে যেখানে উপনিষদের কোন আবেদন নেই সাধারণ জনসমষ্টির কাছে, হিন্দু রেনেসাঁর প্রভাব তুচ্ছ করে মূর্তিপূজায় এখনো অগাধ আস্থা এবং রামায়ণ আজো জনশিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, সেখানে বিকল্প কিছু না দিয়ে রামায়ণে আঘাত হানব কেন? বলব – ভালটা নাও, মন্দটা নয়। শাশ্বত মূল্যবোধ

যেমন। কিন্তু তা বলে রামের মত আচরণ কর, হুবহু রামকে মানো একথা বলা নয়। তাহলে নিজেদের অস্বীকার করাই হবে। তাছাড়া রামায়ণের প্রচার সম্পর্কে যদি কেউ বলেন এতে পুরুষতন্ত্রের জয়গান গাওয়া হচ্ছে তাহলে তা মানতে রাজী আছি। কিন্তু মৌলবাদী বলতে নারাজ।

'বাহাদুর শাহ জাফর' সিরিয়াল প্রসংগে শ্রী রায় বলেন, এখানেও মৌলবাদী প্রবণতা আছে বলে মনে করি না। ইতিহাস বিকৃত করার অভিযোগও টেকে না। কারণ আমরা যখন কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বা আন্দোলন বা নিছক সময়কে ধরতে বা সেই সম্পর্কে প্রচার করতে চাই তখন মূল ঘটনা অবিকৃত থাকে না। চন্দ্রগুপ্ত বা শাজাহানের মত নাটকে কি অতিকথন অতিবর্ণন নেই? গবেষকদের কাছে এইসব ঘটনার প্রকাশ হবে একরকম এবং সাধারণের কাছে একরকম। একেকটি ঐতিহাসিক বক্তিত্ব সম্পর্কে যে ইমেজ গড়ে ওঠে তা নিছক ইতিহাসকে কেন্দ্র করেই হয় না। হয় মানুষের আশা আবেগ আর স্বপ্ন কল্পনা নিয়ে। জনশিক্ষার উপাদানে এসবই কাজে লাগাতে হয়। বাহাদুর শাহকে মেনে নিতে এ জন্যই অসুবিধে হয় না সাধারণ মানুষের। যেমন অসুবিধে হয় না সিরাজউদ্দৌলাকে মানতে। সিরাজকে নিয়ে আমরা যেভাবে মাতামাতি করেছি তাতে ইতিহাস কতটুকু আছে? আজাদ হিন্দ ফৌজের উদাহরণও আনা যায়। রাজনীতিগতভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের কত সমালোচনাই তো হয়েছে। কিন্তু এই ফৌজের সংগে মিশে আছে যে হিন্দু-মুসলমান তথা সব সম্প্রদায়, সব ধর্মের মানুষের একতার আবেগ, তাকে অস্বীকার করব কী করে? সিপাহী বিদ্রোহের কথাও আসে। ১৮৫৭-র ঐ ঘটনা আদৌ সিপাহী বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থাকে থাকুক। কিন্তু ঐ বিদ্রোহের বাতাবরণে বা তাকে কেন্দ্র করে জমে থাকা আবেগকে কি অস্বীকার করা যায়? আর জনশিক্ষার মাধ্যমে আবেগের কল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়তে গেলেও মানুষের মনের কাছাকাছি যেতে হবে এভাবেই।

নিশীথরঞ্জন রায় তাঁর বক্তব্যের শেষপ্রান্তে এসে বলেন, আমি বলব বরং ঐতিহাসিকরা কিছু গঠনমূলক কাজের কথা ভাবুন। ইতিহাস সংসদ রাম জন্মভূমি সংক্রান্ত বিতর্কের প্রশ্নে অযোধ্যায় একটি প্রতিনিধিদল পাঠান। বাবরি মসজিদ না রাম – জন্মভূমি এ নিয়ে বিতর্কের সময় রামায়ণ দেখানো ঠিক হচ্ছে না – এসব কথাও যেমন অর্থহীন, তেমনি এই বিতর্কের দোহাই পেড়ে কেউ যদি এসময় বাবরের জীবনী নিয়ে কোন তথ্যচিত্র করার আয়োজনকে রুখতে চায় সেটাও হবে অন্যায়। কেননা বাবরের জীবনাশ্রয়ী কোন ঐতিহাসিক তথ্যচিত্র করতে বাবরি মসজিদ প্রসংগ তো অবশ্যই আসতে পারে। ক্ষতি কী? সেক্ষেত্রে মূল বিচার্য হবে মোগল সাম্রাজ্যের প্রথম পুরুষ বাবরের অসাধারণ বর্ণিল চরিত্রের রূপায়ণ, অন্য কিছু নয়। দুটোকে দুভাবে দেখতে হবে। রামায়ণ প্রসংগেও সেকথাই শেষ কথা। □

দেবারুণ রায়

'রামায়ণের গায়ে বোম্বাই ফিল্মের ছাপ'

এ প্রসংগে বিশেষ সাক্ষাৎকারে ঐতিহাসিক ও কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা ডঃ অশীন দাশগুপ্ত বলেন, রামায়ণ ও বাহাদুর শাহ জাফর সিরিয়াল দুটি তুলে দেওয়ার জন্য ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস তাদের কোন মতামতই দেননি। আমি যতদূর জানি ইতিহাস কংগ্রেস রামায়ণ বা বাহাদুর শাহ জাফর সম্পর্কে বিশেষভাবে কিছু উল্লেখই করেননি। আমি নিজে ইতিহাস সংসদের প্রস্তাব পড়ে দেখেছি। তাতে এ ধরনের কোন কিছুর উল্লেখ নেই। তবে হ্যাঁ, বলা হয়েছে, ঐতিহাসিক কোন ঘটনাকে বিকৃত করে দেখানো চলবে না। বা তাকে বিশেষ কোন ধর্মের স্বার্থেও ব্যবহার করতে দেওয়া মোটেই উচিত হবে না। ঐতিহাসিক ঘটনাকে বেতার বা দূরদর্শনে প্রচার করার সময় হতে হবে বস্তুনিষ্ঠ। যা সহজ, যা সত্য তার পথ ধরেই ঘটনাবলীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এর সংগে কোনরকম আপসের প্রশ্ন নেই। ডঃ দাশগুপ্ত বলেন, পত্রিকায় কী বেরিয়েছে তা আমি জানি না। বা এই ধরনের কোন খবরও আমার চোখে পড়েনি।

আমি আবারও বলছি ইতিহাস সংসদ এ ধরনের কোন মতামতই জানাননি। তবে সত্যিই যদি রামায়ণ সিরিয়াল বন্ধ করে দেওয়ার কথা ইতিহাস সংসদের কেউ কখনো বলে থাকেন তা মোটেই ঠিক হয়নি। কারণ, রামায়ণ ইতিহাস নয়। এর পেছনে ঐতিহাসিক কোন সত্যাসত্যও নেই। নেই কোন তথ্য ও যুক্তিনির্ভর ঘটনাবলী। এই অর্থে



অশীন দাশগুপ্ত : ইতিহাসের বিকৃতি

রামায়ণ শুধুই একটি ধর্মীয় গ্রন্থ। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কেই তাদের মতামত জানাতে পারেন। ধর্মীয় গ্রন্থ সম্পর্কে নয়।

নির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রামায়ণ সিরিয়াল আমি সাধারণত দেখি না। তবে হ্যাঁ, একদিনই দেখেছি। সেদিন রাম বালিকে বাণ মেরে হত্যা করেছেন এবং বালির স্ত্রী তারাকে সান্ত্বনা দেওয়ার সময় বালি হত্যার পেছনে নানান যুক্তি খাড়া করে নিজের দোষ ঢাকার চেষ্টা করেছেন। রামের এই ব্যাপারটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। তিনি বালিকে হত্যা করে অত্যন্ত অন্যায় করলেন। আর পরক্ষণেই কিনা নিজেকে নির্দোষ হিসেবে তুলে ধরলেন। এর ব্যাখ্যা! রামায়ণ গোঁড়া ধর্মীয় গোছের কিনা সে ব্যাপারে কিছু বলব না। কিছু বলতেও চাই না। তবে একটা কথা বলব, রামায়ণ সিরিয়ালটির গায়ে বোম্বের ফিল্মি ঢং-এর ছাপ ছোপ। নাচ-গান, নানান রং ঢং।

বাহাদুর শাহ জাফর সিরিয়াল তুলে দেওয়ার ব্যাপারে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস সত্যিই যদি কিছু বলে থাকেন তা কতখানি যুক্তিযুক্ত? এ প্রশ্নের জবাবে ডঃ দাশগুপ্ত বলেন, দেখুন বাহাদুর শাহ জাফর একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। এই সিরিয়াল তুলে দেওয়া সম্পর্কে ইতিহাস সংসদ যদি সত্যিই কিছু বলে থাকেন তা অনুচিত হয়নি বলে আমি মনে করি। কারণ, এই সিরিয়ালে এমন কিছু দেখা গেছে যা হয়তো গোঁড়া বলে মনে হতেও পারে। রামায়ণ ইতিহাস নয় বলেই এই সিরিয়াল সম্পর্কে কিছু বলা ঠিক হবে না।

কিন্তু আপনি কি বাহাদুর শাহ জাফর সিরিয়ালটি দেখেছেন? এর কোনও অংশ বিশেষ আপনার গোঁড়া বলে কি মনে হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তরে কিছুটা চিন্তিত হয়ে ডঃ দাশগুপ্ত বললেন, না বাহাদুর শাহ জাফর আমি দেখিনি। তাই বলতেও পারব না এর কোন অংশ বিশেষের উপস্থাপনা ঠিকভাবে হয়েছে কি হয়নি। □

সুমন গুপ্ত

কিশোর : চিরকিশোর



একজন মানুষের গল্প বলি শুনুন : যিনি একটা পাঁচতলা বাড়ি বানাতে চেয়েছিলেন নিজের বসবাসের জন্য। পাঁচতলা কেন, যে মানুষটির কথা শুরু করেছি – তিনি পঞ্চাশটা দশতলা বাড়ি তৈরি করার ক্ষমতা রাখতেন। তবু তাঁর সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল। কেন ?

কোন এঞ্জিনিয়ারই যে তাঁর সেই স্বপ্নের বাড়িটা তৈরি করে দিতে এগিয়ে এল না। অথচ দেখুন, সাধ তাঁর এমন আর কীই বা বেশি ছিল ! তিনি চেয়েছিলেন সেই বাড়িটিতে ওঠার জন্য কোন সিঁড়ি থাকবে না। জানলা দিয়ে নামানো থাকবে দড়ি। সেই দিয়ে ওঠানামা করতে হবে।

সাধ তাঁর অপূর্ণ রয়ে গেল। তা না হলে কতই না ইচ্ছা ছিল তাঁর – সেই সাধের বাড়িটিকে ঘিরে। যেমন বাড়িতে বৈঠকখানাটি হবে আসলে একটি পুকুর। তাতে ভাসতে থাকবে চেয়ার, টেবিল, কোচ-সোফা। আর অভ্যাগতদের জন্য বেয়ারা চা নিয়ে আসবে নৌকো বেয়ে।

এই বাড়িটা তৈরি হল না বটে কিন্তু তাঁর বাড়িতে আসা অভ্যাগতদের জন্য নানারকম পিলে চমকানো উপাদান মজুত ছিল যথেষ্টই। যেমন ধরুন কেউ এসেছেন তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে। ভেতরে খবর গেল। ঘন্টার পর ঘন্টা বসে আছেন সাক্ষাৎপ্রার্থী, কিন্তু গৃহস্বামীর দেখা নেই। সাক্ষাৎপ্রার্থীর ধৈর্যচ্যুতির উপক্রম। এহেন সময়ে ঠিক তাঁর ঘাড়ের কাছে একটি কঙ্কাল হা-হা করে হেসে উঠল এবং কঙ্কালটির ঠিক পেছন থেকে তিনি লাফ দিয়ে পড়ে সাক্ষাৎপ্রার্থীর মুখোমুখি হলেন।

যদি গল্পই শুরু করি, তবে এই মানুষটিকে ঘিরে এত গল্প আছে যে শুনিয়ে শেষ করা যাবে না। সেদিন তাঁর শুটিং ফ্লোরে ডিরেক্টার, প্রোডিউসার, হিরোইন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি পদধূলি দিলেই ফ্লোরের লাইট অন হতে পারে। ট্রাকের উপর স্টার্ট করতে পারে ক্যামেরা। তিনি এলেন এবং সঠিক সময়েই এলেন। কিন্তু এ কী !

তাঁর হাফ গোঁফ, কামান এবং মুখের একদিকে মাত্র মেক-আপ নেওয়া।

সবার চক্ষু চড়কগাছ।

ফটো : শ্রী সুবিনয় কার্টুন : গৌতম দাশগুপ্ত

বিরক্ত প্রোডিউসার জানতে চাইলেন কী হল ব্যাপারটা!

উনি অম্লান বদনে উত্তর দিলেন, আজ্ঞে এখনো পর্যন্ত আপনি অর্ধেক পয়সা দিয়েছেন, তাই হাফ মেক-আপ। ফুল পেমেণ্ট তো ফুল মেক-আপ।

হ্যাঁ, পয়সার ব্যাপারে বড় টনটনে জ্ঞান ছিল তাঁর। আর একদিনের গল্প শুনুন। যাঁর কথা বলছি তিনি শুধু ফ্লোরে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয়ই করেননি, ছায়াছবিতে নেপথ্যকণ্ঠে গেয়েছেন হাজার হাজার গান। এমনই এক গান রেকর্ডিং-এর দিন। রিহার্সাল সম্পূর্ণ হল। মিউজিক ডিরেক্টার বললেন, রেডি ফর টেক। সবাই কাঁচের ঘরের বাইরে চলে এলেন। মিউজিক ডিরেক্টার ইশারা করলেন, গান শুরু করতে। কিন্তু কোথায় কী! উনি কাঁচের বাইরে তাঁর বিশ্বস্ত আদুরে আবদুল ভাইয়ের দিকে চেয়ে আছেন। প্রোডিউসার পুরো পেমেন্ট ডাউন করলে আবদুল ভাই বুড়ো আঙুল উঁচু করে ইশারা করে। তবেই উনি ফাইনাল টেকের সময় গলা খোলেন। আর আবদুল ভাই বুড়ো আঙুল নিচু করলে বুঝতে হবে এখনো পুরো পেমেণ্ট হাতে আসেনি।

তা সেদিন কী হল, আবদুল ভাই কোন ইশারাই করছে না। না, থামস আপ, থামস ডাউন। ওদিকে উনিও গান শুরু করতে পারছেন না। সবাই হতচকিত, কী হল ব্যাপারটা! শেষে আবদুল ভাই কাঁচের ঘরে ঢুকে তাঁর কানে কানে বলে এল, স্যার, এ তো আপনার প্রোডাকশনের ছবির গান টেক হচ্ছে। আপনিই প্রোডিউসার। থামস আপ ডাউন আর কী করব!

কী মনে হয় মানুষটাকে? পাগল! হ্যাঁ, মধুবালা অন্তত তাই তো বলেছিলেন। মনে পড়ে চলতি কা নাম গাড়ি ছবির কথা। উনি সেই ছবির নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। মধুবালার অনুরোধে মুরগী ধরতে গিয়ে উনি পিছলে পড়ে গেছেন। মধুবালা গিয়ে তুললেন, হাল ক্যায়সা হ্যা জনাব কা! উনি অপ্রস্তুত গলায় উত্তর দিলেন, এমনি পিছলে পড়ে গেছি। ব্যাপার এমন গুরুতর কিছু নয়। মধুবালা সেই মুহূর্তে প্রেমে পড়ে গেছেন মানুষটার। প্রেম-প্রশ্রয় আর ঠাট্টার গলায় উনি গাইছেন, পাগলে আরে পাগলে।

এবার নিশ্চয়ই আর বলে দিতে হবে না কোন মজার আর পাগল মানুষটার রূপকথা শুরু করেছিলাম আমরা। হ্যাঁ, হিন্দি ছায়াচিত্র দুনিয়ার সবচেয়ে বিতর্কিত আনপ্রেডিক্টেবল চরিত্র – যাকে এক কথায় প্রকাশ করতে ইংরেজি 'জিনিয়াস' শব্দের কাছাকাছি আর কোন শব্দ খুঁজে পাওয়া ভার, সেই কিশোরকুমারের।

১৩ সংখ্যাটি নিজেকে আর একবার সন্দেহাতীতভাবে নিজেকে অপয়া প্রমাণ করে গত অক্টোবর মাসে আলটপকা তাঁকে তুলে নিয়ে গেলেন আমাদের মাঝখান থেকে। সামান্য বুকের ব্যথা টের পাচ্ছিলেন সকালের দিকে – কিন্তু ডাক্তার ডাকারও সময় না দিয়ে এই আগাগোড়া আনপ্রেডিক্টেবল মানুষটি সেদিন আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়ে থামস আপ দেখিয়ে দিব্যি বিদায় নিলেন।

মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়ার অ্যাডভোকেট কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র কিশোরকুমারের দাদা অশোককুমার ভারতীয় ছায়াছবি মহলে সর্বজন শ্রদ্ধেয় চরিত্র। অশোককুমার তাঁর আমলে ছিলেন বোম্বের ডাকসাইটে এক নম্বর হিরো। সুদূর খাণ্ডোয়া থেকে কিশোরকুমার তাঁর দাদা অশোককুমারের কাছে এসেছিলেন কিন্তু সিনেমায় অভিনয় বা পার্শ্ব-গায়ক হবার স্বপ্ন নিয়ে নয়। সেই সময় কিশোরকুমারের

চলতি কা নাম গাড়ি : স্ত্রী মধুবালা এবং ভাই অনুপের সঙ্গে



ফটো : শ্রী সুবিমল



ফটো : শ্রী সুবিমল

পাহাড়ি সান্যালের গান শুনছেন

আইডল ছিলেন কে এল সাইগল। এই সাইগলের সঙ্গে একবার দেখা করার বাসনায় তিনি বোম্বে এসেছিলেন। সাইগলের গানের তিনি তখন অন্ধ ভক্ত। অবশ্য গান ছিল তাঁর রক্তেই। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন পড়াশুনা কিছু তার ভাললাগত না। কলেজে পড়ার সময় তিনি 'ম্যালথ্যুসিয়ান থিয়োরি অব পপুলেশন'কে সুরে সাজিয়েছিলেন। তারপর কী করে যেন তিনি নায়ক এবং গায়ক হয়ে গেলেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন অভিনয়কে কখনই তিনি তেমন গুরুত্বসহকারে নেননি। বলেছেন, অভিনয়ের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি ঘৃণা করেছেন। ফ্লোরে ক্যামেরার সামনে প্রতিটি মুহূর্তে তিনি হাঁফিয়ে উঠেছেন। এবং প্রতি মুহূর্তে মতামত ভেঁজেছেন কী করে অলীক, বন্ধুহীন আগাগোড়া পেশাদারী এই জগৎ থেকে পালিয়ে যাওয়া যায়। অথচ তাঁর এত অনীহা সত্ত্বেও ভারতীয় ছায়াছবির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হিট কয়েকটি ছায়াছবির তালিকা কিন্তু তাঁরই দখলে। যেমন ধরুন, নিউ দিল্লি (১৯৫৬), ভাইভাই (১৯৫৬), আশা (১৯৫৭), চলতি কা নাম গাড়ি, লেড়কি, পহলী ঝলক, প্যার ফিরে যা, দিল্লি কা ঠগ, ইলজাম, চন্দন, বেকুফ, শারারত প্রভৃতি সেই সময়ে বোম্বের এক নম্বর হিরো দিলীপকুমারকেও তিনি প্রায় ছাড়িয়ে উঠছিলেন চাহিদায় আর ঠিক এই সময়ই ঠাট্টা মস্করা আর চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়ে প্রোডিউসারদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে তিনি স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছিলেন ছায়াছবির দমবন্ধকরা অলীক মুহূর্ত থেকে।

কেন?

না, তার কোন জবাব কিশোরকুমার দিয়ে যাননি। তবে আমরা বোধহয় কিছুটা আঁচ করতে পারি।

'চলতি কা নাম গাড়ি' তাঁর জীবনের এক দিকনির্ণয় ক্ষণ। কিন্তু এই ক্ষণটিই বোধহয় তাঁর অভিনয় জীবনের বড় অভিশাপ হয়ে



ফটো : কুমকুমীরায়ের সৌজন্যে

প্রথমা স্ত্রী রুমা এবং ছোট্ট ছেলে অমিতের সংগে

দেখা দিয়েছিল। কারণ এই ছবির পরপরই কিশোরকুমার রাতারাতি বোম্বের ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে কমেডি কিং নামে খ্যাত হয়ে পড়েন এবং তাঁর বাড়ির সামনে প্রোডিউসারদের লাইন পড়ে যায়। দেখা যায় সবাই কিশোরকে দিয়ে সেই চলতি কা নাম গাড়ির ছ্যাবলা, পাগল কমেডিয়ান চরিত্রের পুনরাবৃত্তি করাতে চায়। কিন্তু কিশোরকুমার বোধহয় অন্তর্লোকে একেবারে বিপরীত মেরুর মানুষ ছিলেন। স্মরণ করুন বন্দী ছবির সেই দৃশ্য যেখানে রাতে ফুটপাতে শুয়ে থাকা বাচ্চার খিদের জ্বালায় কেঁদে ওঠা ভোলাতে তিনি গান গেয়ে উঠেছিলেন, চুপ হো যা, আমিরোঁ কি এ শোনে কী ঘড়ি হ্যায় তেরে লিয়ে রোনে কো তো উম্র পড়ি হ্যায়। (চুপ, চুপ! এখন বড়লোকের ঘুমের সময়। কাঁদার জন্য তোমার তো সারা জীবনই পড়ে রইল।) এই গান গেয়েছিলেন কিশোরকুমার এবং পর্দায় অভিনয়ও করেছিলেন উনি। সেই মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অভিনয় কি ভারতীয় ছায়াছবি কোনদিন ভুলবে?

তাঁর এই কমেডিয়ান চরিত্র থেকে তিক্ত হয়ে তিনি নিজে ছবি প্রযোজনা করেছেন। যেমন, দূর গগন কী ছাঁওমে, দূর বাজিয়োঁ মে কহিঁ, মমতা কী আঁচলমে প্রভৃতি ছায়াছবির বিষয়বস্তু সেই একই। একজন আপাত মজার মানুষ জীবনকে ধরতে চাইছে বুঝতে চাইছে সঠিকভাবে। কিন্তু জীবনের কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি পড়ে সে দিশেহারা। স্বজনহীন, বন্ধুহীন, প্রেমহীন ক্রূর এই পৃথিবী। জীবনকে ভালবেসেই সে জীবনকে ধরতে চায়। কিন্তু প্রকৃত জীবন তার হাত থেকে বার বার পিছলে দূরে সরে যেতে থাকে মরিচীকার মত।

তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও কিন্তু এই অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে বার বার। আসলে তিনি ছিলেন জীবনকে ভালবাসতে চেয়ে ব্যর্থ হওয়া মানুষ। কিন্তু সেই ব্যর্থতার জ্বালাকে তিনি হাসি ঠাট্টা আর তাঁর অসম্ভব সব পাগলামি দিয়ে আড়াল করে গেছেন। তাই তিনি বলেছিলেন, এই সংসারে গাছই তার সবথেকে বড় বন্ধু। প্রকৃতির মধ্যে তিনি খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন শান্তি। তাঁর বাগানে নানারকম গাছের ননারকম নাম দিয়েছিলেন তিনি। এরাই তাঁর বন্ধু। এদের সংগে কথা বলে অবসর কাটত তাঁর। সম্প্রতি অতীতে আবার ঘোষণা করেছিলেন এই হৃদয়হীন বোম্বে শহরে কে মরতে চায়। আমি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আমার জন্মভূমি খাণ্ডোয়ায় চলে যেতে চাই, যেখানে খামার করে উদার প্রকৃতির শান্তির মধ্যে জীবনের শেষ কটা দিন কাটিয়ে দিতে চাই। কিন্তু নিষ্ঠুর বোম্বে শহর তাঁকে ছাড়েনি। তবে খুব বেশি দিনই বা আর তাঁকে ধরে রাখতে পারল কই বোম্বে। মাত্র দু বছরের মধ্যে তিনি সত্যি সত্যি সবকিছু ছেড়ে তাঁর জন্মভূমি খাণ্ডোয়ায় ফিরে এলেন।

রাইচাঁদ বড়ালকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন



ফটো : শ্রী সুবিনয়

তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে খাণ্ডোয়ায় এনে দাহ করা হয়েছে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই পুত্র রেখে গেছেন।

লেখাটা এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু আর দুটি চরণ যোগ না করলে বোধহয় অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

দুটি পরস্পর বিরোধী কথা আমরা হাল হামেশা নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করি এবং জিজ্ঞাসাও করি। যেমন এক,

প্রকৃতিতে কোন শূন্যস্থান থাকতে পারে না। কেউই অপূরণীয় নয়।

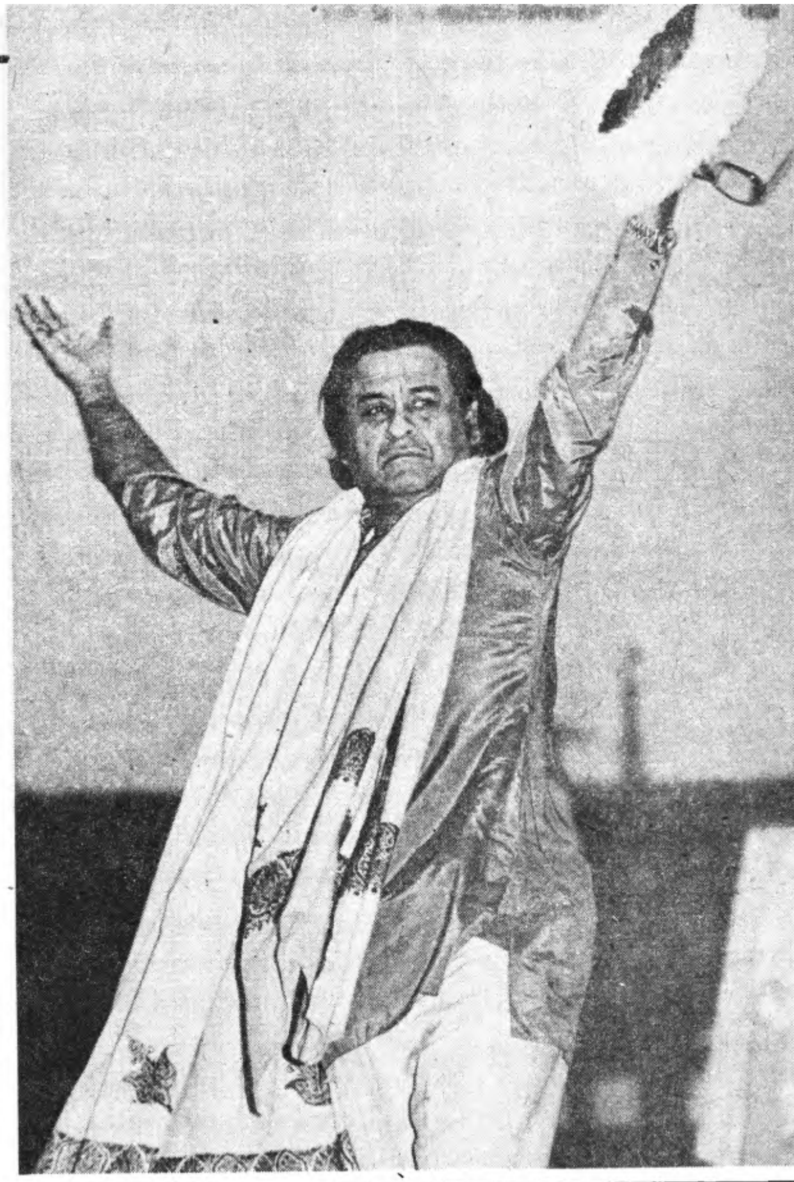
দুই, একজন বড়মাপের মানুষ মারা গেলে আমরা প্রথমেই এই দিয়ে শুরু করি : তাঁর স্থান পূর্ণ হবার নয়।

আমরা কোন কথাটা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করব বলুন তো?

প্রথমটা তো বিশ্বাস করতে প্রাণ চায়। প্রাণ চায় আর একজন কিশোরকুমার আসুন এবং খুব তাড়াতাড়ি।

তা না হলে কে আমাদের শোনাবেন : আঁচল সে তুঝে, ম্যায় লেকে চলুঁ, এক এ্যায়সা গগনকে তলে যাঁহা গম ভি না হো, আঁশু ভি না হো, বস প্যার হি প্যার পলে। □

অরুণ আইন



ফটো : অভিজিত রায়

গানে ভুবন ভরিয়ে দেওয়া এক অসম্ভব জনপ্রিয় শিল্পী কিশোরকুমারকে যখন একজন নবাগত সংগীত পরিচালক প্রশ্ন করেন, আপনার স্কেল? মানে কোন স্কেলে আপনি গেয়ে থাকেন? – অম্লানবদনে শিল্পী জবাব দেন – রাস্কেলে। বিস্মিত সংগীত পরিচালকের অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে কিশোর তাঁকে অভয় দেন – 'কি ভাই, কিছু বুঝলে না? আসলে কি জান, কিশোরকুমারের কোন স্কেল নেই। তুচ্ছ সা-রে-গা-মা নিয়ে সে কোনদিন মাথা ঘামায়নি, বেচারা গাইতে গাইতে গায়ক হয়েছে। আমি সারেগামা জানি না, স্বরলিপিও বুঝি না। ৭ মাত্রার তেওড়াকে যদি বল ১০ মাত্রার ঝাঁপতাল আমি তাই বুঝব। সুতরাং গান গেয়ে যাও – আমি গলায় তুলে নেব তারপর গেয়ে দেব।'

সত্যি, এমনি করেই খাণ্ডোয়ার কুঞ্জবিহারীর ছেলে কিশোর কালে কালে জনপ্রিয় শিল্পী হয়ে উঠেছে। নকল করার স্বাভাবিক জন্মগত প্রতিভাই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর মর্যাদা দিয়েছে। শিক্ষাগুরুর কাছে তালিম নেননি, রেওয়াজ করা দূরে থাক, মনের আবেগে কখনও সুরে কখনও বেসুরো গলায় চিৎকার করে গান গেয়েছেন, সেই গানই তাঁকে দিয়েছে অর্থ-জনপ্রিয়তা, প্রতিষ্ঠা।

গানের জগতের কিংবদন্তী-পুরুষ কিশোরকুমারের অকাল প্রয়াণে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল তা সহজে পূরণ হবার নয়। মুকেশ, মহম্মদ রফি যখন ইহজগৎ ত্যাগ করেন তখন ছিলেন কিশোর। তাঁদের শূন্যস্থান পূরণ করার গুরুদায়িত্ব চেপেছিল তাঁর কাঁধে। এক থেকে শুরু করে একশ হয়েছিলেন।

– কিন্তু এখন?

'আমি গান গাই রাস্কেলে' – কিশোরকুমার



ফটো : অভিজিত রায়

কিশোর বলতেন, 'বদখেয়ালে গান গাই নিজের জন্য, আর সুরে তুলে গাই সবার জন্য।' গান রেকর্ড চলছে। সাউন্ড ট্রাকে বাদ্যযন্ত্রের সংগে কিশোর রিহার্সাল করছেন – নানারকম গলা করে, সুরে নয়, তালে নয়, বিকট, বেসুরো গলায় – সংগীত পরিচালকের টেনসন প্রচণ্ডভাবে বেড়ে চলেছে। অসহায় সংগীত পরিচালকের মুখের দিকে তাকিয়ে কিশোর বলে উঠলেন – 'কিছু ভেবো না ভাই, সুরে পৌঁছতে সিঁড়ি ভাঙছি।' তারপর যে গান গাইলেন সে গান 'গোল্ডেন ডিস্ক' হয়ে রইল। এই ছিল কিশোর।

প্রযোজক কিশোরকুমারকে দিয়ে ছবিতে গান গাওয়াতে চান। সেইমত শ্যালক অনিল চন্দ্রভারকার, যিনি তার সেক্রেটারিও বটে, তাঁর সংগে কথা বলে সময় মত হাজির হলেন – কিশোরের আবাস 'গৌরীকুঞ্জে'। – কিছুক্ষণ

পর কিশোর নিচে নেমে এসে প্রযোজককে ইণ্টারভিউ করতে বসলেন।

'আপনি গান জানেন?' – প্রযোজক সবিনয়ে জানালেন – 'না'। 'নাচ জানেন?' – 'আজ্ঞে না।' 'তাহলে কি করে হবে। আমি আপনার ছবিতে গাইব না।' – অসহায় প্রযোজক আর্তনাদ করে উঠলেন – 'আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে, মিউজিশিয়ান, ফ্লোর, সব বুক করেছি এখন আপনি যদি অমত করেন, আমার বহু টাকা ক্ষতি হয়ে যাবে। আপনি দয়া করুন।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে কিশোর বললেন 'ঠিক আছে, গাইব, তবে আপনাকে এখন আমার সংগে নাচতে হবে।' অগত্যা প্রযোজক বাধ্য হলেন কিশোরকুমারের সংগে নাচ শুরু করতে। নাচের শেষে তিনি সময় দিলেন প্রযোজককে, শুধু সময়ই নয়, পরের দিন রেকর্ডিং শেষে প্রযোজকের হাতে বেশ কিছু টাকা দিয়ে বললেন – 'এই নিন এটা আপনার নাচের পারিশ্রমিক।'



ফটো : শ্রী সুবিমল

উত্তমকুমারের গান শুনছেন তরুণকুমারকে সংগে নিয়ে



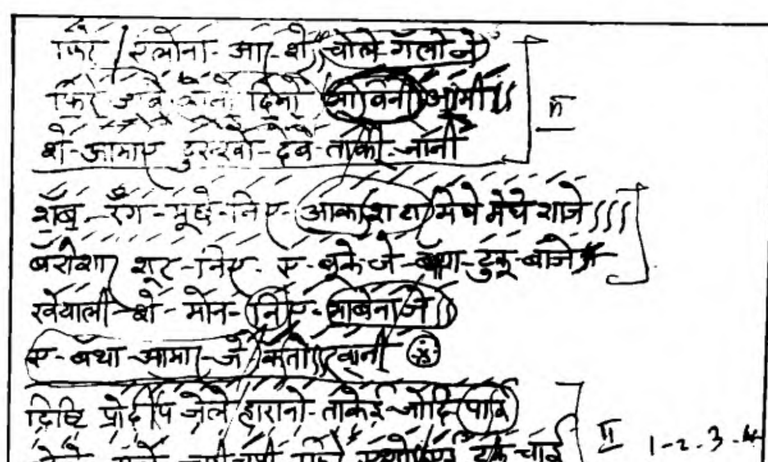
ফটো : শ্রী সুবিমল

উত্তমকুমারকে গান শোনাতে

'ট্যারা বাঁকা সুর কোর না! সোজা পথে চল। গানের মধ্যে হাংগামা করতে পার, গেয়ে দেব।' বলতেন – 'কিশোরকুমার যে গান তুলতে পারবে না সে গান কেউ গাইতে পারবে না।' – এ কথার মধ্যে তাঁর কোন অহমিকা ছিল না। বলতেন, আমি গান গাই না, গান গিলে নিয়ে উগরে দিই। সংগীত আমার খিদে।

সংগীত পরিচালক কানু ভট্টাচার্যকে নিজের হাতে স্বরলিপি লিখে দিয়ে বলেছিলেন 'কানু রেখে দাও এটা তোমার কাছে। যখন আমি থাকব না, তখন সবাইকে দেখাবে। বলবে এটা মহাপাগল কিশোরকুমারের পাগলালিপি। অবশ্য এখন দেখিও না, আমার পপুলারিটি নষ্ট হবে।'

'পাগলালিপি' – কিশোরকুমার যেভাবে গানের স্বরলিপি করে নিতেন



কানু ভট্টাচার্যের সৌজন্যে

রাগরাগিণি কিংবা তাল-ফাঁক সুরের বেড়াজালে কোনদিনই তিনি ধরা দেননি। সহজ সাবলীল কণ্ঠে যে গান তিনি গেয়েছেন সেখানে অদ্ভুতভাবে এসে ধরা দিয়েছে সংগীতের যাবতীয় ছলাকলা, তার অজান্তেই। সংগীতের ব্যাকরণের বিশেষজ্ঞ ছিলেন না তিনি। বরং তাঁর ভাষায় বলা যায় বিশেষ ভাবে অজ্ঞই ছিলেন। প্রাণের অফুরন্ত আবেগে যে গান তিনি গেয়েছেন তাই তাঁকে দিয়েছে অফুরাণ বৈভব, খ্যাতি, স্থায়িত্ব।

অর্থের পিছনে তিনি ছুটেছেন না অর্থ তাঁর পেছনে ছুটেছে – এ বিষয়ে নানা কথা শোনা যায়। অর্থ আদায় না হওয়ায় যেমন তিনি নানা কান্ড ঘটিয়েছেন তেমন টাকা দিয়ে অনেককে সাহায্যও করেছেন। টাকা পাননি বলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রিহার্সাল চালিয়ে প্রযোজককে নাকাল যেমন করেছেন, তেমনি অতিরিক্ত সময় রেকর্ডিং হওয়ার জন্য প্রযোজকের হাতে ক্ষতিপূরণের টাকা তুলে দিয়েছেন। শোনা যায় সত্যজিৎ রায় যখন পথের পাঁচালি ছবি করছেন, তখন তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য করেছিলেন কিশোরকুমার।

এই ছিলেন কিংবদন্তীর কিশোর। যাঁকে আমরা জানি। কিন্তু অজানা এক কিশোর রয়ে গেছেন নিজের মধ্যে যেখানে তিনি সুখ নামে 'পরশপাথরের' খোঁজে ঘুরে মরা এক 'ক্ষ্যাপা' কিশোর। □

অমিতাভ মিত্র



ভালোবাসা ফেলে চলে গেলেন শ্যামল মিত্র

যার গান শুনে একদিন আমরা তাঁর কণ্ঠে মালা পরিয়েছি সেই শ্যামল মিত্রকে একবার আমাদের ভালবাসাই মরণের পার থেকে ফিরিয়ে এনেছিল কিন্তু এবার তিনি সত্যি সত্যি বিশ্বলোকের সভা থেকে বিদায় নিলেন।

নৈহাটি মিত্রপাড়ার ছেলে শ্যামলকে গানের জগতে নিয়ে আসেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। হুগলি মহসীন কলেজে পড়ার সময় শ্যামলের সহজ সাবলীল কণ্ঠ সতীনাথকে আকৃষ্ট করে, তিনিই তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়ে গানে তালিম দিতে শুরু করেন। তারপর সে যুগের প্রখ্যাত গায়ক সুধীরলালের নজরে পড়েন – সুধীরলালের কাছেই প্রকৃতপক্ষে সংগীতসাধনার শুরু। সুধীরলালের গায়কী তিনি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত্ব করতে পেরেছিলেন। প্রথম জীবনে যখন গান গাইতেন, তখন বেশীরভাগটাই গুরুকে অনুসরণ করে। পরের দিকে ধীরে ধীরে স্বকীয় গায়নরীতি গড়ে তোলেন। তবুও শেষদিন পর্যন্ত সুধীরলালের প্রভাব তাঁর কণ্ঠ থেকে মুছে যায়নি। এ বিষয়ে একসময় শিল্পীকে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন 'কি করে মুছে যাবে বল, তিনি যে আমার শিক্ষাগুরু, তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছি তা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছি।'

'৬০-এর দশকের শেষভাগ থেকে সত্তর দশকের শেষভাগ পর্যন্ত বাংলার সুরের আকাশে শ্যামল ধ্রুবতারার মত বিরাজ করেছেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে যখন বোম্বে পাড়ি দিলেন, তখন প্রতিটি গানের জলসায় শ্যামল মিত্র ছিলেন সবচাইতে জনপ্রিয় শিল্পী। বাংলা আধুনিক গানের সেই সুবর্ণযুগে শ্যামল, ধনঞ্জয়, মানবেন্দ্র, তরুণ, প্রতিমা, উৎপলা, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ যে ভাবে আসর মাতিয়েছেন – আজ তা কল্পনারও অতীত।

সংগীত পরিচালক, চলচ্চিত্র প্রযোজক এবং গায়ক এই তিন ভূমিকাতেই তিনি সাফল্যের উচ্চসীমা ছুঁয়েছিলেন। বাংলা ছবিতে গায়ক-সুরকার হিসেবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পর নিশ্চয়ই দ্বিতীয় স্থান শ্যামলের। অসংখ্য ছবিতে সুর করেছেন, মন ভরিয়েছেন। গায়ক হিসাবে বহু কালজয়ী গান রেখে গেলেন যা আগামীদিনে বাংলা গানের ইতিহাসকে অলংকৃত করবে

চলচ্চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ 'দেয়া-নেয়া'। সে ছবিতে তাঁর সফলতা বাংলা ছবির ব্যবসার ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করেছিল। তারপর 'রাজকন্যা', আমি সে ও সখাও সফলতা পেয়েছিল। জীবনের শুরুতে দু'একটি ছবিতে অভিনেতা হিসেবেও তাঁকে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম, যার মধ্যে 'পাশের বাড়ি' 'সাড়ে চুয়াত্তর' এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি। রোগা ছিপছিপে চেহারার সেই শ্যামল মিত্র আজও আমার চোখের সামনে আছেন।

অমায়িক, বন্ধুবৎসল, আড্ডাবাজ শ্যামল মিত্র কি টালিগঞ্জ পাড়ায়, কি মণ্টু বসুর বসুশ্রী সিনেমার আড্ডায় কি গানের জলসায় সর্বত্রই নিজেকে মধ্যমণি করে তুলতে পারতেন – এটাই ছিল তাঁর বিশেষত্ব।

শিল্পীর জনপ্রিয়তার প্রমাণ সেদিনও আমরা পেলাম যেদিন তাঁর সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা, তিনি রবীন্দ্রসদন প্রাংগণে শায়িত – অসংখ্য মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন, সেদিন সত্যিই তাঁর গানের কলি সার্থকতা পেল 'কে বলে তুমি নাই, তুমি আছ মন বলে তাই' :–

এক কথায় শ্যামল মিত্রর মূল্যায়ন এই মুহূর্তে করা সম্ভব নয়। তাঁর দেখা ভুবন অবশ্যই গানের ভিতর দিয়ে। তাই আধুনিক ও অন্যান্য গানের বাইরেও তাঁর যোগ্য উপস্থিতি পাই রবীন্দ্রসংগীত জগতে। যেখানে ভেসে যায়নি গান, হারিয়ে যায়নি সময়ের মিছিলে। কেমন করে ভোলা যায় বেশ কয়েক বছর আগের রেকর্ড করা 'হে মাধবী দ্বিধা কেন' 'মুখখানি কর মলিন বিধুর' এবং আরো কিছু। তাছাড়াও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় গ্রামোফোন রেকর্ডে মায়ার খেলা নৃত্যনাট্যে অমরের ভূমিকায় কণ্ঠদান। এখনও তো কানে লেগে রয়েছে 'ভালবেসে যদি সুখ নাহি', 'তবে সুখে থাক'---

উত্তমকুমার ছিলেন তাঁর অকৃত্রিম সুহৃদ। উত্তমবাবু যখন 'ছোটি সি মুলাকাৎ' ছবি প্রযোজনা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন, তখন শুধু মানসিকভাবেই নয় নানা ভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন শ্যামল হিন্দি ছবির জগৎ সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ উত্তমবাবুকে আবার বোম্বেতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন শ্যামল মিত্র। শক্তি সামন্ত যখন 'অমানুষ' ছবিতে অভিনয় করার জন্য উত্তমকুমারকে অনুরোধ করেন, তখন তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্যামল মিত্রের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরেই 'অমানুষ' ছবিতে অভিনয়ে রাজি হন। বাংলা ও হিন্দি ছবির প্রযোজনা, অভিনয় ক্ষেত্রে যে একটা ব্যবধান দীর্ঘদিন ধরে মানসিকভাবে দু'টি প্রযোজনাক্ষেত্রকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, সেই ব্যবধান দূর করার প্রথম এবং প্রধান কৃতিত্ব নিশ্চয়ই শ্যামল মিত্র দাবী করতে পারেন। দ্বিভাষিক ছবির, যে ক্ষেত্র বাংলা ছবিকে সমৃদ্ধ করেছে তার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন শ্যামল মিত্র। 'অমানুষ' 'আনন্দ আশ্রম' প্রভৃতি ছবিতে শ্যামল মিত্র শুধু সংগীত পরিচালকই ছিলেন না, অন্যতম উদ্যোক্তাও ছিলেন বলা চলে। কলকাতা থেকে বোম্বে গিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে 'অমানুষ' 'আনন্দ আশ্রম' ছবির মাধ্যমে তিনি যে সফলতা পেয়েছিলেন তা পরবর্তীকালে বহু বাঙালি শিল্পী কলাকুশলীকে অনুপ্রাণিত করেছে বোম্বের পথে পাড়ি দিতে।– শুধু তাই নয় বোম্বাই-এর বহু পরিচালকও কলকাতায় ছবি করার প্রেরণা লাভ করেছেন শ্যামল এবং শক্তি সামন্তের সফলতার দিকে তাকিয়ে। শ্যামল মিত্রের কাছে বাংলা চলচ্চিত্রের এ এক বিরাট ঋণ – অনস্বীকার্য।

তাঁকে আমাদের চেনা, গানের ভিতর দিয়েই, কাছে থেকে, কখনও বা দূর থেকে এক অনন্য শিল্পী। তাঁর চলে যাওয়া নিঃসন্দেহে সময়ের আগেই। তবুও মন সে কথা মানতে নারাজ। ভালোলাগা, ভালোবাসায় রইল তাঁর গান। যে গানের কাল বলে কিছু নেই। কাল সেখানে চিরদিনের। অবশ্যই চিরকালেরও।

অমিতাভ মিত্র

সাফ গেমসে সবাই রাজা, ব্যস্ত আখের গোছাতে

সাফ গেমসের দৌলতে এখন কলকাতার মাঠে – ময়দানে ভারত-শ্রীলংকা কিংবা পাকিস্তান – বাংলাদেশ অথবা নেপাল-ভূটানের মধ্যে গরম লড়াই চললেও আসলে ঠান্ডা লড়াইটা চলছে সাফ গেমসের অফিসে অর্থাৎ নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। সাফ গেমসের অফিসে সবারই কেমন যেন ঢাক-গুড়গুড় ভাব। চুপিচুপি সব কাজ সেরে ফেলার উদ্যোগ। সাফ গেমসের নামে নিজেকে স্বাস্হ্যবান করার বিরাট সুযোগ এসেছে। যদিও মুখে যথারীতি সাফ গেমসের ভ্রাতৃত্বের বুলি দিয়ে মিষ্টি হাসি হেসে সবাই মিলেমিশে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, আসলে সাফ গেমসের অফিসে এখন যেন ঝুলছে অদৃশ্য তরবারি। সুযোগ পেলেই পেছন থেকে মারার জন্য সবাই ব্যস্ত। কর্মকর্তাদের মধ্যে এই লড়াইটা শুরু হয়েছিল সাফ গেমসের আগেই এবং শেষ হবে সাফ গেমসের পরে। মাঝখান থেকে মারা পড়বে বাংলার ক্রীড়াপ্রেমীরা। প্রথমেই সাফ গেমসের দোহাই দিয়ে কলকাতার বুকে ছড়ি ঘোরাবার চেষ্টা করেছিলেন খোদ রাজধানীর রাজারা অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ওলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশানের কর্মকর্তারা। কিন্তু একদা যে বাংলা ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল সেটা প্রমাণ করার সময় এসেছিল বোধহয় বেংগল ওলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশনের টাইগারদের কাছে। যথারীতি ঠান্ডা লড়াই করে টাইগারেরা বিজয় হয়েছেন এবং আপাতত সাফ গেমসের প্রতিটি খেলায় রয়েল বেংগল টাইগাররাই শাসন করছেন। তবে বাঙালির 'পা ধরে টানা' স্বভাব পাল্টায়নি। এখন সাফ গেমসের অফিসে পা-ধরে টানার বদলে রীতিমত চুলোচুলি হচ্ছে। স্বজনপোষণের প্রতিযোগিতা চলছে। আসলে সাফ গেমস উপলক্ষ মাত্র। সামনেই বেংগল ওলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশানের নির্বাচন। তাই পি টি উষা যেমন সিওল ওলিম্পিক্সের প্রস্তুতির জন্য সাফ গেমসে নামছেন তেমনি কর্মকর্তাদের কাছে সাফ গেমসটা হল বেংগল ওলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশানের নির্বাচনী প্রস্তুতি। ইতিমধ্যেই বেংগল ওলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশানের সচিবকে সরিয়ে সাফ গেমসের আসল সচিব পদে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন টেবিল টেনিসের এক কর্মকর্তা। কর্মকর্তাটির নাকি কলকাতার বুকে এশিয়ান টেবিল টেনিস এবং বিশ্ব টেবিল টেনিসের আসর বসানোর মত কিছু কৃতিত্ব আছে। অতএব সাফ গেমসেও তিনি কৃতিত্বের সংগে সব দায়িত্ব পালন করতে পারবেন এই আশা নিয়েই এতদিন সবাই আশ্বস্ত ছিলেন। এখন সব হিসাব উল্টে যাচ্ছে। সচিবের হাতে অনেক দায়িত্ব থাকলেও কোষাধ্যক্ষ ছাড়ার পাত্র নন। সভাপতিও নিজের ক্ষমতা দেখানোর জন্য ব্যস্ত। এইভাবে ত্রিকোণ যুদ্ধে একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দায়িত্ব এড়াবার জন্য সবাই এখন ব্যতিব্যস্ত। সবাই ছড়ি ঘোরাতে চান। কিন্তু কেউ ছাড়বার পাত্র নন। তাই শেষপর্যন্ত ঠান্ডা যুদ্ধে ছড়ির বদলে ছুরিটাকেই ভাল অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছেন। ফলে যথারীতি চূড়ান্ত অব্যবস্থা।



কেন্দ্রীয় চক্রান্ত

রিলায়েন্স কাপ ক্রিকেটের ফ্লপ আলোচনার পর এখন সাফ গেমস নিয়ে যথারীতি 'কেন্দ্র-রাজ্য' তর্ক-বিতর্ক তুংগে। একজন কর্মকর্তাতো বলেই ফেললেন – কলকাতায় সাফ গেমস হচ্ছে বলেই কেন্দ্রীয় চক্রান্ত দিনের পর দিন বাড়ছে আর সাফ গেমসের বাজেট কমছে। গতবার বাংলাদেশের ঢাকা স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় সাফ গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই শুধু খরচ হয়েছিল প্রায় দেড় কোটি টাকা। আর এবারে পুরো সাফ গেমসের বাজেট দেড় কোটি টাকার কম। মাত্র ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। হাস্যকর বাজেট। পাশ থেকে আরেকজন কর্মকর্তা চুপিচুপি জানালেন – কেন্দ্রীয় সরকার তবু তো প্রতিশ্রুতিমত ৪০ লাখ টাকা ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দিয়েছে। এদিকে সাফ গেমসের শুরু হবার দুদিন আগেও খোদ রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৩০ লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র ১১ লক্ষ টাকা আগাম দিয়েছে। অতএব এটা কেন্দ্রীয় চক্রান্ত নয়। রাজ্য চক্রান্ত। পাশ থেকে আরেকজন অ্যাথলেটিক্স বিশেষজ্ঞ জানালেন – রাজ্য ক্রীড়ামন্ত্রী বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও সল্ট লেক স্টেডিয়ামে একটা আন্তর্জাতিক মানের রেকোর্টান ট্র্যাক বা টার্টান ট্র্যাক বসাতে পারেননি। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এককথায় সল্ট লেক স্টেডিয়ামের জন্য ১০ কোটি টাকা পাশ করেছেন এবং শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা দিয়ে সল্ট লেক স্টেডিয়ামে রেকোর্টান ট্র্যাক বসেছে। প্রসংগত জানিয়ে রাখা ভাল – পশ্চিম জার্মানির 'ভয়েট' কোম্পানির তৈরি এই রেকোর্টান ট্র্যাকেই গত লস এঞ্জেলস ওলিম্পিক্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এহেন অমূল্য রেকোর্টান ট্র্যাক পাওয়া সত্ত্বেও সল্ট লেক স্টেডিয়ামের পরিকল্পনার অভাবে ৮টা লেনের জায়গায় ৯টা লেন বসানো গেল না। অথচ ১৯৮১ সালে রোমে তৃতীয় বিশ্বকাপ অ্যাথলেটিক্সের সময় আয়োজক দেশ হিসাবে ইতালি নবম লেন ব্যবহার করতে পেরেছিল এবং আগামী পঞ্চম বিশ্বকাপেও স্পেনের বার্সেলোনা স্টেডিয়ামে নবম লেনে স্পেন আয়োজক দেশ হিসাবে সুযোগ পাবে। এই সল্ট লেক স্টেডিয়ামেই ভবিষ্যতে কোনদিন বিশ্বকাপ হলে নবম লেনের অভাবে ভারতের একটা সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। এরকম পরিকল্পনার অভাবের পরেও কীকরেরাজ্য ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন – সল্ট লেক স্টেডিয়ামেই হবে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কম্পোজিট স্টেডিয়াম ?

উদ্বোধনী রাজনীতি

খেলার নামে রাজনীতি করাটা এখন অনেক নেতার কাছে সহজ মনে হচ্ছে। তাই সাফ গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দিয়েই শুরু হয়েছিল রাজনীতি। দিনের পর দিন সাফ গেমসের ব[illegible] কমে যাওয়ার ফলে আনন্দ শংকরের ২ – ১০ মিনিটের প্রোগ্রামের জন্য ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা খরচ করার পক্ষপাতী ছিলেন না স্বয়ং ক্রীড়ামন্ত্রী। কিন্তু ক্রীড়ামন্ত্রীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশে সল্ট লেকে ঢুকে পড়েছেন আনন্দশংকর। আসলে আনন্দশংকরকে বাদ দিলে ক্রীড়ামন্ত্রীর জনপ্রিয়তা বাড়াতে একটু সুবিধা হত। নিজের কিছু কাছের লোকদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো কাছে টানার সুযোগ পেতেন। এ ব্যাপারে অবশ্য ক্রীড়ামন্ত্রী যথেষ্ট পটু। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যথারীতি পেছনের দরজা দিয়ে কাছের লোকদের ঢুকিয়ে দিয়েছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের এক কর্মকর্তা তো বলেই

ফেললেন — বাতিল হয়ে যাওয়া গ্রুপ প্রোগ্রামগুলোই নেতাদের হাত ধরে সল্ট লেকে ঢুকেছে। অতএব উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কেমন হবে সেটা সহজেই অনুমেয়। বিডন স্ট্রিটের রামজয় স্কুলের প্রোগ্রাম প্রথমে বাতিল হওয়া সত্ত্বেও প্রথম সারির এক বামপন্থী নেতার হাত ধরে পরে ঢুকেছে। বারবার বাতিল হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ কলকাতা ক্রীড়া সংস্কৃতি পরিষদ খোদ ক্রীড়ামন্ত্রীর সুপারিশে ঢুকে পড়েছে। এ ব্যাপারে অবশ্য দক্ষিণ কলকাতা ক্রীড়া সংস্কৃতি পরিষদের সচিব অজয় দাস জানালেন আমাদের 'ভারতমাতা' এবং 'শাড়ী নৃত্য' সবচেয়ে ভাল অনুষ্ঠান। অন্যানাদের খারাপ অনুষ্ঠানগুলি এর পাশে তলিয়ে যাবার ভয়েই কিছু কিছু কর্তা আমাদের বারবার বাতিল করেছে। কিন্তু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমরা সত্যি সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছি। তবে সবচেয়ে রহস্যজনকভাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢুকেছে সল্ট লেকের ফ্রেন্ডস অফ সোসাইটি। আরো মজার ব্যাপার হল এই তিনটে সংস্থাই আগাম ৫ হাজার টাকা তুলে নিয়েছে। অথচ অন্যান্য আরো স্কুলগুলো আগাম টাকা পায়নি। খোদ ক্রীড়ামন্ত্রীর সুপারিশের একটি চিঠি ১১ নভেম্বর হঠাৎ এক কর্মকর্তার হাতে পৌঁছেছে এবং সেই চিঠিতে নদীয়া জেলার পলাশী থেকে কিছু কৃষকভাই এবং শ্রমিকভাই লাঠিয়ালদের লাঠি খেলার জন্য বাজেট ছাড়াই ৪৮ হাজার ৫০০ টাকা দেবার জন্য ক্রীড়ামন্ত্রী সুপারিশ করেছেন। কর্মকর্তাদের অভিযোগ এই চিঠির সুপারিশের ফলেই আবার নদীয়া জেলার স্পোর্টস কাউন্সিলের কো-অর্ডিনেটর সুব্রত মুকুতা ১৩ নভেম্বর ৩৫ হাজার টাকা আগাম পাওয়ার জন্য সাফ গেমস কমিটির বদলে একেবারে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর কাছে আবেদন করেছেন। এটা সাফ গেমস নয়। সাফ গেমসের অফিস রাইটার্স বিল্ডিংস-এ হলেই ভাল হত।

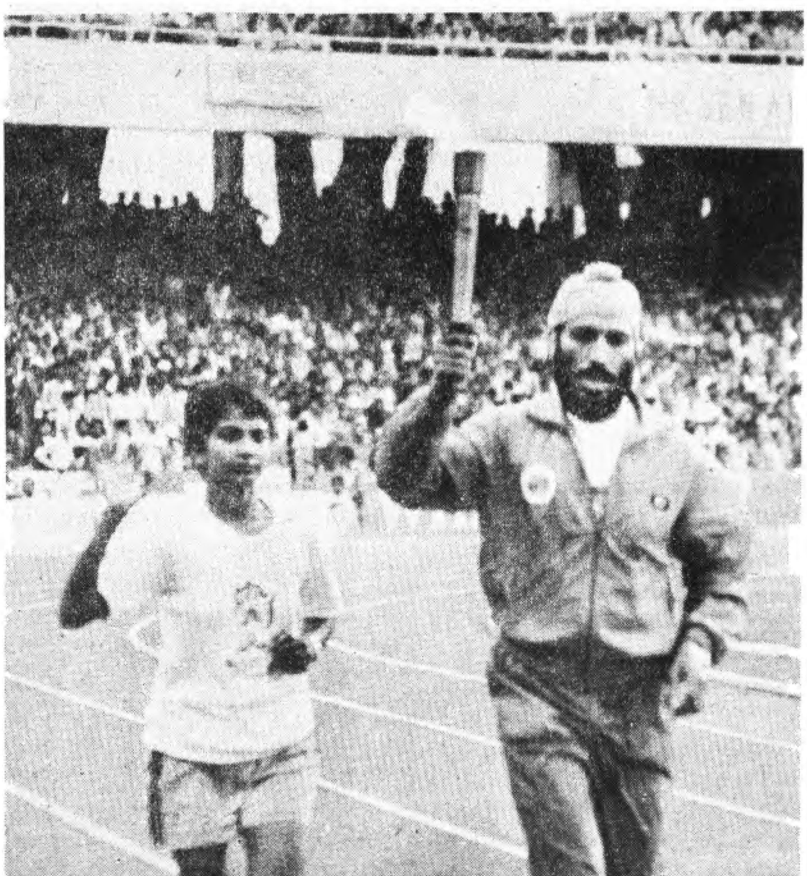
বামপন্থী হাত

সাফ গেমসের দৌলতে অনেক কর্মকর্তারাই বাঁ হাতের কাজের জন্য বাঁ হাতটা একটু লম্বা হয়ে যাচ্ছে। কর্মকর্তাদের গাফিলতির সুযোগে বহু কন্ট্রাক্টর দুহাতে টাকা লুটেপুটে নিচ্ছে। বিশ্বস্তসূত্রের খবর অনুযায়ী বেশির ভাগ কমিটির কর্মকর্তাদের প্রশ্রয়ে টাকার নয়ছয় হচ্ছে এবং সবচেয়ে বেশি টাকা নয়ছয় হচ্ছে রিসেপশান কমিটির ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে। তারপরে হসপিটালিটি কমিটির হোটেলের মাধ্যমে। এছাড়া প্রাইজ কমিটি এবং এনটারটেনমেন্ট কমিটির দৌলতে। এছাড়াও মিডিয়া কমিটির এক কর্মকর্তা নাকি নিজস্ব একটা শিপিং কোম্পানির মাধ্যমে টাকা লুটছেন। মিডিয়া কমিটির মত অ্যাক্রিডেশান কমিটির এক হোমগার্ডের কর্মকর্তাও নাকি এ ব্যাপারে রীতিমত চাতুর্যের পরিচয় দিচ্ছেন। সেই ভদ্রলোকের দৌলতে বিজলী গ্রীল অর্গানাইজিং কমিটির সবাইকে লাঞ্চ দেবার কথা। অথচ অনেকের কপালে এক কাপ চা জুটছে না। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের এক কর্মকর্তা জানালেন আমাদের জন্য একজন ২০০ টাকার পার্ট টাইম টাইপিস্ট। অথচ মিডিয়া কমিটিতে ১২০০ টাকার একজন স্টেনোগ্রাফার। এইধরনের কর্ম-বৈষম্য ছাড়াও ফ্রেন্ডস অফ সোসাইটির তথাকথিত এক বামপন্থী নেতার কন্ট্রাক্টর সামান্য খো খো খেলার জন্য সল্ট লেক স্টেডিয়ামে দু-চারটে খুঁটি আর একটা সামিয়ানা খাটানোর জন্য ৩০ হাজার টাকার বিল করেছেন। অথচ একই কাজ করার জন্য কে ডি শেঠ নামে আরেকটি সংস্থা মাত্র ৫ হাজার টাকা চাওয়া সত্ত্বেও বামপন্থী কন্ট্রাক্টর যা খুশি তাই বিল করছে অতএব সহজেই অনুমেয় কিভাবে টাকা নয়ছয় হয়ে যাচ্ছে। এদিকে সাফ গেমসের আগে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের টাকা ছাড়াও কিছু স্পনসরের টাকার দৌলতে কোষাধ্যক্ষের কাছে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা এসেছিল। কোষাধ্যক্ষের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেবার জন্য সবাই ব্যস্ত। মশাল রিলে সাব কমিটির এক সদস্য ইতিমধ্যে বামপন্থী সূত্রে জানিয়েছেন। বিশ্বস্তসূত্র থেকে জানা গেছে — বনগাঁর এক বামপন্থী বিধায়কের নামে ইতিমধ্যে ১৩ হাজার টাকা মশাল রিলের জন্য আগাম তোলা হয়েছে বামপন্থী ধমক দিয়ে। টেন্ডার ছাড়াই লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস কেনাবেচা হয়ে গেছে। অথচ কথা ছিল ৫ হাজার টাকার ওপরেই টেন্ডার থাকা দরকার।

ডানপন্থী চিন্তা

সাফ গেমস কমিটির কিছু প্রভাবশালী কর্তার ডানপন্থী চিন্তার জন্য অন্তত বাংলার বুকে কিছু লজ্জা জমে গেল। কারণ বেংগল ওলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশানের সামনে সাফ গেমসের জন্য গেমস টেকনিক্যাল কনডাক্ট কমিটিতে ওয়েস্ট বেংগল স্পোর্টস কাউন্সিলের কোন কোচ নেই। এটা ভাবতেও লজ্জা লাগে। আসলে ঠান্ডা লড়াইটা হয়েছে সাফ গেমসের কিছু ডানপন্থী কর্মকর্তার সংগে বামপন্থী রাজ্যের কোচেদের। স্পোর্টস কাউন্সিলের একজন অভিজ্ঞ এন আই এস কোচ ক্ষোভের সংগে জানালেন সাফ গেমসের প্রথম সভাতেই এন আই এসের ডাইরেক্টর জেনারেল সি এম মুথাইয়া জানিয়েছিলেন — পশ্চিমবংগের স্পোর্টস কাউন্সিলের সমস্ত কোচকেই সাফ গেমসে কাজে লাগানো হবে। তাহলে এখানকার

উদ্বোধন উপলক্ষে মশাল হাতে মিলখা সিং



কোচেদের কাজে লাগানো হল না কেন? এখানে এন আই এসের ২০ জন কোচ এবং রাজ্যের ৬ জন কোচ আছেন। তারা এখন সবাই মাছি তাড়াচ্ছেন। অনেকের প্রশ্ন – কেন্দ্রীয় সরকার যখন ২০ জন এন-আই এস কোচ এবং রাজ্য সরকার যখন ৬ জন কোচের জন্য প্রতি মাসে মাইনে দেন সেই মাইনে পাওয়া কোচেদের কাজে না লাগিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কার লাভ হল? বরং ক্ষতি হল সাফ গেমস সংগঠকদের। কারণ এই আই এস কোচেরা যেকোন খেলাধুলায় অন্যান্য যেকোন কোচের থেকে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। অথচ সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হল না। কিছু কু-কর্তার স্বজনপোষণের ফলে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকার অনেক ব্যাপারেই বৈফিয়ত চাইলেও এই কোচেরা কেন বলির পাঁঠা হলেন? সেটা এখনো জানতে চাননি। লজ্জার চূড়ান্ত পরিণতি। একজন কোচ আবার পাশ থেকে বলে ফেললেন – হয়তো এই কোচেদের শেষপর্যন্ত মাঠে চুন দেবার জন্য ডাক পড়তে পারে। অথচ উত্তর কিংবা দক্ষিণ ভারতে এই ধরনের যেকোন আন্তর্জাতিক গেমসে সেখানকার কোচেদের সবার আগে ডাকা হয়।

হ্যান্ডবলের কলঙ্ক

এবারের সাফ গেমসের যে ভদ্রলোকটি সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাবান, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি হিসাবে সেই অশোক ঘোষ কিন্তু হ্যান্ডবলের দৌলতেই বেঙ্গল ওলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সেই সূত্রে সাফ গেমসে এত ক্ষমতা। অথচ লজ্জার বিষয় হল সেই হ্যান্ডবলই এবার বাদ পড়ল তথাকথিত হ্যান্ডবলের এই কর্মকর্তাটির অনাহাতে। ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যান্ডবল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সচিব অনিতা রায় ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন হ্যান্ডবলের তথাকথিত নেতারাই হলেন হ্যান্ডবলের কলঙ্ক এবং এই নেতাদের অনাহাতেই এবার হ্যান্ডবল বাদ পড়ল। খো খো – কবাডির মত জাতীয় খেলাগুলি যদি সাফ গেমসের মত একটা আন্তর্জাতিক খেলায় হতে পারে তাহলে হ্যান্ডবলের মত একটা জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক খেলা বাদ পড়ল কেন? আসলে সাফ গেমসে প্রথমে হ্যান্ডবল ছিল এবং ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান খেলার জন্য যথেষ্ট উৎসাহী ছিল। কিন্তু হ্যান্ডবলের বদলে রহস্যজনকভাবে সাফ গেমসে ঢুকে পড়ল বাস্কেটবল। অথচ বাস্কেটবলে প্রথমে চারটে দেশ খেলার মত দলই পাওয়া যাচ্ছিল না। তবু জোর করে বাস্কেটবল ঢুকলো বাস্কেবলের এক তথাকথিত প্রভাবশালী নেতা বি কে সাহার জন্য। আসলে হ্যান্ডবল বরাবর বাস্কেটবলের শত্রু এবং এই হ্যান্ডবলের জন্য নাকি বাস্কেবলের জনপ্রিয়তা পর্যন্ত কমে যাচ্ছিল। হ্যান্ডবল এখন প্রত্যেক জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। বাস্কেটবল কলকাতায় প্রায় আটকে গেছে। এটাই কাল হয়েছে। আর তার ফলেই হয়তো হ্যান্ডবলের আজ এই দুর্ভোগ। তবে সাফ গেমসে ঢোকার পরেও বাস্কেটবল কী করে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর দল পাঠালেন সেটাও যেমন বিস্ময়কর তেমনি লজ্জার বিষয়।

টর্চের আলো

এবারের সাফ গেমসে অন্যতম জনপ্রিয় ইভেন্টটি হল বোধহয় টর্চ রিলে। বাংলাদেশের এবং বনগাঁ সীমান্তে হরিদাসপুর থেকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন পর্যন্ত প্রায় ৮০ কিলোমিটার পথ টর্চ একের পর এক ক্রীড়াবিদের হাত বদল হবে। এই অভিনব টর্চ রিলে এবারেই সাফ – গেমসে প্রথম চালু হল। এর আগে অবশ্য ওলিম্পিক্স কিংবা এশিয়াডে টর্চ রিলে হয়েছে। এহেন অভিনব টর্চ রিলে নিয়ে রাজনীতি এখন তুঙ্গে। সর্বত্রই রিলে নিয়ে তর্ক-বিতর্ক। টর্চ রিলে কমিটির এক কর্মকর্তা জানালেন – প্রথমে এই টর্চ রিলেতে প্রায় ৪০০ জনের নাম ছিল। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর অনুযায়ী এই ৪০০ জনের মধ্যে ক্রীড়াবিদের সংখ্যা কম ছিল। যাতে রাজনীতির বিতর্ক না ওঠে তাই ১ আগস্ট বেঙ্গল ওলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশানের সচিব হরিপদ ঘোষ সমস্ত রাজ্য ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে চিঠি পাঠান – জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্রীড়াবিদের নামের তালিকা যেন ২০ আগস্টের মধ্যে পৌঁছে যায়। কিন্তু এখানেও রাজনীতি। প্রথমে বামপন্থী ৪০০ জনের রাজনীতি। তারপরে ২৭২ জনের ডানপন্থী রাজনীতি। গেমস শুরু হবার দুদিন আগেও নতুন করে আরো ২৫ জনের নাম রহস্যজনকভাবে ঢুকেছে। অনেকেরই অভিযোগ টর্চ রিলের মাধ্যমে বামপন্থী জনতা জড়ো করার ব্যবস্থা হচ্ছে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে লক্ষ্য করে। ডানপন্থীদের এই অভিযোগের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের পাল্টা অভিযোগ – টর্চ রিলেতে বলা হয়েছিল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খেলোয়াড়ই শুধু সুযোগ পাবে। কিন্তু ডানপন্থীদের উগ্র স্বজনপোষণের ফলে বহু জাতীয় বা আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়ের নাম যেমন ইচ্ছাকৃত বাদ পড়েছে তেমনি বহু রাজান্তরের খেলোয়াড়দের নাম ইচ্ছা করেই ঢোকানো হয়েছে। বিশেষ করে বেঙ্গল রোড রেস অ্যাসোসিয়েশনের পাঠানো বহু নামই অযোগ্য। এই অযোগ্যদের নিয়েই মহান টর্চ রিলে। অনেকে আবার প্রশ্ন তুলেছেন – টর্চ রিলের প্রথম বাজেট ৬ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ২ লক্ষ টাকায় আনা হবার পর আবার কী করে নতুন দেড় লক্ষ টাকা বাজেটে ঢুকলো? টর্চ রিলে কমিটিতে অন্তত বামপন্থীদের হাতে ডানপন্থীরা কুপোকাত।

'বাবু'-চুরি

সাফ গেমসের নামে এবার প্রথম থেকেই চুরি শুরু হয়েছে। এবারের সাফ গেমসের ম্যাসকট খোদ 'বাবু' চুরি হয়ে গেছিল কয়েকদিনের জন্য। মজার গল্পটা শোনালেন বাবুর স্রস্টা ১৯৬১ সালে আর্ট কলেজের প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থানাধিকারী অজিত মল্লিক – এবছর ফেব্রুয়ারিতে শুভা এন্ড সুধা এজেন্সি নামে একটা বিজ্ঞাপন সংস্থায় আমি অস্থায়ী আর্ট ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করতে যাই। এর মধ্যেই হঠাৎ একদিন সংস্থার এক কর্মকর্তা সিদ্ধার্থ ঠাকুর সাফ গেমসের ম্যাসকট তৈরি করার জন্য বললেন। শুনেই একটু রোমাঞ্চিত। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা বেড়ে গেল। প্রথমে বাঁকুড়ার ঘোড়া, একটা প্রাচীন পেতলের মূর্তি এবং বাবুর কথা চিন্তা করলাম। শেষপর্যন্ত দেখলাম বাঁকুড়ার ঘোড়া এবং প্রাচীন পেতলের মূর্তিটা সর্বজনগ্রাহ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির সঙ্গে বাঘকে পোশাক পরিয়ে 'বাবু' বানাবার চেষ্টা করলাম। বাঙালির জাতীয় পোশাক হিসাবে ধুতি – পাঞ্জাবী পরাবার সঙ্গে সঙ্গে বাবু কালচারের কথা মনে করে পায়ে পাম্প সু পরালাম। এবার বাঘের দুটো হাত নিয়ে সমস্যা হল। শেষপর্যন্ত নমস্কার এবং স্বাগতমের সংমিশ্রণে দুটো জোড় হাত করলাম। প্রায় একমাস ধরে এইরকম চিন্তা-ভাবনা করে 'বাবু' তৈরি করার পর একদিন শুনলাম সাফ গেমসের ম্যাসকট হিসাবে 'বাবু' স্বীকৃতি পেয়েছে। আনন্দের ঘোর কাটতে না কাটতেই ৩০ এপ্রিল একটি দৈনিক পত্রিকায় দেখলাম – সিদ্ধার্থ ঠাকুর 'বাবু' তৈরি করেছেন বলে দাবি করছেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম দৈনিক পত্রিকার অফিসে। তারপর পাল্টা চিঠি বেরোবার পর সাফ গেমস কমিটি থেকে আরো প্রচুর কাজ পেয়েছি। সাফের লোগো, পোস্টার, বুলেটিন, চার-রকমের খাবার টিকিট, স্টিকার, ইত্যাদি করার সঙ্গে সঙ্গে দিনের পর দিন যেন সবার থেকে স্বীকৃতি পাচ্ছি। তবু যেন 'বাবু' চুরি চাঁদের কলঙ্ক হয়ে গেল। □

প্রদীপ দে

দেবশিশু — উৎপলেন্দুর নতুন সৃষ্টি

পরিতোষ সেন

১৯৫৪ সাল। দীর্ঘদিন বিদেশবাসের পর সবেমাত্র কলকাতায় পা ফেলেছি। দুপুর বেলার খাওয়া-দাওয়া সেরে সে বছরের শারদীয়া আনন্দবাজার হাতে নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে যে গল্পের শিরোনামটি আমার চোখ এবং মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করল সেটি ছিল, 'বালক সাধু'। লেখক ছিলেন সেকালের আনন্দবাজার দৈনিক পত্রিকার ধুরন্ধর সম্পাদক এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। কাহিনীর নায়ক ছিল আট-নয় বছরের এক নির্দোষ গ্রাম্য বালক। যাকে ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি অথবা অবতার হিসেবে লাখ লাখ লোক প্রতিদিন দর্শনপ্রার্থী হয়ে তার কাছে তাদের নানা অভিলাষ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে সরবে এবং নীরবে প্রার্থনা জানাত। লাখ লাখ আকুতির সংগে দক্ষিণাও পড়ত একই হারে। বলা বাহুল্য বালকের এই ঐশ্বরিক ভূমিকার পেছনে ছিল তার স্বার্থান্বেষী পিতামাতা এবং অন্যান্য চক্রান্তকারীরা। গল্পের প্রবাহ এবং তার শেষ — এসবের খুঁটিনাটির কথা আজ আর মনে নেই। তবে ধর্মের নামে ধাপ্পাবাজি, প্রবঞ্চনা এবং আমাদের দেশের লোকেদের এই সম্পর্কে গভীর কুসংস্কারের প্রতি ক্ষুরধার তির্যক, বিদ্রূপ ছাড়াও হাস্যরসের প্রচুর খোরাক জুগিয়েছিলেন লেখক।



প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় তৈরি করলেন 'দেবী', ১৯৫৮ সালে। এ ছবিরও বিষয়বস্তু ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাস, যার মুখোমুখি আমাদের সমস্ত বিচার-বুদ্ধি এবং বিশ্লেষণের ক্ষমতা ভোঁতা হয়ে যায়।

'দেবী'র মুক্তিলাভের পর আজ প্রায় তিন দশক কেটে গেছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে অন্তত বেশ কয়েক হাজার ছায়াছবি আমাদের দেশে তৈরি হয়েছে কিন্তু ধর্মীয় কিংবা অধর্মীয় কুসংস্কার বিষয়ক আর কোন তাৎপর্যপূর্ণ চলচ্চিত্র (গোটা দুয়েক কনটিকি ছবি ছাড়া) আমাদের দেশে তৈরি হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

'দেবশিশু' শুরু হয় আপাত দৃষ্টিতে এমন একটি দৃশ্যের উদ্ঘাটনে যা মফস্বল কিংবা গ্রামাঞ্চলের পক্ষে খুব অস্বাভাবিক নয়। একটি সাইকেল রিকশার তিন দিক একটি তিন-মাথাওয়ালা শিশুর মস্ত ছবি দিয়ে ঘেরা। সামনের সিটে মাইক হাতে একটি লোক বসে তারস্বরে এই দেবশিশুর আগমন, তার দৈবিক গুণের এবং ক্ষমতার কথা অনর্গল ঘোষণা করে গ্রামবাসীদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে। 'এই শিশু-দেবতা স্বর্গে নয়, পাতালে নয়, জন্মলাভ করেছে এই পৃথিবীতেই। আসুন জল্দি করুন, তার কাছে প্রার্থনা করে আপনার সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। মাত্র ১৯ পয়সার টিকিটের বদলে সম্পূর্ণ গ্যারান্টি, ফল পাবেনই' ইত্যাদি, ইত্যাদি। ঘটনাস্থল বিহার এবং পশ্চিমবাংলার সীমানায় কোনো এক জায়গার।

সেই সময় রঘুবর (সাধু মেহের) এবং তার স্ত্রী সীতা (স্মিতা পাটিল) এবং তাদের দুই সন্তান এই ঘটনাস্থলের কাছেই এক গ্রামে তাদের অর্থাৎ সীতার ভাইয়ের বাড়ির দিকে এগোচ্ছিল। রিকশাটি কাছে আসতেই কৌতূহলবশত তারা অল্পক্ষণের জন্যে নেমে আবার গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যায়। তাদের এখানে আসার মূলে রয়েছে একটি বিয়োগান্ত নাটক যার উদ্ঘাটন ফ্ল্যাশব্যাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাই। সেটি হল এই যে, পরপর দু'বছর প্রবল বন্যায় তারা সর্বহারা হয়ে যায়। গ্রামাঞ্চলের মাপকাঠিতে মধ্যবিত্ত অবস্থা থেকে রাতারাতি এক নিতান্তই দুঃখী পরিবারে রূপান্তরিত হয়। তাই অগত্যা আর কোনো উপায় না দেখে সীতার ভাই গণেশের বাড়িতে তারা আশ্রয় চায়। গণেশের স্ত্রীর দৌলতে তাদের অবস্থা বেশ সচ্ছলই বলা যেতে পারে। সন্তানহীন স্ত্রী লীলা (রোহিণী হাতাংগাদী) সীতার দুটি আদরণীয় পুত্রসন্তান দেখে এত ঈর্ষা বোধ করে যে তাদের গোয়াল ঘরে আশ্রয় নিতে বলা বলে এবং তাদের সংগে চাকর-বাকরের মতো ব্যবহার করে। এ ব্যাপারে স্বামী গণেশের বিশেষ কিছু বলার নেই কারণ, সে সম্পূর্ণ স্ত্রীর কর্তৃত্বাধীন। সীতা রান্নাবান্না, গরুবাছুর পালা এসব যাবতীয় ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকে। তার স্বামীকে দিয়ে হাটবাজার করা, বাড়তি দুধ বিক্রি করা এবং যাবতীয় ফাইফরমাস খাটান হয়। তাদের ৬/৭ বছরের ছেলে কাপড় কাচে, লীলার পা মালিশ করে, স্নানের সময় তার গা রগড়ে দেয়।

একদিন রঘুবরকে বাজার থেকে গম ভাঙিগয়ে আনতে বলে বাড়ির কর্ত্রী লীলা। পথে হাজার হাজার লোককে পায়ে হেঁটে, সাইকেলে এবং সাইকেল রিকশা অথবা গরুর গাড়ি চড়ে একটি বিশেষ গন্তব্যস্থলের দিকে হন হন করে এগিয়ে যেতে দেখে। রঘুবর অবাক হয়ে তাদের মধ্যে একজন যাত্রীকে জিগ্যেস করে কোথায় ছুটছে তারা। রঘুবর তার মুখ থেকে দেবশিশু এবং তার অলৌকিক ক্ষমতার বলে দুঃখীজনের সমস্ত অভাব মোচনের কথা জানতে পেরে সে নিজেও দেবশিশুকে প্রার্থনা জানাতে যায়। কাতারে কাতারে লোকের প্রচণ্ড ভিড় এবং ঠেলাঠেলির মধ্যে সেও জায়গা করে নেয়। যে গেরুয়াধারী সাধু এই ভিড়কে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে নেতৃত্ব দিচ্ছিল তাকে রঘুবর সেই গ্রামের তান্ত্রিক হনুমান ওঝার (শ্যামানন্দ জালান) ম্যাজিশিয়ান জামাই প্রসাদজি (ওম পুরি) বলে চিনতে পারে। এবং তার আশ্চর্য ম্যাজিক দেখাবার ক্ষমতার কথা ফ্ল্যাশব্যাকে মনে আসে। তারপর দেবশিশুর মুখোমুখি হতেই সে এই শিশুকে নিজের সন্তান বলে চিনতে পেরে আঁৎকে উঠে। ফ্ল্যাশব্যাকে আঁতুড় ঘরে সীতার তিন মাথা, চার হাতওয়ালা শিশুর প্রসবের ঘটনা দেখান হয়। প্রসবান্তে দাই রঘুবরকে এই বলে সাবধান করে দেয় যে, এই অস্বাভাবিক সন্তানের জন্ম শুধু তাদেরই নয় সমস্ত গ্রামের অমংগলের কারণ হবে এবং অবিলম্বে রঘুবরকে হনুমান ওঝার কাছে যেতে বলে এই অনিবার্য অশুভ ঘটনার বিহিত করার উদ্দেশ্যে। হনুমান ওঝা এবং তার ম্যাজিশিয়ান জামাই তাকে বলে যে এই অস্বাভাবিক শিশুকে তাদের হাতে সঁপে দিলে একদিকে ভগবানের অন্যদিকে পুলিশের প্রচণ্ড অসন্তোষ এবং শাস্তি থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে পারবে এবং এ বিষয়ে তারা সমস্ত দায়িত্ব নেবে। এই বলে ওঝা রঘুবরকে একটি রক্ষাকবচ পরিয়ে দেয়।

আমরা রঘুবরকে আবার দেবশিশুর তাঁবুর তলায় ভিড়ের মধ্যে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায়


স্কেচ : পরিতোষ সেন

দেখতে পাই। সে নিয়ন্ত্রণকারী সাধুদের নেতাকে তর্জনী দেখিয়ে চিৎকার করে বলে 'তোমরা আমারই সন্তানকে দেবশিশু বানিয়ে এবং লোকদের চোখে ধুলো দিয়ে হাজার হাজার টাকা উপায় করছ'। পেতলের পরাতে রাখা অজস্র টাকা পয়সায় এক থাবা বসিয়ে রঘুবর প্রসাদজিকে বলে যে, এ টাকার অর্ধেক আমার প্রাপ্য'। এই কথা উচ্চারণের সংগে সংগে প্রসাদজির সাধুবেশী গুন্ডারা তাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করে। এক পুকুরের ধারে নিয়ে যায়। পালাবার কোনো উপায় না দেখে সে জলে ঝাঁপ দিয়ে লুকোবার চেষ্টা করে। সাধুরা তখন লাঠি ফেলে তার ওপর ইট-পাটকেল বর্ষণ করতে থাকে। রঘুবর মাথায় জখম নিয়ে ডুব দিয়ে লুকিয়ে থাকে।

আহত, পরিশ্রান্ত এবং নিঃশেষিত রঘুবর গভীর রাত্রিতে বাড়ি ফিরে এলে স্ত্রী সীতা চমকে ওঠে। রঘুবরের এই অবস্থার কারণ কী জানতে চাইলে স্বামী প্রথমে নীরব থাকে। তারপর তাকে সব খুলে বলতেই সীতা অনুরোধ করে বলে, 'আমাকে দেবশিশুর কাছে নিয়ে চল। আমি তো তার মা, আমাকে সে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে।' তার এ অনুনয়ে কোনো কান না দিয়ে রঘুবর হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে সীতার জামাকাপড় ধরে টানাটানি করে তার সংগেঅবিলম্বে সহবাস করার উদ্দেশ্যে। সীতাকে বলে 'আমি চাই দেবশিশুর মত আরেকটি তিন মাথা, চার হাতওয়ালা শিশুর জন্ম যাতে করে আমরাও ওই ওঝা এবং তার জামাইয়ের মত রাতারাতি বড়লোক হয়ে আমাদের সমস্ত দুঃখ দুর্দশা চিরতরে ঘোচাতে পারি।' স্ত্রী সীতা তার এই পাগলামি দেখে একদিকে আতঙ্কিত, অন্যদিকে ক্রোধে ফুলে ফেঁপে উঠে স্বামীকে বলে 'যদি সত্যিকারের মরদ হও তাহলে প্রসাদ এবং তার দলবলকে উচিত শিক্ষা দিয়ে এস। ভিক্ষে করব, কিন্তু আরেকটি ওইরকম অস্বাভাবিক সন্তানের মা আর কিছুতেই হব না।' প্রচণ্ড এক ধস্তাধস্তির ফলে দুজনেই নিঃশেষিত হয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু তক্ষুণি ঘুম আসে না।

সীতার চোখের সামনের দেয়ালে একটি ছেঁড়া ক্যালেন্ডার ঝুলছে। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় ক্যালেন্ডারে কালীমূর্তির বিস্ফারিত চোখ দুটি যেন তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সেই অসাধারণ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। সে স্বপ্ন দেখে, সে



দেবশিশু ছবিতে সাধু মেহের ও স্মিতা পাতিল

নিজেই কালীমূর্তি ধারণ করে খড়্গা হাতে এগিয়ে যাচ্ছে। বিপরীত দিক থেকে প্রসাদজি পুজোর অর্ঘ্য হাতে এগিয়ে আসছে। তার পেছনে দিবশিশুর ঘেরাটোপ কাঁধে করে অনুসরণ করছে ভক্তেরা। মুখোমুখি হতেই কালীরূপী সীতা প্রসাদজিকে খড়্গাঘাৎ করে। সংগে সংগেই সীতা ধড়ফড় করে জেগে ওঠে। হাঁসফাঁস করে। সে শ্বাস নেবার জন্যে বাইরে বেরিয়ে আসে। বাড়ির সীমানার কাঁটা তারের বেড়া ধরে সে একটি অসহায় শিশুর মত ভেঙে পড়ে। তার কান্না ভোরের প্রথম ট্রেনের হুইসেলের সংগে আমাদের কানে আসে। একদিকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের কাঁটা তারের বেড়ায় আবদ্ধ সীতা, আরেক দিকে এ যুগের সভ্যতার প্রতীক ট্রেন, হু হু করে এগিয়ে চলেছে। যে দৃশ্য দিয়ে ছবির উদ্ঘাটন হয়েছিল সে দৃশ্যের পুনরাবৃত্তিতে ছবির সমাপ্তি ঘোষিত হয়। দেবশিশুর পোস্টার সাঁটা সাইকেল রিকশা করে সেই লোকটি মাইকে ঘোষণা করতে করতে এগিয়ে চলেছে, 'মনে রাখবেন, এই শেষ খেলা। যদি আপনার ভাগ্য জানতে চান তাহলে এ সুযোগ হারাবেন না …… '।

প্রথমেই চিত্রনাট্যের কথা ধরা যাক। এটি এমন আঁটো তারের মত বাঁধা হয়েছে যে কাহিনীর বিবর্তনে এবং ঘটনার ধারাবাহিকতার গতিতে কোনো বাঁধা পড়ে না। শুধু দু-তিনটি সিকোয়েন্সের সম্পাদনা আরেকটু সংক্ষেপ করা যেত বলে আমার ধারণা, যেমন, গণেশ এবং লীলার বাড়িতে ভজন গানের দৃশ্যটি। গানটি সুখশ্রাব্য এবং দৃশ্যটিও নিতান্তই দৃষ্টিশোভন, কিন্তু পরবর্তী ঘটনার উন্মোচনের পক্ষে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। দ্বিতীয়টি হল রঘুবরদের গ্রাম ঝড়-বৃষ্টি-বন্যায় যখন ভেসে যেতে চলেছে, সে সময় নিরুপায় হয়ে গ্রামবাসীদের একমাত্র উঁচু জায়গা জমিদারের বাড়িতে আশ্রয় নেবার উদ্দেশ্যে বন্ধ লোহার ফাটকে তাদের করাঘাত। এখানেও ওই একই কথা খাটে। তৃতীয়টি হচ্ছে প্রসাদজির দলবল যখন চুরি করার মিথ্যা অপরাধে লাঠিসোটা দিয়ে রঘুবরকে পেটাতে পেটাতে পুকুর ধারে কোণঠাসা করে। এ ধরনের সামান্য খুঁত হয়ত দেশি-বিদেশি অনেক সেরা ছবিতেও খুঁজলে পাওয়া যাবে। সেটা বড় কথা নয়। আমার কাছে বড় কথা হল ছবির ইমপ্যাক্ট কী! দেবশিশু আমি দু'বার দেখেছি। প্রতিবারই আমার মানসকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে, আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। সীতার মত আমরাও কি কুসংস্কারের কাঁটা তারের বেড়ায় আটকে নেই?

একজন সত্যিকারের সৃজনশীল শিল্পী – তা তিনি সাহিত্যিক কিংবা চিত্রকর কিংবা ছায়াছবির পরিচালকই হোন না কেন। তাঁর নিজস্ব দর্শন অর্থাৎ, এই জগৎটাকে তিনি কোন দৃষ্টিতে দেখছেন তাঁর কাজে তার একটা পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। শুধু এন্টারটেনমেন্টের খাতিরে যাঁরা ছবি করেন, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী যে তাঁদের মধ্যে একজন নন, তা এখানে জোর দিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। তাঁর কৃত প্রত্যেকটি ছবিই তার সাক্ষ্য বহন করে। গভীর সমাজ চেতনাই তাঁর দর্শনের মূল ভিত্তি এবং সে কারণেই তাঁর ছবিতে একটা জোরদার বক্তব্য থাকে। কিন্তু যেটা তাঁর বাহাদুরী সেটা হচ্ছে এই যে, বক্তব্যের উপস্থাপনে শৈল্পিক উৎকর্ষতায় কোনো ঘাটতি পড়ে না। তার প্রচুর প্রমাণ দেবশিশুতে আগাগোড়া আছে। আমার এ উক্তির সমর্থনে দুয়েকটি উদাহরণ দিলেই চলবে, যেমন এ ছবির দ্বিতীয়ার্ধের কয়েকটি সিকোয়েন্স। এগুলোর সাহায্যে তিনি কাহিনীর নাটকীয়তাকে যেভাবে বিল্ড-আপ্ করেছেন তা ছবিটির একটি বিশেষ দিক বলা যায়। রঘুবর আহত অবস্থায় যখন গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে তার ভাগ্যের নির্মম পরিণতির কথা ভেবে বিলাপ করছে, এ মুহূর্ত থেকে নিয়ে স্বপ্নে কালীরূপী সীতার ভণ্ড, জোচ্চোর প্রসাদজির ওপর খড়্গাঘাত এবং কাঁটাতারের বেড়ায় আবদ্ধ সীতার ভেঙে পড়া অব্দি নাট্যের যে জোরদার বাঁধুনি এবং অবতারণা পরিচালক দেখিয়েছেন, তা আমাদের দেশের ছবিতে সচরাচর দেখা যায় না এবং তা আমাদের চেতনাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। আরেকটি অস্বাভাবিক পুত্র পাবার লোভে রঘুবর তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করতে যাবার দৃশ্যটি এবং সীতার কালীরূপী স্বপ্নের দৃশ্য দুটি surprise element-এ ভরপুর। এরকম আরো কত সিকোয়েন্সে এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথাই তো এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

অবশেষে, আর দু একটি কথা বলেই এ নিবন্ধটি শেষ করব। সৌম্যেন্দু রায়ের ছবি তোলার কাজ খুবই সুন্দর। চিত্রকর হিসেবে, বহু দৃশ্যে, রঙ এবং আলোছায়ার, ব্যবহার আমার চোখে নিখুঁত ছবির মত লেগেছে, তা অভ্যন্তরীণ, কোনো দৃশ্যই হোক কিংবা বাইরের দৃশ্যই হোক – যেমন লাল শাল গায়ে হনুমান ওঝার ক্লোজ-আপ কিংবা থ্রী কোয়ার্টার শট্, গাছের ভেতর দিয়ে সাইকেলে চড়ে গণেশের রঘুবরকে খুঁজতে যাওয়ার মুভিং শট, তাঁবুর সামনে দেবশিশুর ছবির ক্লোজ-আপ, খড়্গা হাতে সীতার মিড-শট্ এবং ক্লোজ-আপ – এরকম অনেক ফ্রেমই আমার মনে গেঁথে রয়েছে। আর অভিনয়ের কথা কী আর বলব। স্মিতার অভিনয়ের তো জবাব নেই। তাঁর অকাল মৃত্যুতে আমাদের ছায়াছবি জগতের যে কী অভাবনীয় ক্ষতি হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। সাধু মেহের, শ্যামানন্দ জালান, ওম পুরির নিতান্তই পাকা অভিনয় প্রত্যেক দর্শককেই মুগ্ধ করেছে এবং করবে তেমনি করেছে এবং করবে রোহিণী হাত্তাংগাদী এবং সুশান্ত সান্যালের অভিনয়। স্বয়ং পরিচালকের সৃষ্ট আবহসংগীতও ছবির মান বৃদ্ধি করেছে। মেক-আপ এবং আর্ট-ডিরেকশনও উঁচুমানের, হনুমান ওঝার পরচুলা এবং দাড়ির বেলায় যদিও আরেকটু মনোযোগ দিলে ভাল হত। সব মিলে একটি অসাধারণ সৃষ্টি যা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির তো বটেই, সর্বসাধারণেরও অবশ্য দর্শনীয়। □

কলকাতা দূরদর্শনে বাংলা ছবি দেখানো বন্ধ হয়ে যাবে ?

কলকাতা টিভিতে বাংলা ছবি দেখানো হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা টিভি-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের ছবির দর বাড়ানো নিয়ে বিবাদ শুরু হয়েছে। দুপক্ষই কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছেন। একদিকে পূর্বাঞ্চলের বাঘা বাঘা প্রযোজক এবং পরিবেশকরা। অন্যদিকে টিভি-জড়িত সরকারি আমলা এবং সর্বোপরি কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রী অজিত পাঁজা।

ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স বা ইম্পা হচ্ছে পূর্বাঞ্চলের প্রযোজক-পরিবেশকদের একটি সংগঠন। এই অঞ্চলের ছায়াছবির সম্বন্ধীয় উন্নতি অথবা নীতি নির্ধারণে যার ভূমিকা বহুদিন ধরেই স্বীকৃত। তাঁদের অভিযোগ বাংলা ছবি টিভিতে দেখানোর জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষ তাঁদের যে টাকা দেন তা অত্যন্ত অল্প। বহুদিন ধরেই টাকা বাড়ানোর ব্যাপারে তাঁরা কর্তৃপক্ষকে আলোচনায় বসার জন্য অনুরোধ করছেন। কিন্ত টিভি কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতেই নাকি সে আলোচনা করা যাচ্ছে না। ফলে তাঁরা বাধ্য হয়েই টিভিতে বাংলা ছবির প্রদর্শন বন্ধ করে দেবার কথা ভেবেছেন।

টিভিতে সিনেমা দেখানোর ব্যাপারটা দুভাবে হয়। এক, দিল্লি মারফত জাতীয় নেটওয়ার্ক মাধ্যমে এবং দুই, আঞ্চলিক কেন্দ্র মারফত। আঞ্চলিক কেন্দ্র যে ছবি দেখায় স্বভাবতই তা আঞ্চলিক ভাষার। এক্ষেত্রে যেমন বাংলা।

টিভিতে যেসব ছবি দেখানো হয়, টিভি কর্তৃপক্ষ তাদের তিনভাবে ভাগ করেন – এ, বি এবং সি। ছবির বিষয়গত এবং নান্দনিক উৎকর্ষ দেখেই এই ভাগ হয়। জাতীয় কার্যক্রমে যে সব হিন্দি ছবি দেখানো হয়, অর্থাৎ সমস্ত ভারত একই সঙ্গে বসে যেসব হিন্দি ছবি দেখে এ, বি সি অনুসারে তাদের মূল্য এ রকম চার লক্ষ টাকা, তিন লক্ষ টাকা এবং দু লক্ষ টাকা। আর 'চিত্রহার' অনুষ্ঠানে যে নির্ধারিত গানের অংশ দেখানো হয় তার জন্য দেয় টাকার পরিমাণ হলো চার হাজার। এর ভেতরে তিন হাজার টাকা অবশ্য রয়্যালটি বাবদ।

আঞ্চলিক কেন্দ্রমারফত দেখানো আঞ্চলিক সিনেমাগুলোর ক্ষেত্রে অবশ্য রেটটা অন্যরকম। এটা নির্ভর করে সেই অঞ্চলের দূরদর্শন-পরিধি এবং পরোক্ষভাবে জনসংখ্যার ওপর। যে কেন্দ্রের রিলে ব্যবস্থা যতদূর বিস্তৃত তার টাকার অঙ্ক সেভাবেই নির্ধারিত। স্বভাবতই বোম্বের সঙ্গে কলকাতার, অথবা কলকাতার সঙ্গে লখনৌ কিংবা শ্রীনগরের রেটের তারতম্য ঘটে।

বিতর্কটা কলকাতা কেন্দ্রকে নিয়ে এবার তাই এখানকার রেটটা জানা যাক। বর্তমানে কলকাতা টিভি বাংলা ছবি দেখিয়ে প্রযোজক-পরিবেশকদের যে টাকা দেয় তা হলো – 'এ' জাতীয় ছবি ২৩,১০০ টাকা, 'বি' জাতীয় ছবি ১৫,৫০০ টাকা এবং 'সি' জাতীয় ছবি ১৩,৮৭৫ টাকা। আর 'চিত্রমালা' অনুষ্ঠানে গানের দৃশ্যের জন্য সাকুল্যে ২৫০ টাকা। আগে অবশ্য ফিচার ছবির জন্য টাকা দেওয়া হত আরও কম। এ বি সি শ্রেণী অনুসারে ১৫০০০, ১০,০০০ এবং ৭,৫০০ টাকা। সাদাকালো ছবির রেট রঙিন ছবির চেয়ে ২৫% কম। সরকার দ্বারা নির্দিষ্ট বর্তমান টাকার পরিমাণের সময়সীমা ছিল ৩০. ৯. ৮৭ পর্যন্ত। বর্তমানে তা অতিক্রান্ত। কিন্তু সরকার নতুন কোনো রেট এ পর্যন্ত ঘোষণা করেনি।

ইম্পা চাইছে প্রতি ছবির রেট হোক ১ লক্ষ টাকা। কোন এ বি সি ভাগ থাকবে না। আর 'চিত্রমালা' অনুষ্ঠানে প্রতিটি গানের বিনিময়ে তাদের দাবি রয়্যালটি সমেত ১৫০০ টাকা। ইম্পার অভিযোগ – ' '৮৭-র আগস্ট থেকেই তারা বিষয়টি নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য বহু চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু সরকারি দীর্ঘসূত্রতায় তাঁরা এ পর্যন্ত কোন সবুজ সংকেত পাননি। আলোচনায় বসার ব্যাপারে সরকারি উৎসাহ একেবারেই স্তিমিত। অথচ কলকাতা বিমান বন্দরে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রী অজিত পাঁজা বলে গেলেন, ইম্পাই আলোচনায় বসার জন্য রাজি হচ্ছে না। টিভিতে বাংলা ছবি দেখানো বন্ধ করতে চায় ইম্পা। এটা একটা ষড়যন্ত্র।

কলকাতা টিভিতে বাংলা ছবি এবং চিত্রমালায় গানের অংশ দেখানোর জন্য কর্তৃপক্ষ যে টাকা দেন তা সত্যিই কম। একটা এ গ্রেডের রঙিন ছবি পায় ২৩,১০০ টাকা। যদিও 'এ' গ্রেড পায় খুবই কম ছবি। বেশির ভাগ ছবির কপালেই জোটে সি গ্রেড। তার জন্য কর্তৃপক্ষ দেন ১০,৮৭৫ টাকা। অবশ্য ছবিটি রঙিন হলে তবেই এই পরিমাণ টাকাটা পাওয়া যায়। সাদাকালো হলে টাকা জোটে আরও ২৫% কম। অথচ একটি রঙিন ছবি প্রিণ্ট করতেই খরচা পড়ে কমপক্ষে ৩৫,০০০ টাকা।

চিত্রমালায় গানের অংশ দেখানোর জন্য দেওয়া হয় মাত্র ২৫০ টাকা। তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটারি শ্রীপুলক চ্যাটার্জি একটি চিঠিতে জানান চিত্রহার অনুষ্ঠানের জন্য যে টাকা দেওয়া হয়, চিত্রমালা অনুষ্ঠানেও যাতে সেই টাকা দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চিত্রহার অনুষ্ঠানে প্রতিটি গানের জন্য দেওয়া ১০০০ টাকা ও রয়্যালটি বাবদ ৩০০০ টাকা – মোট ৪০০০ টাকা অর্ডার ইস্যু যদি হয়েই থাকে তবে এই চিঠির ১ বছর ৩ মাস বাদে ৮. ৯. ৮৬ তারিখে কলকাতা টিভির ফিল্ম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রযোজক শ্রী স্বপন রায়চৌধুরী 'ইম্পা'র চেয়ারম্যানকে কেন লিখলেন (Ref. No. DDK/CAL/Film/4/86) যে প্রতিটি গানের অংশ বাবদ চিত্রমালায় ২৫০ টাকাই দেওয়া হবে অথচ এই স্বপন রায়চৌধুরীই ১৯. ২. ৮৬-তে ইম্পাকে আরও একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন (Ref. No DDK/CAL/Film/4/86) The original circular of the Directorate, Doordarshan regarding enhancement of rate for telecast of Song Sequence in Chitramala is Still awaited. এ প্রসঙ্গে 'ইম্পা'র বক্তব্য – 'সার্কুলার পাবার পর দেড়বছর অপেক্ষা করে আছি।

কলকাতা দূরদর্শনের ট্রান্সমিটার পরিধি সত্যিই বেড়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইম্পা-র টাকা বাড়ানোর যুক্তি একেবারে নাকচ করা যায় না। আর যখন এই সময়ের ভেতর হিন্দি ছবির রেট বেড়েছে দুবার। বর্তমানে হিন্দি ছবির রেট এ, বি সি গ্রেড অনুসারে ৫ লক্ষ, ৪ লক্ষ এবং ৩ লক্ষ টাকা। বাংলা ছবির রেট সেই তুলনায় নিতান্তই কম নয় কি ?

এই টালবাহানার সুযোগে ঢুকে পড়েছে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো। তারা ইম্পাকে প্রস্তাব দিয়েছে যে, তারাই ছবি স্পনসর করবে। টাকাও প্রযোজক-পরিবেশকদের তারাই দেবে। ইম্পার অভিযোগ, জল আরও ঘোলানোর জন্য টিভি-কর্তৃপক্ষই এইসব বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোকে তাদের কাছে পাঠাচ্ছে। যাতে এমন মনে হয় যে, আসলে স্পনসরশিপে ছবি দেবার জন্যই ইম্পা এভাবে রেট বাড়ানোর দাবি তুলেছে। কিন্তু ইম্পা এইসব বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোকে পরিষ্কার, জানিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসার আগে পর্যন্ত তাঁরা এ ব্যাপারে কোন কথা দেবেন না।

বাংলা ছবি এবং চিত্রমালা টিভিতে নিয়মিত দেখানো হোক, এটা সকলেরই কাম্য। ইম্পার আন্দোলনের যত যৌক্তিকতাই থাক, তাঁদের ছবি বয়কটের সিদ্ধান্তকে পুরো মেনে নেওয়া যায় না। প্রসঙ্গত বলা যায় ফিল্ম ফেডারেশনও আবার রেট বাড়ানোর জন্য সরকারের কাছে চিঠি-চাপাটি পাঠানো শুরু করেছে। কিন্তু তারা ছবি বয়কট করেনি। যদিও ইতিমধ্যে ইম্পা একটু নরম মনোভাব দেখিয়েছে। ১৬ নভেম্বর ইম্পার অফিসের সামনে কলকাতা কর্পোরেশনের একদল কাউন্সিলর বিক্ষোভ দেখান। পরে তাদের সঙ্গে ইম্পার আলোচনা হয়। তাতে ঠিক হয়, ইন্দিরা জন্মদিন এবং দূরদর্শনের দ্বিতীয় চ্যানেলের উদ্বোধন উপলক্ষে ১৯ নভেম্বর '৮৭ থেকে ২৬ নভেম্বর '৮৭ পর্যন্ত ইম্পা তাদের বয়কট সাময়িকভাবে তুলে নেবে।

আমরা চাই দূরদর্শন-কর্তৃপক্ষ এবং ইম্পা আলোচনায় বসুক। পারস্পরিক বোঝাপড়ায় বিবাদের কালো মেঘ কেটে যাক। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ আবার টিভির সামনে বসে সাপ্তাহিক বিনোদনের সুযোগটুকু পাক। □

শ্যামলেন্দু চৌধুরী

সোভিয়েত টার্কমেনিয়ায় ‘অনাহিতা দেবীমূর্তি’ কি মহাবিশ্ব গঠন রহস্যের প্রতিফলন?

১৯৮৫ সালের গোড়ার দিকে মধ্য এশিয়ার ‘কান্দিম-কালা’ নামের প্রাচীন রাজ্যে এক যৌথ খামার চাষী একদিন ঐ অঞ্চলে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে ব্রোঞ্জের তৈরি একটি ছোট্ট সুন্দর মূর্তি আবিষ্কার করে। সেটি টার্কমেনিয়ার (Soviet Turkmenia) ইতিহাস বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে জমা দেয়। চাষীটির নাম ওবাগালদিয়েভ। মূর্তিটি ১৪ সেন্টিমিটার উঁচু। কয়েকটি ধাতু গলিয়ে ঝালাই করে মূর্তিটি তৈরি করা হয়। মূর্তির বিভিন্ন অংশের ঢাল ও জোড়গুলি নিখুঁতভাবে রূপায়িত। মূর্তিটির আধার হল একটি সিংহ মূর্তি, যার মুখ আধখোলা ও মুখের ভেতরে একটি ছিদ্র আছে। সামনের দুটি থাবা ঈগল পাখির পায়ের মত। সিংহ মূর্তির পিঠে একটি দাড়িওয়ালা মানুষের মূর্তি খোদাই করা এবং এ মূর্তির মাথার কাছ থেকে একটি উপবিষ্টা নারীমূর্তি খোদাই করে সুন্দরভাবে বসানো হয়েছে। নারী মূর্তির এক হাতে একটি পাত্র যা মুখের কাছে ধরা আছে। নারীমূর্তির মাথায় একটি শিরস্ত্রাণ, যার ভেতরে একটি ফানেল (চুঙ্গি) মূর্তির শরীরের ভেতরে চলে গেছে। এ শিরস্ত্রাণের পেছন দিকে কয়েকটি গোলাকার অংশ ঝালাই করা আছে। সোভিয়েত টার্কমেনীয় ঐতিহাসিক য়ুসুপভ অনুমান করেন যে, শিরস্ত্রাণের ফানেলে ঢাকনি সংযুক্ত করার জন্য এগুলো ঝালাই করা হয়েছে। নারীমূর্তির পেছনে একটি নগ্ন নরমূর্তিও বাঁকা ভাবে খোদাই করা। এটা হল গোটা মূর্তির হাতল।



সোভিয়েত প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই বিচিত্র মূর্তির গঠন প্রণালী ও মূর্তি তৈরির সন তারিখ ইত্যাদি নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। তাঁদের মতে এ বিচিত্র মূর্তি হল মধ্য এশিয়ার প্রাচীন কোরেসমিয়া অঞ্চলের শিল্প নৈপুণ্যের একটি চমৎকার নিদর্শন। সোভিয়েত প্রত্নতত্ত্ববিদ য়ু র‍্যাপোপোর্ট তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি মধ্য এশিয়ার ‘কোই-ক্রিলগ্যান-কালা’ অঞ্চলে খননকার্য চালিয়ে একটি প্রাচীন সমাধি মন্দিরের ধংসাবশেষের মধ্যে এরকম অনেক মূর্তি আবিষ্কার করেছেন। এছাড়া মাটি খুঁড়ে যে সব প্রাচীন মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে, তাদের অনেকের গায়ে যে সব খোদাই কাজ দেখা গিয়েছে সেই সব খোদাই কাজ ও কান্দিম-কালা অঞ্চলে পাওয়া এই বিচিত্র নারীমূর্তির গায়ে খোদাই কাজের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখা গেছে। র‍্যাপোপোর্ট সাহেবের মতে মধ্য এশিয়ার কান্দিম-কালা ও কোই-ক্রিলগ্যান-কালা এ দুটি অঞ্চলের মৃৎশিল্প একই সময়ে বিকাশ লাভ করে ও এ বিকাশ ঘটে খৃষ্টপূর্ব ৩-৪ শতকে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ২৪০০ বছর আগে।

টার্কমেনীয় ঐতিহাসিক য়ুসুপভের মতে কান্দিম-কালা অঞ্চলে পাওয়া এই বহুমুখী নারীমূর্তি (Multifigure composition) মহাবিশ্বের গঠন সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা প্রতিফলন করে। এখানে নারীমূর্তির হাতে যে পাত্র আছে, তা হল জলপাত্র এ থেকে য়ুসুপভ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এ নারীমূর্তি হল প্রাচীন পারসিক উপকাহিনী মতে নদী দেবী ‘অনাহিতা’র মূর্তি। আবার উপকাহিনীবিদ এগার্টন সাইকস সাহেবের মতে ‘অনাহিতা’ হল প্রাচীন আর্মেনিয়া দেশের মাতৃদেবী। নারীমূর্তিকে যদি ‘নদী দেবী’র মূর্তি বলে মেনে নেওয়া যায়, তাহলে নদী দেবীর বাহন সিংহ মূর্তির পিঠে আকাশের দিকে চাওয়া যে দাড়িওয়ালা মানুষের মূর্তি খোদাই করা আছে তাকে ভাবা যায় আকাশ-পিতার প্রতীক (Symbol of Sky Father) আর সিংহ বাহন মূর্তি হল সৌর তেজ (Sun Fire) এবং নারীমূর্তির পেছনে বাঁকা নরমূর্তি হল সমগ্র মূর্তির হাতল যা তেজ ও জলকে সংযুক্ত করেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক র‍্যাপোপোর্ট সাহেব তাঁর আপন মতের সপক্ষে প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাসের উক্তি এবং একটি প্রাচীন পারসিক দর্শন তত্ত্বকে নজির হিসেবে তুলে ধরেছেন। এসব তত্ত্বকথার মতে অগ্নির একটি রূপান্তর হিসেবে জল প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল। আর আমরা একথাও জানি যে, প্রাচীন পারসিকদের অগ্নিমন্দির (Fire Temple) জল দেবী ‘অনাহিতা’র উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

সোভিয়েত টার্কমেনীয় ঐতিহাসিক য়ুসুপভ মনে করেন যে, এই বিচিত্র নারীমূর্তি হল একটি প্রদীপের অগ্রভাগ ও দেবীমূর্তির শিরস্ত্রাণ হল প্রদীপের শিখা। য়ুসুপভের সিদ্ধান্ত অনুসারে বলা চলে যে, সমগ্র দেবীমূর্তিটি হল এমন একটি অপূর্ব প্রতীক, যা ২০০০ বছর আগের মধ্য এশিয় প্রাচীন উপজাতিদের সামাজিক সম্পর্ক ও তাদের দার্শনিক, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা প্রতিফলিত করে। সোভিয়েত টার্কমেনিয়ার সংগ্রহশালায় ‘অনাহিতা’ দেবীর এই বিস্ময়কর মূর্তিটি সযত্নে রাখা আছে। □

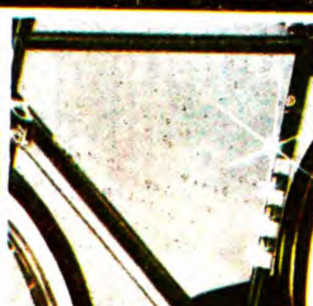
ফণীভূষণ চক্রবর্তী

ফটো : সংগৃহীত

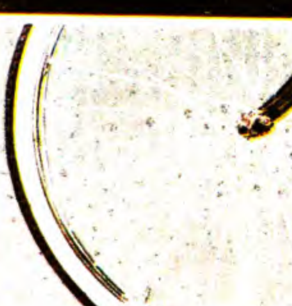




1+ ফর্ক লক—অধিক নিরাপত্তার জন্যে



2+ অ্যাক্রিলিক পেন্ট—বহুদিন ঝকঝকে থাকার জন্যে



3+ সাদা সাইডওয়াল টায়ার—দারুণভাবে আকর্ষণীয়



4+ রিফ্লেক্টর প্যাড্‌ল—রাতে নিরাপদে চলাচলের জন্যে

নিজেই দেখে নিন :

এখন বি এস এ ডিলাক্স-এ যে ৪টি অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা অন্য আর কোনো সাইকেলেই খুঁজে পাবেন না।

৩। তকতকে মসৃণ সাদা সাইড-ওয়াল টায়ার

৪। রাতে নিরাপদে সফর করার জন্যে অনুপম রিফ্লেক্টর প্যাড্‌ল

তার সঙ্গে • ক্রোমপ্লেটেড স্পোক্‌স

• ব্রুক স্যাড্‌ল

নতুন বিএসএ ডিলাক্স

এর চেয়েও কম কি নিতে চাইবেন?